নহ মাতা
নহ কন্যা

আশীর্বাদ
প্র কা শ ন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬১

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

বাগাড়ম্বর করব না। বর্তমান শতাব্দীতে রচিত সমাজভ্রষ্ট নারীর বিচিত্র জীবনকথা নিয়ে লেখা বিশিষ্ট গল্পগুলির পরিচয় দিতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমার এই বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

সংকলনটিতে গল্পসংখ্যা দু'ডজনের মতো। প্রথম গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিচারক'। গল্পটি প্রথমে বার হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০১ সালের পৌষ সংখ্যায়। এই গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের তাবৎ গণিকাগল্পমালার মধ্যমণি। নিটোল নিরেট নির্দয় অথচ কোমল ও হৃদ্য কাহিনী। প্রতিবেশী কলেজ পড়ুয়া নবযুবা ধনী মোহিতমোহন দত্তর প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে গোঁড়া গৃহস্থ ঘরের বিধবা কন্যা হেমশশী পালিয়েছিল। কিছুদিন পরে মোহিত তাকে ছেড়ে অন্তর্ধান হয়। অগত্যা হেমশশী বেশ্যাগিরিতে বাধ্য হয় আর নিজের নাম পালটিয়ে হয় ক্ষীরোদা। ক্ষীরোদার গর্ভে একটি ছেলে হয়। সেই ছেলেটি তার হৃদয়ের মণি হয়ে পড়ে। সে তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। সে বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেয়। তার ফলে তাকে শেষ পর্যন্ত অনশনে আত্মহত্যা করতে তাড়া দেয়। নিজে মরবার আগে সে ছেলেটিকে কূয়ায় ফেলে মারতে যায়। উদ্যোগপর্বেই ধরা পড়ে এবং আদালতে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড পায়। এত দারিদ্রতা সত্ত্বেও সে মোহিতকে ভোলে নি। তাই মোহিতপ্রদত্ত নামাঙ্কিত আঙটিটি তার চুলের ফাঁকে গুঁজে রেখেছিল। পুলিশের লোকে তা টের পায়নি। হাজতে গিয়েও সে আঙটিটি বার করে চুমু খেয়ে আবার লুকিয়ে রাখত। একদিন সে প্রহরীর কাছে ধরা পড়ে। প্রহরী তাকে নির্দয় প্রহার করতে থাকে। এদিকে এতদিন মোহিত বিচার বিভাগে চাকরি পেয়েছে, সে সেইদিন জেলে দেখতে আসে। ক্ষীরোদাকে প্রহারের খবর পেয়ে সে আঙটিটি দেখতে চায়। আঙটিটি পেয়ে সে দেখল যে তাতে তারই নাম লেখা আছে। তখন সে ক্ষীরোদার দিকে আবার চাইল, সব কথা মনে পড়ল।

তারপর ?

তারপরে তার কি যে খবর ধারি নে তার ধার গো,
তারপরে সে কেমন আলো কেমন অন্ধকার গো !

পরের গল্প চিত্তরঞ্জন দাশের 'ডালিম'। গল্পটির আরম্ভ :

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ছাড়ি নাই।

ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন্ আরম্ভ হইল, কখন্ শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না।

কলিকাতার উপকণ্ঠে এক প্রমোদ উদ্যানে ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে প্রমোদ বিহার করতে গিয়ে বক্তা এক সুকণ্ঠী সাদামাটা চেহারা গণিকার অনুরাগী হইয়া পড়ে। মেয়েটির নাম ডালিম। সেও প্রেমে পড়িয়াছিল কিন্তু প্রকাশ করতে চায়নি। কারণ জীবনে সে কতই পেয়ে এসেছে। কাব্যধর্মী গল্পটি যেন রবীন্দ্রনাথের এই বাণীরই ইলাসট্রেসন

কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে।

চিত্তরঞ্জন দাশ কবি ছিলেন। গল্পটিতে একটি গান আছে :

কেমন করে মনের কথা কইব কানে কানে।

প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥

ডালিমের পর রয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'বেশ্যা খুন'। দেশ কলিকাতা, কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। মফঃসলের এক ব্যবসাদার ধনী যুবক মাল কিনতে কলিকাতায় এসে একদিন তার মনে বাসনা জাগে কলিকাতার বিলাসী জীবনের আস্বাদ নেওয়ার। সে বেশ্যাপাড়ায় এক বেশ্যার ঘরে যায়। কিছুক্ষণ পরেই অপর বেশ্যারা শুনতে পায় ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ। দেখে একটি অপরিচিত যুবক। পুলিশের কাছে সে বোবা বনে থাকে। নামধাম কিছুই বলে না। হাইকোর্টে বিচারের সময় সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। দশ বছর পূর্বে তার বিধবা রূপসী ভগিনী দুবৃত্তের পাল্লায় পড়ে কুলত্যাগ করে। লোকে জানত যে সে মরে গিয়েছে। এই বেশ্যাবাড়িতে ছেলেটি সেই হারানো ভগিনীর সন্ধান পায়। ভগিনী ভাইকে দেখে চিনতে পারে। লজ্জায় ক্ষোভে আত্মহত্যা করে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল সব সত্যি, জজসাহেব আসামীকে খালাস দিলেন।

চমৎকার ডিটেকটিভ-গল্প। 'দারোগার দপ্তর'-এ প্রকাশের যোগ্য।

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে গনিকা-জীবনের কথা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। অবহেলিতা বঞ্চিতা নারীর দুঃখ-বেদনা দক্ষতার সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর কোনো গল্পতেই গণিকা-জীবনের কথা আসে নি, আঁধারে আলো গল্পে এসেছে বাইজী-জীবনের কথা। শরৎচন্দ্র গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বহু উপন্যাসে দেহজীবী নারীদের কথা তুলে ধরেছেন বলেই সম্পাদকদ্বয় তাঁকে বাদ দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের অংশ বিশেষ সংকলিত করেছেন। এই সংকলনের পেছনে যুক্তিও রয়েছে যথেষ্ট।

ভারতীগোষ্ঠীর অনেকেই গনিকা-জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় বিশেষভাবে পাঠক সমাজের নজর কেড়েছিল। এই বিষয়ের

ওপর তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন। সেই গল্পগুলির মধ্যে 'কুসুম' যে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কুসুম দেহজীবী নারী হলেও তার মন স্নেহ-মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই নিষ্ঠুর সমাজ তার সঠিক মূল্যায়ন করে নি। তাই গল্পের শেষাংশ করুণ-রস-ঘন। "তাহার অশ্রু অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার!"

এরপরে রয়েছে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'আদরিণী'। সত্তর-আশি বছর আগে কলিকাতায় হেদোকেন্দ্রিক বাঙালী টোলায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মঘেঁষা কয়েকজন ভাবুক ও শিক্ষিত কিশোর ও নব্যযুবা মিলে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়েছিল। সে গোষ্ঠীর শিরোমণি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং দলপতি ছিলেন সুকুমার রায়। প্রেমাঙ্কুরবাবু এই দলেরই পদাতিক। কড়াকড়ির জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতাদের প্রতি এঁরা প্রসন্ন ছিলেন না। সেই অপ্রসন্নতার রি-অ্যাকশনে "মহাস্থবির"। মহাস্থবিরের সবই বাস্তব এবং নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ। আলোচ্য গল্পটির দেশ কলিকাতা ও শহরতলী, কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-দশক। গল্পটি নায়কের আত্মকথা। একদিন বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি নামায় বাধ্য হয়ে সে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাড়িটি এক বেশ্যার। বেশ্যা বামুনের ছেলেটিকে যত্নে আশ্রয় দেয়। এই হল কাহিনীর সূত্রপাত, মেয়েটির নাম আদরিণী। বাস্তব এবং উপাদেয় গল্প। "বাস্তবজীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী হলেও আমি দেখতে পেতুম মানসজীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী।"

রমেশচন্দ্র সেন সংখ্যায় বেশি লেখেননি। কিন্তু যে কটি লিখেছেন, প্রতিটি কম বেশি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তাঁর "সাকীর প্রথম রাত্রি" গল্পটি সংকলিত হয়েছে। এই গল্পে রয়েছে নির্মম চিত্র। "অনেক দুঃখ কষ্টের পর বারিবালা রূপজীবিনীদের পাশে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।" কিন্তু প্রথম রাতের অভিজ্ঞতাই বড় নির্মম নিষ্ঠুর। দু'পয়সা উপার্জনের জন্য এ পথে তার আসা, কিন্তু কানাকড়িও উপার্জন হয় না। "তার সর্বশরীরে একটা গ্লানি, গা ঘিন ঘিন করে।···মনে পড়ে লোকটার নৃত্য, তার আদর। সে আদর করিয়া গিয়াছে কিন্তু একটা কানাকড়িও রাখিয়া যায় নাই।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্পের নাম 'হিঙের কচুরি'।

কাহিনী একটি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের ছেলের সঙ্গে পাড়ার এক যুবতী গণিকার স্নেহসম্পর্ক নিয়ে। বর্ণনা সহজ সরল স্বাভাবিক কবিত্বময়। সমাপ্তি ট্রাজিক নয়। মনে হয় কাহিনীটি লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গল্পটি সংযোজিত হয়েছে, সেই গল্পের নাম 'মেলা'। বীরভূমের লাভপুর গ্রামে (এই গ্রামে লেখকেরও নিবাস ছিল) বছর বছর এক মেলা বসত। সেই মেলায় নানা রকম পসরা নিয়ে লোকেরা আসত। বেশ্যারাও আসত। এক ভাই-বোন, ছেলেটি স্কুলে পড়ুয়া, স্বগ্রামে মেলা দেখতে আসে, মেয়েটি হারিয়ে যায়, এক বেশ্যার আশ্রয় নেয়। মেলার ম্যানেজার মেয়েটিকে বেশ্যার তালিকা-

ভুক্ত করতে চাইলে আশ্রয়দাত্রী তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

গল্পটির বর্ণনায় বাস্তবতার রঙ সমুজ্জ্বল।

তারাশঙ্করের পর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প। তাঁর গল্পের নাম 'মন্দ লোক'। দেশ, মুঙ্গের ভাগলপুর অঞ্চলের এক শহর, বক্তা স্থানীয় ডাক্তার, নায়িকা এক স্থানীয় বেশ্যা। তার অনূঢ়া কন্যাকে ডাক্তার চিকিৎসা করে সারিয়েছিলো। কিশোরী স্বাস্থ্যবতী কন্যা ঋতুকে নিয়ে মা একদিন ডাক্তারের কাছে এনে "ঋতুর শুভ বলিদান কার্যটা" ডাক্তারের মত "সৎ পাত্রের দ্বারাই সম্পন্ন" করাতে চায়। ডাক্তার 'মন্দ লোক' পতিতাকে ফিরিয়ে দেয়।

গল্পটির উপসংহার বনফুলের 'দন্ত কৌমুদী'র উপসংহারে প্রায় একই। উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শরদিন্দুবাবুর নিবাস ছিল মুঙ্গের, বনফুলের ভাগলপুরে।

দন্ত-কৌমুদীর বনফুল ছদ্ম নামে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। কাহিনীর দেশ ভাগলপুর সাহেবগঞ্জ অঞ্চল, কাল বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক। বক্তা স্থানীয় ডাক্তার। তার বর্ণনায় রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতার স্পর্শ। তাই কখনোই গল্পটি বানানো বা কৃত্রিম মনে হয় না।

পরবর্তী গল্প 'গোষ্পদ' যুবনাশ্ব অর্থাৎ মনীশ ঘটকের রচনা।

মধ্য কলিকাতার দুইটি বেশ্যার দলের তুলনামূলক আলেখ্য এই রচনাটিতে পাই। পটলডাঙ্গার খোঁদি পিসীর দলে এসে ভিড়ল একটি মেয়ে। মেয়েটি গ্রাম থেকে কলকাতায় কালীঘাট দেখতে আসে। তার সঙ্গী তাকে নেবুতলায় বাড়িউলীর কাছে ভিড়িয়ে তার গয়নাপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। বাড়িউলী তাকে ব্যবসায় নামায়। মেয়েটি কোন মতে পালিয়ে এসেছে। তাঁর কাহিনী শুনে খেঁদি-পিসীর মনে করুণা জাগে। মেয়েটি পটলডাঙ্গার দলে ভর্তি হয়ে যায়। কাহিনী খুবই বাস্তব, রচনা মসৃণ।

এর পরে রয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইতি'। পাড়াগাঁয়ে শখের থিয়েটার পার্টি গেছে কলিকাতা থেকে। সেখানে গিয়ে তারা বিজ্ঞাপন দিলো যে মেয়ের পার্ট মেয়েই করবে। তারা সেখানকার এক বেশ্যা সরলাকে পার্ট দিলো। একটি অভিনেতা সরলার প্রেমে পড়ে যায়। সরলাও মোহে পড়ে, থিয়েটার নিয়ে মেতে ওঠে। তার বাঁধা লোক তাকে অভিনয় করতে দেখে মারধোর করে। কল্লোল যুগে বেশ্যাজীবন নিয়ে যে কয়েকটি স্মরণীয় গল্প লেখা হয়েছে, তার মধ্যে 'ইতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অচিন্ত্যকুমারের স্মরণীয় সৃষ্টি।

পরের গল্প কল্লোলের আরেক শক্তিশালী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। রচনাটি কাহিনী নয়, একটি চিত্র—বিগতা-যৌবনা বিগতশ্রী তবে মধুকণ্ঠী এক পেশাদার গণিকার করুণ চিত্র। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই চিত্র অঙ্কন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পটি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মানিকবাবু

ছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিমান নীরস কঠিন অ-সাধারণ লেখক। তিনি মনস্তত্ত্বের চর্চা করতেন না বটে, কিন্তু তাঁর সবই ছিল তাত্ত্বিক অর্থাৎ ইমোশনহীন গল্পটি সেই দৃষ্টিতে লেখা।

'অঙ্গার' গল্পটি প্রবোধকুমার সান্যালের রচনা, পাকা কলমে তীক্ষ্ণ চোখের কারুকার্য। দেশ পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতা, কাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ। পাত্র নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ। নায়ক নলিনাক্ষ দিল্লীতে কাজ করে। তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা দেশেই থাকে। সে তাদের মাসে মাসে টাকা পাঠাত। পর পর কয়েক মাস টাকা ফেরৎ আসে। কলিকাতায় এসে সে দেখল যে পিসীমা ও তার ছেলেমেয়েরা পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেশ ছেড়ে বৌবাজারে এক বাড়িতে উঠেছে। পেটের দায়ে পিসীমার মেয়েরা গণিকাবৃত্তি নিয়েছে।

প্রবোধবাবুর লেখাটি গণিকা-সড়কের একটি মাইলস্টোন।

এর পরের গল্প বুদ্ধদেব বসুর গল্প, 'চোর! চোর!'। ললিতা সতের বছর বয়স থেকেই দেহজীবী। একটি সুন্দর দেখতে ছেলে একদিন তার কাছে এসেছিল। সে ছেলেটিকে রাত্রে থাকতে দিয়েছিল। পরের দিন সকালে দেখা গেল ছেলেটি ললিতার গয়না নিয়ে উধাও হয়েছে। কিছুকাল পরে একদিন রাত্রে মুখোশ পরা এক চোর এসে বললে তোমার টাকাকড়ি দাও। ললিতা বললে গয়নাপত্র নিও না। তার বদলে চেক লিখে দিচ্ছি। বেকায়দায় পড়ে চোর স্বীকার করলে যে সে পেশাদার চোর নয়, কলেজে পড়ে। হস্টেলে থাকে। বাপ-মায়ের সংসারে দারুণ অর্থকষ্ট বলেই সে এ কাজ করতে এসেছে। এই কথা শুনে ললিতার চিত্ত গলে গেল। সে তাকে রাতের খরিদ্দার বলে স্বীকার করে নিলো। ছেলেটি তার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। "ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে মার হাত তার কপালে, মুখে চুলে, সেই তাদের পাড়াগাঁর বাড়ি। খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা...মা-গো। ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল, তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।"

গণিকা হয়েও তার মাতৃসত্তা প্রবল হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

পরের গল্প সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ।' দেশ কোলিয়ারী অঞ্চল, কাল এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক। কলিকাতার শিক্ষিত যুবক প্রসাদ বরাকরে বেড়াতে যায় লতাকে সহচরী করে, একটি বড় বাংলা ভাড়া করে বাস করতে থাকে। একটি বড় পরিবার সেখানে চেঞ্জে আসে। ঐ পরিবারে একটি মেয়ের প্রতি প্রসাদ আকৃষ্ট হয়ে নিজের সহচরীকে ত্যাগ করতে চায়। প্রসাদ লতাকে প্রচুর অর্থ দিতে চায়। লতা গ্রহণ করলো না, দোষও দিলো না।

গল্পটি মনসতাত্ত্বিক। কাহিনী বস্তু নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ, বাস্তব।

জোতিরিন্দ্র নন্দী শক্তিশালী গল্পকার। তাঁর ট্যাক্সিওয়ালা গল্পটি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের আত্মকথা।

একদিন দুপুরবেলা এক হোটেলে খাবার সময় দৈবক্রমে এক সম্ভ্রান্ত গণিকার সঙ্গে

তার আলাপ ঘটে যায়। তারপর এই দুজন অনেক বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ও পাকচক্রের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হতে থাকে। অতঃপর কাহিনী জটিল জাল বুনে গিয়েছে। গণিকা মেয়েটি ট্যাক্সিওয়ালার দিকে অনুরাগিনী হয়েছিল, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা হয়নি।

আপনারা ভাবছেন, সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তির তির করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম। 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারবে?'

'না'

'তবে এক্ষুণি নেমে পড়'। কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই…

কাহিনীর জটিলাবর্ত তাঁর কলমে সহজ সুন্দর হয়েছে।

পরবর্তী গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জামাই' স্থান কলিকাতা, কাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব। সুন্দরী বেশ্যা পানওয়ালীর গর্ভে একটি মেয়ে হল। তাকে সে মানুষ করতে লাগল গৃহস্থ কন্যার মতো। মেয়েটি স্কুল কলেজে পড়ে, বি এ. পাস করল কিন্তু মেয়েটি প্রেমে পড়ে গেল এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে। তারা গোপনে সহবাস করতে লাগল। ফলে মেয়েটির গর্ভসঞ্চার হল। সে গর্ভ নষ্ট করতে গিয়ে মেয়েটি মরে গেল। বাস্তব কাহিনী, অত্যন্ত ট্র্যাজিক।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'শনি' একটি বলিষ্ঠ গল্প। নিপুণ জটিল রচনা। গণিকা মাতঙ্গ তার কন্যা যমুনাকে ভদ্রঘরে বিবাহ দিতে চায়। যমুনার লোভে বাবরি-চুল লাল-চোখ গঙ্গাধর ঘোরা ফেরা করত। তার বাসনা ছিল যমুনাকে উপভোগ করা এবং যমুনাকে থিয়েটারে নামিয়ে টাকা রোজগার করা। তার হাত এড়াবার জন্য মাতঙ্গ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এক সমাজ সংস্কার সংস্থার সম্পাদকের নিকটে যমুনাকে নিয়ে গেল। সম্পাদক গিরিজাবাবু তাদের আশ্রমে রেখে নরেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। সুখে কিছুকাল কাটাবার পর নরেশ মারা গেল। গিরিজাবাবু যমুনাকে অসুস্থ মায়ের কাছে পাঠালেন। কিন্তু সেখানেও গঙ্গাধর হাজির, শেষে জানা গেল যে নরেশ বিয়ে করেছিল টাকার লোভে, সমাজ সংস্কারের জন্যে নয়। সে টাকা জুগিয়েছিল মা মাতঙ্গ ও গিরিজাবাবু।

প্রচণ্ড-নিন্দাত্মক বাস্তবকল্প অ-মধুর কাহিনী।

বিমল করের আঙুরলতা একটি চমৎকার প্রথম শ্রেণীর গল্প। আঙুরলতা গনিকা হয়েও তার মধ্যে স্নেহ মমতা-প্রেমের কোনো ঘাটতি নেই। একজন নারীর মধ্যে যেসব গুণাবলী প্রত্যাশিত, সবই আছে আঙুরলতার মধ্যে। কাহিনীর উপস্থাপনায় তথা প্রকাশ ভঙ্গিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বিমল কর। সেই কারণেই গল্পটি এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শেষ গল্পটি সমরেশ বসুর 'প্রাণ-পিপাসা'। দেশ কলিকাতার দূরে উপকণ্ঠে

একটি ছোট শহর এই গল্পের পটভূমি। সমরেশ বসু এই শিল্পাঞ্চলকে পটভূমি করে আরও অনেক গল্প লিখেছেন। লিখেছেন একাধিক উপন্যাস। এই অঞ্চলে সমরেশ বসুর জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে। ফলে তার অভিজ্ঞতার ভাড়ার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কাহিনীবস্তু লেখকের নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ, বর্ণনা ফোটোগ্রাফের মতো উজ্জ্বল, নিখুঁত।

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ শুধু সার্থক ছোটগল্পের জনক নন, তাঁর গল্পেই প্রথম এসেছে দেহজীবী নারীর কথা। এর আগে দু'একটি বাংলা উপন্যাসে গণিকা প্রসঙ্গ এসেছে ঠিকই, কিন্তু তেমন সফলভাবে চিত্রিত হয়নি। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ প্রথম ষোল আনা সাফল্য পেয়েছেন। তাই তাঁর গল্প দিয়েই এই গ্রন্থের শুরু।

বাংলা গল্পে গণিকা জীবন রবীন্দ্রনাথের হাতে সার্থকভাবে অঙ্কিত হলেও ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে দীর্ঘকাল আগেই তাদের কথা সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা কিংবা কথাসরিৎসাগরের মদনমালার কথা বলা যেতে পারে।

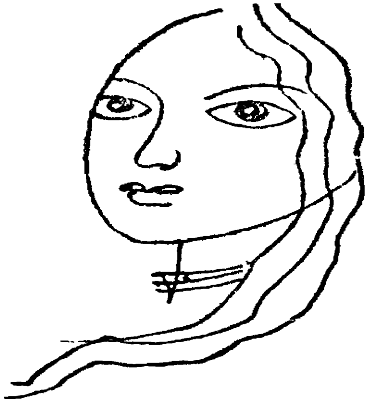
রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্ভবত তরুণ লেখকদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলো। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন উপন্যাস, হেমেন্দ্রকুমার রায় গল্প। ভারতী-গোষ্ঠীর অনেকেই এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন। লিখেছেন বিভূতি-তারাশঙ্কর মানিকও। তাঁদের একাধিক গল্পে এসেছে গণিকা জীবনের কথা। বাঙময় হয়ে উঠেছে তাদের মানবীয় রূপ। পঞ্চাশের ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে বহু নিরুপায় নারী ঐ পথে পা বাড়িয়েছে—তারই বাস্তব বিবরণ রয়েছে মানিকের বেশ কিছু গল্পে।

কল্লোলের কালেও গণিকা-জীবনকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। ছাপা হয়েছে কল্লোলের পাতায়। এই সময়ে লেখা অচিন্ত্যকুমারের ইতি কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বা বন্দী মোর ভগবান কাঁদে বাঙালি পাঠককুলকে প্রবল-ভাবে নাড়া দিয়েছিলো। কল্লোলের পাতায় এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন অনেকেই। আজ একেবারেই বিস্মৃত তাঁদের কেউ কেউ। যেমন, সুকুমার ভাদুড়ী, সুবোধ দাশগুপ্ত ও হরিপদ গুহ।

সাহিত্য কখনোই থেমে থাকে না। সদা প্রবহমান। কল্লোল পেরিয়ে এই হাল-আমল পর্যন্ত গণিকা-জীবন নিয়ে কত স্মরণীয় গল্পই না লেখা হয়েছে! ধারাবাহিকতা রেখে সেইসব গল্প সংকলিত হলো। সমরেশ বসুর পরও অনেক গল্প লেখা হয়েছে। শীঘ্রই বেরুবে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড।

সংকলিত গল্পগুলি সম্পর্কে মূল্যবান মতামত লিখে দিয়েছেন শ্রীসুকুমার সেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ধ্রুপদী শিল্পী শ্রীবিকাশ ভট্টাচার্য প্রচ্ছদচিত্র এঁকে দিয়ে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। আশীর্বাদ প্রকাশনের শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর অনুপ্রেরণায় মুগ্ধ।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় □ শৈলেন্দ্র হালদার



সূচিপত্র



সূচিপত্র

উৎসর্গ

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী, তবু ত তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদেরই জ্ঞাতি ;
"আমাদেরই কোন বন্ধু স্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের পিতা, উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা !"
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।—
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাঁদেরই পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয় !
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার মহাপ্রেমিক সে যীশু !—
কেহই নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালীয় দহে !

—নজরুল ইসলাম

বিচারক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ



অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালো-মন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া—যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া—সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চির পরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের

সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয় - তখনও যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই—সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই—যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপালে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে— তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কন্ঠে "মা" "মা" করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে

বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপ বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল-সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত ; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত ; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশসুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত. মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল. নর্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্‌পিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত ? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না, তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ঐ ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল,

কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ পূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষ কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা— এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বুঝিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তখন

সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল ; সকরুণ অনুনয়-সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই ; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না ; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেয়ে হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন ; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে। মৃত্যু সন্নিকট, তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশ দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজ্‌বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

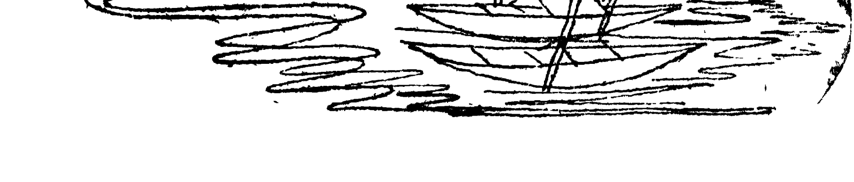
প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।"—প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে —বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৌষ ১৩০১



ডালিম

চিত্তরঞ্জন দাশ



তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত, কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা একরজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল, কখন শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত. জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত। সে দেখিতে

সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটি?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্ গদ্ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয়, আর কখনও দেখিবও না।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণবাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটি খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূরে গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সামনেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই শাণ বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পেঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল, সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই হালকা মনে ফুর্তি করিতে গিয়াছি। সে দিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—"চমকি চমকি যাও।" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, দাদা আ—গিয়া।" একজন বলিল, "দাদা, এই লাও এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর এক জন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—"কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল। ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল।" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, "দেখলে তারে আপনহারা হই।" আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন, "দাদা, হেসে নাও, দু'দিন বইত নয়, কি

জানি কখন্ সন্ধ্যা হয়।" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধূঁয়া, গানের ধ্বনি, সারেঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তবলার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পেঁছিলাম। অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতিবাগানের নূরী, পুতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক ;—কিন্তু সে দিন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল "ডালিম।" একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাস্, ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা তো ওর নয়। ও যে এক কোণে স'রে ব'সে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি করে লোক ধরে।" আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে-ও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনিতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল, সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দু'টি যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম একটা গাও।" আর একজন বলিল, "ডালিম ভাল গাইতে পারে না।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল—"আমি ভাল গাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও না?" সে একটু সরিয়া আমার সামনে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সে গানে যাহা ছিল, তাহা আর এখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল, ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়া ছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জ্বলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল—

"কেমন ক'রে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে॥
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখো বঁধু হিয়ায় হিয়ায়।

প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্‌ব শুধু রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে ;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কখনও গান শিখেছিলে ?" সে বলিল, "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—"আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক ?" সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "এই গানটি আমাকে একলা এক দিন শুনাইবে ?" সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম—"এসব তোমার ভাল লাগে ?" তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। এক জন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—"আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতা মণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম—"ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই।" সে বলিল—"ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম, তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম "তুমি ত আমাকে চেন না।" তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল—"তোমার কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম "জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল, ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্তে কোথায় মিলাইয়া গেল! এ কি সেই আমি ? আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এইমাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের, আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—'হে আমার ব্যথিত, পীড়িত। এস, তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া ওঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি।' কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল, যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম—"শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে।

সে বলিল ঃ—"আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখনও ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটুক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বয়স, তখন তিনি মারা যান। তার পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয়, ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দু'এক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির-বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ছিল। আমার শ্বাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই

ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিন মনে স্থির করিলাম, এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটি ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সে দিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—'আমাকে মামার বাড়ী পেঁছাইয়া দিতে পার?' সে বলিল—'কত দূর?' আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—'নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে।' আমি বলিলাম—'যতক্ষণই লাগে, আমাকে লইয়া যাও।' এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—'আচ্ছা, তুমি এইখানে ব'স, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।' সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম, এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়া ছিল, আমার মনে হইতেছিল, তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পেঁছিলাম, তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি আমি সেখানে আর যাব না। আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও।', মামী কর্কশস্বরে বলিলেন, 'পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?' আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এর সঙ্গে।' মামী বলিলেন—'এ কে?' আমি বলিলাম—'জানি না।' মামী বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না।' 'আমি কোথায় যাব।' মামী বলেলেন—'গোল্লায়,' বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যে দিকে লইয়া গেল, সে দিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাস করিলাম—'কোথা যাইবে?' সে বলিল—'কল্কাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া

বলিলাম—'আমাকে রক্ষা কর ; আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চল।' সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল, 'আচ্ছা।' কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শ্বাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—'গোল্লায় যাও।' আমি ফিরিলাম, সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার—মনে হইল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর ?

তারপর কলিকাতায় আসিলাম। ভাবিলাম, সে কোন জমিদারের ছেলে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দুজনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

তার পর ?

এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজসজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক বাতি, ইলেক্ট্রিক পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারিভরা কাপড়, বাক্সভরা টাকা।

আমি কলকাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু' হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশমাত্র নাই সেই লতামণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায় ?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল, "তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে ? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না ? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে ? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু

দিবার নাই।"

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—"আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম, জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল, আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই। চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সে দিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম, ডালিম আমার কাছে নাই! আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল, "কি বাবা, একেবারে উধাও।" আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া?" একজন গাড়োয়ান বলিল, "হ্যা বাবু, এক বিবি অভি চলা গিয়া।" আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম, জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটি করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝি বলিল, সে শেষ রাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তে হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

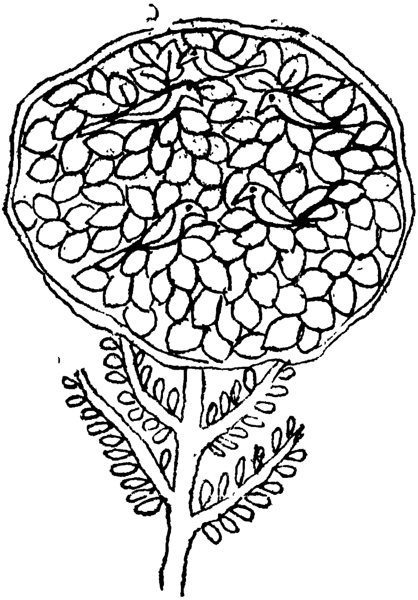
আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম:—

"তুমি আমাকে খুঁজতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও, আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে

যাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণসর্বস্ব! আমি বড় দুঃখী. তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

—ডালিম।"



বেশ্যা খুন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যার পর, কলিকাতার কোনও এক কু পল্লীতে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। এক বারবিলাসিনী খুন হইয়াছে, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, তথায় পুলিস গিয়া লাস দেখিল, আসামীকে গ্রেপ্তার করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আসামী পলাইবার চেষ্টা মাত্র করে নাই।

ইনস্পেক্টর আসিয়া সরেজমিন তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল। যে সকল রমণী দ্বিতলের বিভিন্ন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহারা এইরূপ এজাহার দিল আজ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে, এই ব্যক্তি (আসামীকে দেখাইয়া) সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। আমরা সে সময় সাজ-সজ্জা করিয়া, ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া, খরিদ্দারের অপেক্ষায় নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া ছিলাম। আসামী প্রথমে প্রথম ঘরটির সামনে দাঁড়াইয়া, ভিতরে উপবিষ্টার পানে অল্পক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর আর একটি ঘরের সামনে দাঁড়াইল, তারপর আর একটি—বুঝিলাম খরিদ্দার জিনিস পছন্দ করিতেছে। অবশেষে সে, আমাদের মৃতা সখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট ভেজাইয়া দিল। অতি অল্পক্ষণ পরে সেই ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আমাদের কাণে আসিল। আমরা ভীত হইয়া বাহির হইলাম এবং সেই কামরার দিকে ছুটিলাম। দুয়ার ঠেলিতে উহা খুলিয়া গেল। দেখি আমাদের সখী, মেঝের বিছানো তার শয্যার উপর গলাকাটা অবস্থায় পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং আসামী বিছানার পাশে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাতে একখানা রক্তমাখা ক্ষুর, তাহা দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আমরা খুন খুন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেহ নিস্পন্দ হইয়া গেল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল—তারপর পুলিশও

আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রশ্ন। এ ব্যক্তি কে? মৃতার ঘরে এ কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে?

সকলের উত্তর। মৃতার ঘরে ইহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন আসিতে আমরা দেখি নাই। এ কে তাহা জানি না, পূর্ব্বে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

একতলায় যে রমণীগণ বাস করিত, তাহারা বলিল, সন্ধ্যার একটু পরে এ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উপরে যাইবার সিঁড়ি কোথা? সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে সে উপরে গেল। অল্পক্ষণ পরে উপরে ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিয়া আমরা উপরে গেলাম এবং দেখিলাম—দ্বিতলে রমণীগণ যে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ বলিল। আরও বলিল, আসামীকে পূর্ব্বে তাহারা কোনও দিন দেখে নাই।

পুলিস লাস হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

যথাসময়ে আসামী নরহত্যার ধারায় চালান হইয়া, বিচারার্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরিত হইল।

সে বাড়ীর রমণীগণ পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেও সেইরূপ বলিল। শেষে, যে ডাক্তার সাহেব লাস পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইলেন।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করিলেন। গলার সেই কাটার মাপ,—লম্বায় কতখানি, কোনখানে কতটা গভীর ছিল তাহা বলিলেন। সরকারী উকিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিতে পারেন, এ কাটা suicidal (মৃতা নিজের গলা নিজে কাটিয়াছে) অথবা homicidal (অপর কেহ কাটিয়াছে?)

এখন Medical Jurisprudence গ্রন্থগুলিতে এরূপ অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ নিজের গলা নিজে যদি কাটে, তবে অস্ত্রটা রহিল তার ডান হাতে, সে উহা গলার বাঁ দিকে বসাইয়া, টানিয়া ডান দিকে লইয়া গিয়া থামিল। সুতরাং বাঁ দিকের ক্ষতের গভীরতা হইবে সবচেয়ে কম। গভীরতা ক্রমে বাড়িয়া, বাড়িয়া ডান-দিকে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে হইবে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অন্য কেহ যদি তাহাকে হত্যা করিবার মানসে এইরূপ করে, তবে সে অস্ত্র ধরিবে নিজের ডান হাতে; বসাইবে, যাকে খুন করিতেছে তার গলার ডান-পাশে, সেখানে গভীরতা হইবে সবচেয়ে কম; ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, বাঁ-দিকে যেখানে ক্ষত শেষ হইয়াছে, সেখানে গভীরতা হইবে সবচেয়ে বেশী।—কিন্তু, সকল সময়, গভীরতার এরূপ তারতম্য পাওয়া যায় না—তখন ডাক্তার এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন।

এ মোকদ্দমাতেও ডাক্তার উল্লিখিত কারণে বলিতে পারিলেন না যে, এই কাটা suicidal অথবা homicidal।

আদালত আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিছু বলিতে চাও?"

আসামী। আমি কিছুই বলিব না।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইল। সরকারী উকিল যাহা বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

সেই ঘরে এই ব্যক্তি এবং হত রমণী ছাড়া কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না যে. বলিব হয়ত সেই তৃতীয় ব্যক্তিই হত্যাকর্ত্তা। স্ত্রীলোকটার, নিজের গলা নিজে কাটিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যদি এমন হইত যে, এ ব্যক্তি অনেকদিন হইতে উহার নিকট যাতায়াত করে, দুজনের মধ্যে প্রেম হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মনে করাও যাইত যে, কোনও ঝগড়া-কলহের কারণ, অভিমানে রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, সে বাড়ীতে আসামীকে তাহারা পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। তাহা হইলে, আসামীই রমণীকে হত্যা করিয়াছে ইহা স্থির। কেন করিল? চুরির অভিপ্রায়ে হইতে পারে। হয়ত পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, গলাটি কাটিয়া দিলেই রমণী চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে—তখন সে অভাগিনীর টাকা-কড়ি গহনা পত্র লইয়া বাহির হইয়া কপাটটি ভেজাইয়া চম্পট দিবে। কিন্তু অভাগিনী মৃত্যু-যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করাতেই আসামীর উদ্দেশ্য বিফল হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। হাইকোর্টের আগামী সেসনে. তাহার বিচার হইবে। আসামী প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতবন্ধ রহিল।

ইতিমধ্যে দেশে যুবকের আত্মীয়-স্বজন খবর পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অসম্ভব। ও যে অর্থলোভে নারী-হত্যা করিব, ইহা একেবারে অসম্ভব। সে প্রকৃতির ছেলে ত ও নয়।" তাঁহারা. সেসনে আসামীর পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বড় বড় উকীল কৌঁসুলি নিযুক্ত করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের কাগজ-পত্রের নকল পড়িয়া, এবং আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মুখে আসামীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া, আসামীর উকীলেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। জজের অনুমতি লইয়া, প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া তাঁহারা আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসামীকে বলিলেন, "আসল ঘটনা সমস্ত আমাদের খুলিয়া বল।" আসামী, বলিব না।

উকীল। না বলিলে আমরা তোমার পক্ষাবলম্বন করিব কি করিয়া? ব্যাপার যেরূপ দেখিতেছি, ইহাতে তোমার যে ফাঁসির হুকুম হইতে পারে।

আসামী। হউক। ফাঁসি যাইব। আমি কিছুই বলিব না।

উকীলেরা সেদিন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মিনতি এড়াইতে না পারিয়া, আবার তাঁহারা গিয়া আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপ দুই তিন বার সাক্ষাতে অনেক বুঝানো সুঝানোর পর আসামী অবশেষে আসল ঘটনাটি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিল।

"কলিকাতা হইতে দূরে, অমুক গ্রামে আমার বাস। সেখানে আমার একখানি মণিহারি দোকান আছে, উহাই আমার উপজীবিকা। দুই তিন মাস অন্তর আমি মাল খরিদ করিতে কলিকাতায় আসি। এবারও সেইরূপ আসিয়াছিলাম।

"দশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলি শুনুন। আমার এক কনিষ্ঠা ভগিনী

ছিল, অল্প বয়সে সে বিধবা হইয়া যায়। তার রূপ ছিল, সেই রূপের জন্যই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। ষোল সতেরো বৎসর বয়সে, কোনও দুর্বৃত্তের সহিত সে কুলত্যাগ করে। এই ঘটনায়, লজ্জায় অপমানে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, সমাজে আমাদের মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম কোন আত্মীয়-বন্ধু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতাম, সে মরিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার নামও আমাদের গৃহে আর উচ্চারিত হইত না। সে যে একদিন ছিল, ইহাও আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম।

"এবার কলিকাতায় আসিয়া, মাল খরিদ শেষে, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ভাবিলাম, যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন একটু আমোদ-প্রমোদ করিয়া লই। তাই, সে পল্লীতে গিয়া, সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। গৃহবাসিনীরা যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য। উপরে গিয়া আমি এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া, অবশেষে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট ভেজাইয়া দিয়াছিলাম। "কি গো তোমার নাম কি?"—আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্র, অভাগিনী অতি বিস্মিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার এই ব্যবহারে আমিও বিস্মিত হইয়া, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াই বুঝিলাম, সে আর কেহ নহে, দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কুলত্যাগিনী আমারই সেই ভগিনী। সেও অবশ্য আমায় চিনিয়াছিল। "হা ভগবান!"—বলিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ দেওয়াল-আলমারি হইতে একটা ক্ষুর বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে সে নিজ গলায় বসাইল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে আমি ক্ষুরখানা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলাম। কিন্তু, তৎপূর্ব্বেই তাহার শ্বাসনালী ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সে বিছানায় পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারপর লোকজন আসিয়া পড়িল।"

এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবার পর, আসামী পক্ষের লোকেরা মৃতার কলিকাতা বাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে সে কোন্ বাড়ীতে থাকিত, তার পূর্ব্বে কোন্ বাড়ীতে থাকিত, এইরূপ সন্ধান করিতে করিতে, যে বাড়ীতে তাহার হরণকারী প্রথম তাহাকে আনিয়া রাখিয়াছিল, সে বাড়ী খুঁজিয়া বাহির হইল। সে বাড়ীর বাড়ীউলি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ, নবাগতার সকল পরিচয়ই জানিত—তাহারা আসিয়া সাক্ষী দিয়া প্রমাণ করিল যে, আসামীর উক্তি যথার্থ। জজসাহেব উহা বিশ্বাস করিয়া আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন।

চন্দ্রমুখী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



রাত্রিতে দুই বন্ধু বেশ বিন্যাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ-সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু চুনিলাল কিছুতেই সামান্য পোশাকে বাহির হইতে রাজি হইল না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি চীৎপুরের একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুনিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামীনীর নাম চন্দ্রমুখী—সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল! সে যে এই কয়দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে নিজেই জানিত না। চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদাহের ন্যায় বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, চুনিবাবু এ কোন্ হতভাগা জায়গায় আনলে? তার তীরকণ্ঠ ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুনিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুনিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, চল্ চল্ ভিতরে গিয়ে বসি।

দেবদাস আর কিছু কহিল না—ঘরের ভিতরে আসিয়া নীচের বিছানায় বিষণ্ণ নতমুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া পড়িল। ঝি রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল—দেবদাস স্পর্শও করিল না। চুনিলাল মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঝি কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে চন্দ্রমুখীর হাতেই হুঁকাটা দিয়া প্রস্থান করিল। সে দুই-একবার টানিবার

সময়, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ নিরতিশয় ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য আর কি বিশ্রীই দেখতে।

ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো কথায় ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পেঁছিল। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আরও বার-দুই গুড়গুড় করিয়া শব্দ হইল, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়া আর ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন চুনিলালের হাতে হুঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়গুড় করিয়া হুঁকার শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা যেন বড় ভয়ে ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাৎ নিরর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে, প্রত্যেকেই যেমন নীরবে নিজের মনে ফুলিতে থাকে, এবং ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ মিছা মিছি কহিতে থাকে, তাইত! এমনি তিনজনেই মনে মনে বলিতে লাগিল, তাইত। এ কেমন হইল।

যেমনই হোক, কেহই স্বস্তি পাইতেছিল না। চুনিলাল হুঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না,—তাই। ঘরে দুইজনে বসিয়া রহিল। দেবদাস সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই নয় দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আপনার যখন পায়ের ধুলো পড়েচে—

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, পায়ের ধুলোর কথা নয়। টাকা নাও তো?

তা নিই বৈ কি। না হলে আমাদের চলবে কিসে?

থাক, অত শুনতে চাইনে। বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির করিল এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না কত টাকা দিল।

চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, এরি মধ্যে যাবেন?

দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না, বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা ছাড়া, অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবদাস সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির পথেই চুনিলালের সহিত দেখা হইল। সে আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল কোথায় যাচ্চ দেবদাস?

বাসায় যাচ্ছি।

সে কি হে?

দেবদাস আরও দুই-তিনটি সিঁড়ি নামিয়া পড়িল।

চুনিলাল কহিল, চল আমিও যাই।

দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চল।

একটু দাঁড়াও, একবার উপর থেকে আসি।

না, আমি যাই, তুমি পরে এসো; বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

চুনিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেইভাবে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া কহিল, বন্ধু চলে গেল?

হ্যাঁ।

চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর ত নিয়ে যাও; তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ো।

চুনিলাল কহিল, সে ইচ্ছে করে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন?

এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল; কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল, ইচ্ছে করে নয়, আমরা টাকা নিই বলে রাগ করে দিয়ে গেছে। হাঁ, চুনিবাবু লোকটা কি পাগল?

একটুও না। তবে আজ ক'দিন থেকে বোধ করি ওর মন ভালো নেই।

কেন মন ভালো নেই—কিছু জানো?

না জানিনে। বোধ হয় বাড়িতে কিছু হয়ে থাকবে।

তবে এখানে আনলে কেন?

আমি আনতে চাইনি, সে নিজে জোর করে এসেছিল।

চন্দ্রমুখী এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। কহিল, জোর করে নিজে এসেছিল? সমস্ত জেনে?

চুনিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা বৈ কি! সমস্তই ত জানত। আমি ত আর ভুলিয়ে আনিনি।

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল, চুনি, আমার একটি উপকার করবে?

কি?

তোমার বন্ধু কোথায় থাকেন?

আমার কাছে।

আর-একদিন তাকে আনতে পারবে?

তা বোধ হয় পারব না। এর আগেও কখনো সে এ-সব জায়গায় আসেনি, পরেও বোধ হয় আর আসবে না। কিন্তু কেন বল দেখি?

চন্দ্রমুখী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, চুনি, যেমন করে হোক, ভুলিয়ে আর

একবার তাকে এনো।

চুনি হাসিল; চোখ টিপিয়া কহিল, ধমক খেয়ে ভালবাসা জন্মাল নাকি?

চন্দ্রমুখীও হাসিল; কহিল, না দেখে নোট দিয়ে যায়—এটা বুঝলে না?

চুনি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—না, নোট-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও। কিন্তু সত্যি কথাটা কি বল ত?

চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যিই একটু মায়া পড়েচে।

চুনি বিশ্বাস করিল না; হাসিয়া কহিল, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে?

এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল। বলিল, তা হোক। মন ভালো হলে আর একদিন এনো—আর একবার দেখব। আনবে ত?

কি জানি।

আমার মাথার দিব্যি রইল।

আচ্ছা—দেখব।

চারি-পাঁচদিন পরে একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় চুনিবাবু বাহির হইতেছিল—দেবদাস কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল—চুনিবাবু, সেখানে যাচ্ছ?

চুনিলাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে গেল, হাঁ—না, বল ত আর যাইনে।

দেবদাস কহিল, না যেতে বারণ করচি নে কিন্তু, একটি কথা বল, কি আশায় সেখানে তুমি যাও?

আশা আর কি? এমনি সময় কাটে।

কাটে? কৈ, আমার সময় ত কাটে না! আমি সময় কাটাতে চাই।

চুনিলাল কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি তাহার মনের ভাব মুখে পড়িতে চেষ্টা করিল। তাহার পর কহিল, দেবদাস, তোমার কি হয়েচে খুলে বলতে পারো?

কিছুই ত হয়নি।

বলবে না?

না চুনি, বলবার কিছুই নেই।

চুনিলাল বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া কহিল, দেবদাস, একটা কথা রাখবে?

কি?

সেখানে আর একবার তোমাকে যেতে হবে। আমি কথা দিয়েচি।

যেখানে সেদিন গিয়েছিলাম—সেইখানে ত?

হাঁ—

ছিঃ—আমার ভাল লাগে না।

যাতে ভাল লাগে, আমি করে দেব।

দেবদাস অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, চল যাই।

অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুনিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে।

একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে। অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষণ্নমুখে চাহিয়া চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—দেবদাস, আর খেয়ো না।

দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটি করিল, কেন?

অল্পদিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।

সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাকব বলে শুধু মদ খাই।

এ কথা চন্দ্রমুখী অনেকবার শুনিয়াছে। এক-একবার তাহার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে। দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আড় হইয়া বালিশে হেলান দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, আমার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই এখানে বসে থাকি—জ্ঞান থাকে না, তাই তোমার মুখের পানে চেয়ে কথা কই—চন্দ—র—তবু অজ্ঞান হইনে—তবু একটু জ্ঞান থাকে—তোমাকে ছুঁতে পারিনে—আমার বড় ঘৃণা হয়।

চন্দ্রমুখী চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, দেবদাস, কত লোক এখানে আসে, তারা কখনো মদ স্পর্শও করে না।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিল। টলিয়া টলিয়া ইতস্ততঃ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—স্পর্শ করে না? আমার বন্দুক থাকলে তাদের গুলি করতাম। তারা যে আমার চেয়েও পাপিষ্ঠ—চন্দ্রমুখী!

কিছুক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার পর আবার কহিল, যদি কখনও মদ ছাড়ি—যদিও ছাড়ব না—তা হলে আর কখন ত এখানে আসব না। আমার উপায় আছে, কিন্তু তাদের কি হবে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, বড় দুঃখে মদ ধরেচি—আমাদের বিপদের, দুঃখের বন্ধু! আর তোমাকে ছাড়তে পারিনে,—

দেবদাস বালিশের উপর মুখ রগড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল। দেবদাস ভ্রূকুটি করিল—ছিঃ, ছুঁয়ো না—এখনো আমার জ্ঞান আছে। চন্দ্রমুখী, তুমি ত জান না—আমি শুধু জানি আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব—তবু আসব, তবু বসব, তবু কথা কব—না হলে যে উপায় নেই। তা কি তোমরা কেউ বুঝবে? হাঃ—হাঃ—লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে মাতাল হই—এমন উপযুক্ত স্থান জগতে কি আর আছে! আর তোমরা

দেবদাস দৃষ্টি সংযত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার বিষণ্ন মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে—তোমরাই তার দৃষ্টান্ত!

তাহার পর চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চুপি চুপি কহিতে লাগিল—চন্দ্রমুখী বলে, সে আমাকে ভালবাসে—আমি তা চাইনে—চাইনে—চাইনে লোকে থিয়েটার করে, মুখে চুনকালী মাখে—চোর হয়—ভিক্ষা করে—রাজা হয়—রানী হয়—ভালবাসে—

কত ভালবাসার কথা বলে—কত কাঁদে—ঠিক যেন সব সত্য! চন্দ্রমুখী আমার থিয়েটার করে, আমি দেখি! কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে—একদণ্ডে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল—আর কোন্ পথে আমি চলে গেলাম। এখন একটা সমস্ত জীবনব্যাপী মস্ত অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। একটা ঘোর মাতাল—আর এই একটা—হোক, তাই হোক—মন্দ কি! আশা নেই, ভরসা নেই—সুখও নেই, সাধও নেই—বাঃ! বহুৎ আচ্ছা—

তাহার পর দেবদাস পাশ ফিরিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না। অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ভিজাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত বালিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাখা লইয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

॥ ২ ॥

পিতার মৃত্যুর ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটীতে থাকিয়া, দেবদাস একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সুখ নাই, শান্তি নাই, একান্ত একঘেয়ে জীবন।

দেবদাস জননীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিন চারদিন ধরিয়া দেবদাস চুনিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ করিল। একবার দেখা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে মোটেই মনে পড়ে নাই। দেবদাসের যেন একটু লজ্জা করিল, একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই চন্দ্রমুখীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল—এখানে নয়।

সম্মুখে—একটা গ্যাসপোস্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল বলতে পার সে স্ত্রীলোকটি কোথায় গেছে?

জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, তুমি কি দেবদাস?

হাঁ।

দাঁড়াও দোর খুলে দিই।

দ্বার খুলিয়া সে কহিল এস—

কণ্ঠস্বর যেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকারও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, চন্দ্রমুখী কোথায় বলতে পার?

স্ত্রীলোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, পারি: ওপরে চল।

এবার দেবদাস চিনিতে পারিল—অ্যাঁ, তুমি?

হাঁ আমি। দেবদাস আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

উপরে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্রমুখীর পরনে কালাপেড়ে ধুতি, কিন্তু মলিন

হাতে শুধু দুগাছি বালা, অন্য অলঙ্কার নাই। মাথার চুল এলোমেলো। বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী পূর্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছে। কহিল, তোমার অসুখ হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া কহিল, শারীরিক একটুও নয়। তুমি ভাল করে বোস।

দেবদাস শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মত তাহারও দুর্দশার সীমা নাই। একটিও আসবাব নাই—আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিষ্কৃত, দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, লোহার কাঁটি এখনো পোঁতা আছে, দুই-একটায় ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্রাকেটের উপর আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশেপাশে মাকড়সা মনের মত করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈল-দীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে—তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরনের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল চন্দ্র, এমন দুর্দশা কেমন করে হ'ল?

চন্দ্রমুখী ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, দুর্দশা তোমাকে কে বললে? আমার ত ভাগ্য খুলেচে।

দেবদাস বুঝিতে পারিল না; কহিল, তোমার গায়ের গয়নাই বা গেল কোথায়?

বেচে ফেলেচি।

আসবাবপত্র?

তাও বেচেচি।

ঘরের ছবিগুলোও বিক্রি করেচ?

এবার চন্দ্রমুখী হাসিয়া সম্মুখের একটা বাড়ি দেখাইয়া কহিল, ও-বাড়ির ক্ষেত্রমণিকে বিলিয়ে দিয়েচি।

দেবদাস কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু কোথায়?

বলতে পারিনে। মাস-দুই হ'ল ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসেনি।

দেবদাস আরও আশ্চর্য হইল—ঝগড়া কেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, ঝগড়া কি হয় না?

হয়। কিন্তু কেন?

দালালি করতে এসেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

কিসের দালালি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, পাটের। তার পর কহিল, তুমি বুঝতে পার না কেন? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল, মাসে দু'শ টাকা, একরাশ অলঙ্কার, আর দরজার সুমুখে এক সেপাই। বুঝলে?

দেবদাস বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, কৈ, সে-সকল ত দেখিনে?

থাকলে ত দেখবে। আমি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম!

তাদের অপরাধ?

অপরাধ বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

দেবদাস বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল, সেই পর্যন্ত আর কেউ এখানে আসেনি?

না। সেই পর্যন্ত কেন, তুমি যাবার পরদিন থেকেই এখানে কেউ আসে না। শুধু চুনি মাঝে মাঝে এসে বসত, কিন্তু মাস দুই থেকে তাও বন্ধ।

দেবদাস বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে কহিল, চন্দ্রমুখী, তবে দোকানপাট সব তুলে দিলে?

হাঁ—দেউলে হয়ে পড়েচি।

দেবদাস সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল, কিন্তু খাবে কি করে?

এই যে শুনলে কিছু গহনাপত্র ছিল, বিক্রি করেচি।

সে আর কত?

বেশী নয়। প্রায় আট-ন'শ টাকা আমার আছে। একজন মুদীর কাছে রেখে দিয়েচি—সে আমাকে মাসে কুড়ি টাকা দেয়।

কুড়ি টাকায় আগে ত তোমার চলত না?

না, আজও ভাল চলে না। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকী, তাই মনে করচি, হাতের এই দুগাছা বালা বিক্রি করে, সমস্ত পরিশোধ করে দিয়ে আর কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে?

তা এখনো স্থির করিনি। কোন সস্তা মুলুকে যাব—কোন পাড়াগ্রামে—যেখানে কুড়ি টাকায় মাস চলে।

এতদিন যাওনি কেন? যদি সত্যই তোমার আর-কিছু প্রয়োজন নেই ত এতদিন মিথ্যা কেন ধার করে বাড়ালে?

চন্দ্রমুখী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার জীবনে এ কথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল। দেবদাস বলিল, চুপ করলে যে?

চন্দ্রমুখী শয্যার একপ্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—রাগ করো না; যাবার আগে আশা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। ভাবতাম তুমি হয়ত আর-একবার আসবে। আজ তুমি এসেচ, এখন কালই যাবার উদ্যোগ করব। কিন্তু কোথায় যাই, বলে দেবে?

দেবদাস বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, শুধু আমাকে দেখবার আশায়? কিন্তু কেন?

একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি, বোধ হয় তাই। আজ তোমার মনে পড়বে কিনা জানিনে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে—যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম; কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্বে কত লোক এখানে এসেচে গেছে, কিন্তু কারো ভিতরে কখনো তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত,

উপযুক্ত অথচ অনুচিত রূঢ় ব্যবহার ; ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাশার মত কিছু দিয়ে গেলে। এসব মনে পড়ে কি ?

দেবদাস চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রমুখী পুনরায় কহিতে লাগিল, সেই অবধি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা নূতন জিনিস দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে পারিনি—তুমি এলে বড় ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই ভাল লাগত না। তার পর আবার কি যে মতিভ্রম ঘটল—এই দু'টো চোখে অনেক জিনিসই আর একরকম দেখতে লাগলাম। পূর্বের 'আমি'র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম—যেন সে 'আমি' আর নয়। তার পরে তুমি মদ ধরলে। মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার ওপর বড় রাগ হ'ত। তুমি মাতাল হলে রাগ হ'ত না; কিন্তু বড্ড দুঃখ পেতাম।—বলিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসের পায়ের উপর হাত রাখিয়া ছলছল চক্ষে কহিল আমি বড় অধম, আমার অপরাধ নিয়ো না। তুমি যে কত কথা কইতে, কত বড় ঘৃণায় সরিয়ে দিতে ; আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লে—থাক্ সে-সব কথা বলব না, হয়ত আবার রাগ করে বসবে।

দেবদাস কিছুই কহিল না—নূতন ধরনের কথাবার্তা তাহাকে কিছু ক্লেশ দিতেছিল। চন্দ্রমুখী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিল, একদিন তুমি বললে—আমরা কত সহ্য করি। লাঞ্ছনা, অপমান—জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রবের কথা—সেইদিন থেকেই বড় অভিমান হয়েছে—আমি সব বন্ধ করে দিয়েছি।

দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দিন চলবে কি করে ?

চন্দ্রমুখী কহিল সে ত আগেই বলেছি।

মনে কর, সে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়—

চন্দ্রমুখী ভয় পাইল না। শান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য নয়. কিন্তু তাও ভেবেছি। বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নেব।

দেবদাস ভাবিয়া কহিল, তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উদ্যোগ কর।

কালই করব। বালা দু'গাছা বেচে, একবার মুদীর সঙ্গে দেখা করব।

দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল, বালা বিক্রি ক'রো না, তবে মুদীর সঙ্গে দেখা ক'রো। কিন্তু যাবে কোথায় ? কোন তীর্থস্থানে ?

না দেবদাস। তীর্থধর্মের উপর আমার তত আস্থা নেই। কলকাতা থেকে বেশী দূরে যাব না, কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব ?

কোন ভদ্র-পরিবারে কি দাসীবৃত্তি করবে ?

চন্দ্রমুখীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীন ভাবে স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব ? শরীরের দুঃখ কোনদিন সইনি, এখনো সইতে পারব না। আর বেশী টানাটানি করলে হয়ত ছিঁড়ে যাবে।

দেবদাস বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ হাসিল ; কহিল, কিন্তু শহরের কাছে থাকলে আবার

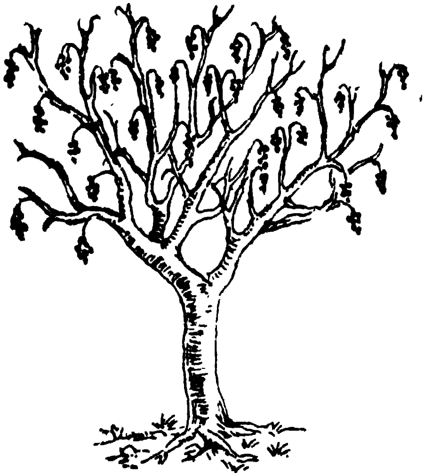
হয়তো প্রলোভনে পড়বে—মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই।

এবার চন্দ্রমুখীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল, সে-কথা সত্যি, মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই বটে. কিন্তু আমি আর প্রলোভনে পড়ব না। স্ত্রীলোকের লোভ বড় বেশী তাও মানি, কিন্তু যা-কিছু লোভের জিনিস যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করচি তখন আর আমার ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঝোঁকের ওপর ছাড়তাম, তাহলে হয়ত সাবধান হবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একটা দিনও ত আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি। আমি যে বেশ সুখে আছি।

তথাপি দেবদাস মাথা নাড়িল ; কহিল, স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল—বড় অবিশ্বাসী।

এবার চন্দ্রমুখী একেবারে কাছে আসিয়া বসিল। হাত ধরিয়া কহিল, দেবদাস !

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিল, এখন আর বলিতে পারিল না—আমাকে স্পর্শ ক'রো না।



কুসুম

হেমেন্দ্রকুমার রায়



॥ ক ॥

সে পতিতা। জীবনের ক্ষণিক ভ্রমেতে নয়,—বিধাতার বিধানে সে পতিতা।…

পঙ্কের ভিতরে পদ্মের মতই কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

*　　　　*　　　　*

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিবার আগেই, পথের ধারের বারান্দায় কুসুম তাহার রূপের প্রদীপ উজল করিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার প্রাণ তখন কাঁদিত, মুখ হাসিত।

রাস্তার লোকগুলা যেন 'উর্দ্ধমুণ্ড' ব্রত গ্রহণ করিয়াছে,—সকলের চোখ তাহার উপরে! তাহাদের সেই নিষ্ঠুর, ক্ষুধিত, ও ঘৃণিত দৃষ্টির মাঝে কুসুম, বিশ্বের নারী জাতির প্রতি মৌন ধিক্কারকে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাইত।

রাস্তায় গাড়ীর পর গাড়ী ছুটিতেছে। এক একখানা গাড়ীর খড়খড়ি কপাট সব তোলা। কিন্তু কুসুম দেখিত, খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে কুললক্ষ্মীদের কৌতূহলী দৃষ্টি বাহিরের মুক্ত আলোর দিকে একাগ্র হইয়া আছে। সে দৃষ্টি কুসুমের উপর পড়িলেই সচকিত হইয়া উঠিত। কুসুমের মনে হইত, যে পবিত্র নয়নের নির্মল দৃষ্টি যেন বিদ্যুতাগ্নির মত তার দেহ-মনকে ঝলসাইয়া দিয়া যাইতেছে! মরমে মরিয়া কুসুম, বারান্দার রেলিঙ্গে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিত। দেহের ভিতর হইতে তাহার নারী প্রাণ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত, 'এরূপের প্রদীপ নিবিয়ে দাও,—ওগো কঙ্কালের বাঁধন খুলে দাও।'

॥ খ ॥

বারান্দা হইতে কুসুম সেদিন উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিল, ট্রামগাড়ী থেকে নামিতে গিয়া একটি ভদ্রলোক পা ফস্কাইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলেন। গাড়ীসুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ

করিয়া উঠিল,—কিন্তু গাড়ী না থামাইয়া চালক আরও জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল।

পাথরে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধ একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিপাশে ক্রমেই লোক জড় হইতে লাগিল।

একজন বলিল, "ওহে, মাথা দিয়ে রক্ত পড়চে যে।"

আর একজন বলিল, "মরে যায় নি ত ?"

আর একজন বলিল, "উঁহু?"

আর একজন বলিল, "মরে নি, কিন্তু মরতে কতক্ষণ। চলহে এখনি পুলিশটুলিস এসে পড়বে, আর সাক্ষী মেনে থানায় ধরে নিয়ে যাবে।"

বারান্দার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকুলচোখে কুসুম দেখিল, সবাই গোলমালই করিতেছে, বৃদ্ধকে সাহায্য করা কাহারও ইচ্ছা নয়।

কুসুম আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল।

ভিড় ঠেলিয়া সে ভিতরে গেল। অচেতন বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিয়া কুসুম বলিল, "আপনারা এঁকে দয়া করে আমার ঘরে তুলে দিয়ে আসবেন ? নৈলে ইনি মারা যাবেন।"

তিন-চারজন লোক ছুটিয়া আসিল।

ভিড়ের ভিতরে ফিসফিস করিয়া একজন বলিল, "বুড়োটা এর কে রে ?"

আর একজন বলিল, হেঁ! তা আর বুঝতে পারচ না ম্যাড়াকান্ত ?"—সে একটা অর্থপূর্ণ ঈশারা করিল। অনেকেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুসুম সে সব কানেও তুলিল না। চোখ নামাইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

চারজন লোকে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে তুলিয়া ধরিল। তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই; মাথায় রক্ত পড়াও বন্ধ হয় নাই। তাঁর মুখ একদিকে হেলিয়া আছে,—হাত দুখানি অসহায়ভাবে দুদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুসুম আস্তে আস্তে হাত দুটি আবার বৃদ্ধের বুকের উপরে তুলিয়া দিল।

পিছন হইতে কে একটা অসভ্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যত্ন করবার এমন মনের মানুষ পেলে আমিও বাবা, দিনে দুশোবার ট্রাম থেকে পড়ে যেতে রাজী আছি।"

॥ গ ॥

একরাত একদিন গিয়াছে,—বৃদ্ধ তেমনি অজ্ঞান।

কুসুম একরকম খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে।

সে নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া বৃদ্ধের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছে; রাতভোর জাগিয়া বিছানার পাশে বসিয়া তাঁকে পাখার হাওয়া করিয়াছে। বাড়ির তলায় একজন ডাক্তার থাকিত, কুসুম তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু সকাল গেল, বিকাল গেল—কৈ রোগীত এখনো চোখ মেলিয়া চাহিলেন না। কুসুম ভাবনায় পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়া কুসুম দেখিল, গা যেন আগুন।

ভয় পাইয়া তখনি সে চাকরকে একজন নামজাদা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিল।

ডাক্তার আসিল। সে বয়সে যুবক। সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিল, "এ'র অবস্থা বড় ভাল নয়।"

কুসুম কাতরে বলিল, "তবে কি হবে?"

"ভাল করে চিকিৎসা হলে, বিশেষ কোনো ভয় নেই।"

রোগীর মাথায় 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া ও 'প্রেসক্রিপসন' লিখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম, ডাক্তারের হাতে 'ভিজিট'-এর টাকা কটা গুঁজিয়া দিল।

আঙ্গুল দিয়া টাকাগুলি অনুভব করিতে করিতে কুসুমের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিল, "ইনি তোমার কে?

কুসুম কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, কিন্তু তার আগেই ডাক্তার বলে, "ইনি বুঝি..."

ডাক্তার কি বলিবে, সেটা আগে থাকিতেই আন্দাজ করিয়া তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই কুসুম সবেগে মাথা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল' "না, না, না।"

তবে?

কুসুম অল্প দু-চার কথায় সব বুঝাইয়া দিল।

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "দেখ, তুমি এক কাজ কর এ'কে কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ভাল চিকিৎসাও হবে, আর হঠাৎ কিছু হলে তোমারও কোন দায়দোষ থাকবে না।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ডাক্তারের কথা একমনে শুনিতেছিল। এখন, হঠাৎ সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "আমিও তাই বলি ডাক্তারবাবু। দ্যাখদিকিন, কোত্থাকার আপদ কার ঘাড়ে এসে পড়ল। ও ছুঁড়ীর মতিচ্ছন্ন হয়েছে,— আমার কথাতে কিছুতেই ও কান পাত্বে না। আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় কোন রকমে দুটাকা পাঁচটাকা ঘরে আসে, তা ও হ্যানরে ত্যানরে, রুগীরে ডাক্তার রে, ওষুধ রে পত্তি রে,— ভালমানুষের ওসব কি পোষায়, না ভাল দ্যাখায়? তা তুই—"

কোন রকম উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনমনে সে গড়্গড়্ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "যা তুই থাম বলছি।"

"থাম্‌ব? কেন থাম্‌ব? হক্ কথা বলব, না—"

"ফের যদি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করবি না, তাহলে এই ঘট দিয়ে—" বলিতে বলিতে কুসুম জলের ঘটির দিকে হাত বাড়াইল।

কুসুমের মা ভয় পাইয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল, এবং সেখান হইতে অকথ্য ভাষায় মেয়েকে গালি পাড়িতে লাগিল।

সে দিকে কান না পাতিয়া কুসুম ডাক্তারকে বলিল, "এ'র জ্ঞান হবে কখন?"

ডাক্তার এতক্ষণ চুপটি করিয়া কি এক চোখে কুসুমের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "আজ রাতেই জ্ঞান হতে পারে। তবে, বলা যায় না।"—

তারপর হাত বাড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে, আমি এখন চল্লুম।"

"আসুন",—কুসুম ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিল, "দেখ, তোমার 'ভিষিটে'র টাকা ফিরিয়ে নাও।"

কুসুম বিস্ময়স্বরে বলিল, "কেন?"

ডাক্তার স্নিগ্ধচোখে কুসুমের চকিত চোখের দিকে চাহিয়া শুধু বলিল, "না।"

কুসুম অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তির সহিত কহিল, "কেন নেবেন না, বলুন আপনি।"

কুসুমের মনের ভাব বুঝিয়া ডাক্তার মুখ টিপিয়া নীরব হাস্য করিল। তারপর হাতের টাকাগুলো ঝন্‌ ঝন্‌-শব্দে বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, জুতা মস্‌মস্‌ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আপনমনে অস্ফুট ও দুঃখিত কণ্ঠে বলিল, "এমন পোড়া মন নিয়ে সংসারে এসেছি যে, সাধুকেও সন্দেহ হয়।"

॥ ঘ ॥

অনেক রাতে রোগীর জ্ঞান হইল।

পাশ ফিরিয়া থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "বুক জ্বলে যাচ্ছে—একটু জল।"

পাখার বাতাস করিতে করিতে তখন কুসুমের সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রোগীর গলা শুনিয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে একটা কাঁচের গেলাসে জল গড়াইয়া সে রোগীর মুখের কাছে ধরিল।

জলপান করিয়া রোগী আরাম পাইলেন। কুসুম তাঁহার তপ্ত কপালে আপনার ঠাণ্ডা হাতদুখানি আল্‌তোভাবে বুলাইয়া দিতে লাগিল। তিনি "আঃ বলিয়া চোখ বুঁজিলেন।

খানিক পরে আবার তাহার তৃষ্ণা পাইল। কুসুম আবার জল দিল।

রোগী খানিকক্ষণ বিষণ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, "কে? মা সুধা?

মুখ ফিরাইয়া কুসুম বলিল, "না, না! আমি পোড়াকপালী!"

রোগী চোখ খুলিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, "এত রাতে অবধি জেগে আছিস মা।" মা! সে-কি কথা, সে কি সুর!—কুসুমের সারা বুক ভরিয়া উঠিল। খাটের পরে মাথা রাখিয়া সে একমনে, সেই সুর আপন মনের মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুনিতে লাগিল।

তার বোধ হইল, সে যেন এই বিপন্ন বৃদ্ধের আপন কন্যা। বাবা যে কেমন, কুসুম তো একথা কখনোই জানে নাই,—আজ যেন তারই একটা অজানা আনন্দের আভাস প্রাণে তার জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের দরজায় বাহির হইতে করাঘাত হইল।

কে ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম শুনিয়াও শুনিল না। সে তখনও বুঝি মা-ডাক্ শুনিতেছে।

"কুসুম!—অ আমার কুসুম কলি।"

কুসুম চুপ।

"ও কুসুম, শুনচ?" সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক বাজখাই গলায় একটা গান ধরিয়া বসিল। সেত গান নয়—যেন ষাঁড়ের ডাক্!

এবারে কুসুমের মনে ভারি ভয় হইতে লাগিল,—রোগী যদি শুনিতে পান?

(হঠাৎ গান থামাইয়া) "ওগো কুসুম,—ও—" কিন্তু কথা শেষ হইতে-না-হইতেই হঠাৎ নীরবে দরজাটা খুলিয়া গেল এবং বিদ্যুতের মত বাহিরে মুখ বাড়াইয়া নিম্ন অথচ তীব্রস্বরে কুসুম বলিল, "ফের যদি কুসুম কুসুম কর্‌বে, তাহলে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। বেরোও এখানে থেকে—।

যেমন সহসা দরজাটা খুলিয়াছিল অমনি সহসা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

॥ ঙ ॥

পরদিনের সন্ধ্যাবেলা। কুসুম জানালার কাছে একলাটি বসিয়াছিল!

আজ সকালে রোগীর জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া উঠাতে কুসুম ভয় পাইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। না দিয়া আর উপায় কি?

আপন জীবনের মলিনতা, কুসুমকে সবসময়েই কাতর করিয়া রাখিত। ওই মলিনতার ভিতরে থাকিয়াও, সে যে একটা ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও মন তার সন্তোষ ও পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল।

আর, রোগীর উপরে তার কেমন একটা মায়াও পড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর সেই রোগকাতর মুখখানি এখনও তার প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল।

দিনের ভিতরে চার-পাঁচবার চাকর পাঠাইয়া কুসুম রোগীর খবর লইয়াছে। জানিয়াছে যে, রোগীর বাড়ীর লোকেরা কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে।

* * * *

তিন-চারদিন পরে শুনিল, রোগীর জ্বর বন্ধ হইয়াছে, কাল তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরিবেন।

একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কুসুম ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। ঠিক করিল আজই সে রোগীকে একবার দেখিতে যাইবে।

॥ চ ॥

হাসপাতালের সমুখে আসিয়া কুসুম গাড়ী হইতে নামিল। ফুলদার রেশমী চাদরখানি মাথার উপরে টানিয়া দিয়া চাকরের সঙ্গে চলিল। চাকর তাহাকে রোগীর ঘর চিনাইয়া দিল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া কুসুম ভিতরে ঢুকিল।

একটা বালিসে ঠেসান দিয়া বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। পাশে একটি যুবক ও একটি

বয়স্কা রমণী। বৃদ্ধ কি কথা কহিতেছিলেন,—হঠাৎ কুসুমকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

কুসুম সঙ্কুচিতভাবে আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া ভক্তিমতী কন্যার মত প্রণাম করিল।

কুসুমের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বৃদ্ধ বলিলেন, "কে মা তুমি?"

কুসুম মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে চিনতে পারছেন বাবা?"

ভাল করিয়া কুসুমের মুখ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "হুঁ, চিনি-চিনি করচি বটে! বোধ হয়—বোধ হয়, অসুখের সময়ে তোমাকে কোথায় দেখেচি। তাই নয় কি?"

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল। হ্যাঁ।

"রোসো—রোসো, মনে পড়েচে। তুমি কি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে আমাকে জল খেতে দিয়েছিলে?

ট্রাম থেকে পড়ে গেলে পর আপনাকে আমি আমার ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমার বাড়ীতে দু-রাত ছিলেন। তারপর আপনার জ্বর বেড়ে ওঠাতে আমি ভয় পেয়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দি। আপনি ভাল আছেন শুনে একবার দেখে যেতে এসেছি।"

বৃদ্ধ মুখ নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর, কুসুমের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার খরচোখে দেখিয়া লইয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তোমার ঘরে, তোমার হাতে আমি জল খেয়েচি, বল কি; অ্যাঁ!"

বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া কুসুম থ হইয়া গেল।

তীব্রস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, আরও মনে পড়্চে। তুমি আমাকে দুধ আর সাবুও খেতে দিয়েছিলে।" একটু থামিয়া হঠাৎ বিছানার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া, উগ্রকণ্ঠে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "গণিকা তুই,—জানিস্, আমি ব্রাহ্মণ!"

কুসুমের মাথা হেঁট হইয়া গেল।

"আমার জাত মেরেছিস্? তার চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন? আমি মরে গেলাম না কেন? পাপিষ্ঠা, আবার কি কর্তে এখানে এসেছিস্ তুই?"

কুসুম কিছু বলিতে পারিল না। আরষ্ট ও জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বলিলেন, "কথা ক! বল্, কি চাস তুই? বখ্‌শিষ্?"

বখ্‌শিষ্!—কুসুমকে ঠিক যেন কে একটা ধাক্কা মারিল। গর্বিতভাবে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "হ্যাঁ?"

বালিশের তলা থেকে একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া, বৃদ্ধ অবজ্ঞাভরে কুসুমের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নোটখানা কুসুমের গায়ে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কুসুম হেঁট হইয়া নোটখানা তুলিয়া লইল। তারপর কোন দিকে না-চাহিয়া

নতমুখে দৃঢ়পদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

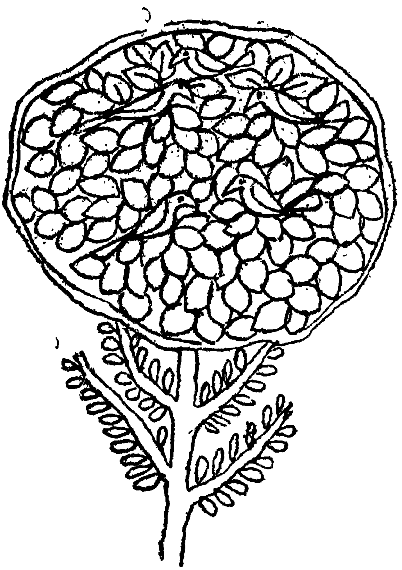
কুসুম, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা খোঁড়া ভিখারী হাত পাতিয়া বলিল, "মা কিছু ভিক্ষে দাও মা।"

কুসুম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নোটখানা ভিখারীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ভিখারী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর কুসুমের পায়ের তলায় পড়িয়া গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিল, "জয় হোক্‌ রাজা-মা,—জয় হোক।"

কিন্তু সে জয়ধ্বনি কুসুমের কানে প্রবেশ করিল না। বধির হইয়া সে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিল,—হায়, তাহার অশ্রু-অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার!



আদরিণী

প্রেমাঙ্কুর আতথী



ভাদ্র মাসের এক পড়ন্ত বেলায় খালধার দিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের ঠেলায় শহরবাসীরা অস্থির। মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁর তাজ্যসন্তান বঙ্গবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা চালান তারই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খালধারের মেটে রাস্তার ধুলোয় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ঠ সংস্করণ হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হ'য়ে গেল। বরাতে দুঃখ আছে ভেবে দৌড়ে-হাঁটা শুরু করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুদূর যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু'চার জন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ী, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর ঝোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপর বলাৎকার শুরু ক'রে দিলে।

অনন্যোপায় হ'য়ে কাকভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ী অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশপাশের চারদিকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ হলো। গলিটা বেশ চওড়া—দু'খানা গরুর গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। গলির দু'ধারেই খোলার বাড়ী—একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ীর গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথায় লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চ্যাঁচাচ্ছিল—সে আক্ষেপের মধ্যে আল্লা ও খোদার বাহুল্য শুনে মনে হ'লো সে ব্যক্তি মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে সামনের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চিৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে, কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এপারে দাঁড়িয়ে ভিজে লোকটার কৃচ্ছ্র সাধনা দেখছি আর মনেমনে গবেষণা করছি, আল্লা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হ'য়ে পড়ল। বৃষ্টিধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চেপে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলসমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়া শ্রেয়ঃ এই রকম একটা সংকল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার কানের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হ'লো—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ-তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মেঘের মত ময়লা। একখানা ছেঁড়া শাড়ী দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত! শাড়ীখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়েছে, তার ছিন্ন অবকাশ দিয়ে উত্তমাঙ্গের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিনীর মত কৃশ নয়, বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কমনীয়তা ও লাবণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিনী আবার বললে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা।

দেখলুম সে থর-থর করে কাঁপছে।

বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠল—একটি পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু কি অদ্ভুত চাহনি সে চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি খুব কমই দেখেছি। হতশ্রী মালঞ্চের এক কোণে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নির্জন স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বুকে ফুটে উঠতে দেখা যায়, তার দৃষ্টিতে যেন সেই ব্যথা স্থির হয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না ক'রে একটা পয়সা পকেট থেকে বের ক'রে তার হাতে দিলুম।

ওপারে সেই অন্ধ বৃদ্ধ তখনো তারস্বরে খোদাকে আবেদন জানাচ্ছে, বৃষ্টিধারা

সমানে চলেছে। মেঘমণ্ডিত স্তিমিত সূর্যালোক আমার চারদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে দাঁড়াল। তারপরে হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধের হাতে পয়সাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়ীটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। মনে হ'তে লাগল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বুড়োরই কেউ হবে, চারিদিক থেকে ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এসে বুড়োর কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়ীটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে ঢুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। ওরি মধ্যে কখনো চেপে আসে, কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সন্ধ্যে হ'য়ে এলেও মেঘ কেটে যাওয়ায় তখনো একটু আলো আছে। বৃদ্ধ ভিখারীর চিৎকার একটু মন্দা পড়েছে, বোধ হয় সারাদিন চেঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ীর দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম, একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চামচিকের মতন কালো আর রোগা, ধপধপে সাদা একখানা চওড়াপাড় শাড়ী পরা—চুল বাঁধার বাহার দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে—কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়ীটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম সেখানকার দরজাতেও দু'চার জন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছে। অন্ধকার ঘোর হবার আগেই তারা বেসাতি খুলে বসল। দেখলুম ওপারের সেই অন্ধ বৃদ্ধও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই দেখলুম, আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিনী পরিষ্কার কাপড় পরে দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বৃষ্টিও একেবারে থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ চেয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হ'য়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিনীর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিংড়ে কাঁধে ফেলেছিলুম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হ'য়ে ভিখারিনীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একেবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাস ও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দোব না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত্র পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি ?

—আদরিণী, আৎরী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিট্‌মারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ ?

প্রশ্ন শুনেই আৎরী হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—আহা কত ঢংই জান ! আজ কি নেশা করা হয়েছে শুনি ?

এই বলেই সে ভিজে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বললে—দাঁড়াও। উনুনের ধারে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসি—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোট জায়গায় এসে আজ জামাটাই বুঝি আক্কেলসেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখুনি সে ফিরে এসে বললে—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

তারপর আমার ধুতিটাতে হাত দিয়ে বললে—এঃ ধুতিও যে ভিজে গিয়েছে। একখানা শাড়ী পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ী নিয়ে এসে বললে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধুতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বললুম—ও এখুনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হ'য়ে ব'সে তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি !

শাড়ীখানা ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না ?

—তুমি তো মোড়ের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু'তিনবার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দেবো ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমায় ঠেসে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—আপনি কি পুলিশের লোক ? বাবা আমি কোনো দোষ করি নি, আমার ওপর কোনো অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা দু'টো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লুম। কেন যে আদরিণী অতখানি বাড়াবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—আমি মোটেই পুলিশের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বললে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—বাবার বয়েস কত?—

তেইশ বছর!

আদরিণী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে—বেশ হ'লো, বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে ঝঙ্কার দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে! কে এয়েছে?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্তে চুপ ক'রে থেকে সে বলে উঠল—তোর বর এয়েছে। রাস্তা থেকে তোর বর নিয়ে এয়েছি—আয় না ভেতরে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে হ'লো দীনবন্ধু মিত্তিরের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে এল।

আদরিণী বললে—দেখ্ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে এনেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয়?

—মুখ্যে আগুন! দিনে দিনে কত রঙ্গই হচ্ছে! নে নে আদিখ্যেতা রেখে শাগগির কর। আবার লোক আসবে—

এই বলে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আদরিণী হাসতে হাসতে বললে - কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে আমার মাকে?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি?

আদরিণী অন্যদিকে মুখ করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। দেখলুম আমার ধপধপে সাদা সিল্ক টুইলের সার্ট ধোঁয়ায় প্রায় কালো হ'য়ে গিয়েছে আর তা থেকে মাছের ঝোল আর ধোঁয়া মিলিয়ে এমন বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে, গায়ে দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে কাছে রাখলে বমি ঠেলে আসে।

জামাটাকে গুটিয়ে পাশে রেখে বললুম—রসিকতা তো খুব হ'লো, এবার আমার কথার জবাব দাও দিকিন।

— কি বল?

আমার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ঐ যে অন্ধ বুড়োটাকে দিলে, ও তোমার কে হয়?

আদরিণী কিছুক্ষণ অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ও

তুমিই বুঝি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলে! এতক্ষণে বুঝেছি!

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার?

—কে আবার হবে! ও তো মোচলমান!

—তবে?

আদরিণী কোনো কথা বললে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বললুম—তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন? আর কার জন্যেই বা কর?

আদরিণী চট ক'রে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কি দেখে ফিরে এসে বললে—বাবা, আজ তুমি বাড়ী যাও, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে—বলব—তোমাকে আমার সব কথা বলব, কিন্তু আজ নয়—কবে আসবে বল?

—আবার আসতে হবে?

—নিশ্চয় আসতে হবে। ভুলো না, আমি তোমার মেয়ে।

আদরিণী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কি জাত?

—জাতটাত আমি মানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোত্তর?

—ভরদ্বাজ।

—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল—পরশু এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ী ছিল। কলকাতায় রসসুইয়ে বামুনের কাজ ক'রে সে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই বাড়ীতে তুললে। বছরখানেক যেতে না যেতেই তার এক ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে থাকতেই বাড়ীউলির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী তার মা-মরা ভাইটিকে মানুষ করতে লাগল।

ভাইটি তার কাছেই থাকে, সেই তাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। তার ওপরে নতুন মার সঙ্গে খাটে, সংসারের কাজে যোগান দেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে আনে। দোষ করলে বাপও ঠেঙায়, নতুন মাও ঠেঙায়—গালাগালিগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এমনি ক'রে দিন চলছিল। যখন তার দশ এগারো বছর বয়েস, সেই সময় তার বাপ মারা গেল। বাপ মারা যেতে নতুন মা তাকে এক বাবুদের বাড়ী বাসনমাজার কাজে লাগিয়ে দিলে। সকালবেলা উঠে সে তার ভাই নন্দকে নিয়ে বাবুদের বাড়ী চলে যেত কাজ করতে, আর বাড়ী ফিরত রাত্রি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই দু'বেলা খেতে পেত। দু'টাকা তার মাইনে ছিল বটে; কিন্তু সে টাকা সে পেত না।

তার নতুন মা ঠিক সময়ে বাবুদের কাছে গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আসত—ছেলে-মানুষ হারিয়ে ফেলতে পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিকামনের অভিমান। নন্দর জামাকাপড় কোনো কিছুর খরচই নতুন মা দেয় না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে বাবুদের বাড়ী থেকে নন্দকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে। দু'চার পয়সা যা পায়, তাই জমিয়ে ভাইকে জামাকাপড় কিনে দেয়। মধ্যেমধ্যে বাবুদের বাড়ীর ছোট ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে এসে সংসার পাতবে, দিদির দুঃখ ঘোচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ। এই লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট সহ্য করতে রাজী।

নন্দর ছ'বছর বয়স হ'লো। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামাকাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছুই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশি জেদাজেদি আরম্ভ করায় নতুন মা বললে—আমি এত পয়সা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার পয়সা রোজগার ক'রে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে তারও বয়েস বেড়েছে—বিনা সুপারিশে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মত ক'রে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশ্যা-বৃত্তি তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়, আর তারই খরচ যোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাত্রে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পয়সা তুই রাখিস—তার আগে একটি পয়সাও পাবি নে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে ক'রে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কাটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধি বিড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইস্কুলের মাইনে তাতেই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেললে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিসনি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'লে আমার দুঃখ ঘুচবে?

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মাও তার সঙ্গে সায় দিলে। বললে—এতগুলো ক'রে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—যদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায়দায়, হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মাঝেমাঝে রাতে বাড়ী আসে না।

বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ী আসে—চুল উস্কোখুস্কো, চোখ রাঙা।

নতুন মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোকে আর খেতে দিতে পারব না—বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

আদারিণী তাকে বোঝায়। নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সন্ধান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা করে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন মা তাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে। আদারিণী তাকে কত মানা করলে। বললে, যাস্‌নি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি রইল। দু'দিন থাক, দেনাটা শোধ হ'য়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব?

নন্দ শুনলে না, চলে গেলে।

আদারিণীর সংসার শূন্য হ'য়ে গেল। ভাইকে মানুষ ক'রে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে ক'রে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল। এইজন্য তেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালো মেঘ এসে তার মানসউদ্যান ছেয়ে ফেললে, তার জীবন অন্ধকার হ'য়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল, সে ই অতি বড় আঘাত দিয়ে তাদের সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুক্ষ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়াখাওয়া হয় নি! সে পয়সা চায়। কিন্তু আদারিণী পয়সা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেরতে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু'তিন ঘুরে বেশ রোজগার হ'তে লাগল। ভিক্ষার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার তার মনে রঙীন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময় আদারিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিন নয়, তার ঘরে চোদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু কিছু দেখে শুনে একটু একটু করে জানতে পারলুম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায় কাজকর্ম করে, অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাইরের সংসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানসজীবন, সেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোন সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরুচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি ক'রে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তবজীবনে সে রাস্তার মুটে, মানসজীবনে সে বিশ্বের রাজা। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানসজীবনের যে যত বেশি আপোষ করাত পারে, সেই তত বেশি কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না, তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তবজীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী হ'লেও আমি দেখতে পেতুম মানসজীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী সে সেখানে স্বামী, পুত্র, পরিজন ও আশ্রিতজনে ভরা তার গৃহ। বাস্তবজীবনে সে নিঃস্ব, কিন্তু মানসজীবনে তার দানধ্যানের অন্ত নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরমকারুনিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি দেহ বিক্রয় করা তার উপজীবিকা, কিন্তু মনে সে সাবিত্রীসমা। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বললে,—বাবা, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বরণ করেছিলুম, সে তো বদমায়েস হ'য়ে গেল। আর কেন! তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার বাড়ীতে।

বললুম—আমার বাড়ীতে গিয়ে কি করবে?

সে বললে—তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমায় মাইনে দিতে হবে না—দু'বেলা দুটি খেতে দেবে।

সমানবয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়াতে উপস্থিত হ'লে আমার পিতৃত্বে যে কেউ বিশ্বাস করবে না, সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সঙ্কোচ হ'লো। বললুম—আচ্ছা বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠোনে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে, আর সে তার ঘরের দরজায় একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলুম, আদরিণীর ডান দিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারদিকে অনেকখানি জায়গা কালশিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম,—কি হয়েছে, কি ক'রে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বললে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা ক'রে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিনদশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকায় দুপুরবেলা ভিক্ষায় বেরুতে পারেনি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রেগে গিয়ে সে তাকে মেরে অজ্ঞান ক'রে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলব না তো আর কি বলব।

সেদিন সে আশ্চর্য রকমের গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হ'লো, একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশঙ্কা করছিলুম এবার বোধ হয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বললে—বাবা, তোমাকে একটা

কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

—খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে ক'রে চলে যাব এখান থেকে।

—সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে।

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বললুম—সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ঐ যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

—ও কাদের ছেলে?

—হাড়ীদের!!!

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়ে ছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকঘর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চেটাই পেতে টিকে দিত, এইজন্য এই মাঠকে ও-অঞ্চলের লোকেরা, 'টিকেপাড়া'র মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক জায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শুয়োর পুষত আর সেই শুয়োরের দল মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চেটাইয়ের আধশুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তো।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজোলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরানীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়ের বদলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজোপার্বণে লোকের বাড়ীতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চ্যাঁচারি দিয়ে ঝুড়ি, চেটাই, দর্মা ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরি করত। মেজোলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ী মেথরানীর কাজ করত আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ীর কেউ মেথর মেথরানীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাস করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হ'তো। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার-মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলুম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়ীতে কতকগুলো খালি ঘর ছিল। সেগুলোকে সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে বলা হ'তো খোঞে। আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন মিলনকুঞ্জ। বাইরের যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টায় দু'আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোঞের কথা তখনকার দিনে গুণীলোক

মাত্রেরই জানা ছিল।

হাড়ীপাড়ার মেয়েদের দেহসৌষ্ঠবের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দু-পাট্টির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে দেখা যেত। মাঝেমাঝে সেখানে শাশুড়ী-বৌয়ে, মায়ে-ঝিয়ে ঠোকাঠুকি হ'য়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হ'তো। এইখানকারই এক বয়স্থা হাড়ীগিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে আসত মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোকটি খোঞ্চেতে আসত, তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে ঘোঁট বাধিয়ে তুললে। এই ঘোঁট যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলুম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগল না। বিয়েতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগল।

আদরিণী আমায় বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা, তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভাল থাকবে?

আদরিণী বললে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলুম, নইলে লোকের বাড়ী গতর খেটে আমার ভাতকাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুল সে হ'লো একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত ক'রে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোন একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করবে—না হয় এমনিই ভদ্রভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে—

আমার কথা শুনে আদরিনীর মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। সে বললে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হয়ে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়েসেই লেখাপড়া শেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতেন। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু

ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বী ছিলেন। আশ্রমে অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে কয়েকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হ'তো। আমি সাহস ক'রে একদিন আশ্রমের কর্ত্রী ঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বললুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চেপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্যমিথ্যায় মিলিয়ে বেশ একটি করুণ কাহিনী রচনা ক'রে তাঁকে শোনালুম।

সব শুনে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? কোথায় আলাপ হ'লো?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হ'য়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক জেরা ক'রে তিনি আমায় বললেন—আপাততঃ তাঁদের ফণ্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ধারকামী যুবতী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী—এই শুভ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়ীতে জানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সঙ্গে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন, বাবাও মাঝেমাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ বালক-বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি ক'রে একটা আশ্রম খোলা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হ'তো। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ীর কাছেই সস্তায় একখানা ভাঙা বাড়ী ভাড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি মুষ্টি ভিক্ষায় বেরুতেন। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আধমনটাক চাল ও কিছু তরকারি নিয়ে বাড়ী ফিরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'লো। সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'লো—দেশজোড়া তার নামডাক হ'লো, তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লো। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃদ্ধবয়সে বদনামের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হ'লো।

সে কথা যাক্, আমি একদিন সন্ধ্যের সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে যে দুঃখের কাহিনী আমি তৈরি করেছিলুম, তা শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল। কি ক'রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'লো, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ

চিন্তা ক'রে বলেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ (তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স), এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বললেন—তাইত হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বললে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তা হ'লে বিপথগামিনী হ'তে পারে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হ'তে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বলব। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বললেন—এক কাজ করা যাক্। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বোনের বাড়ীতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ভগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বললুম—তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়ীতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—খুব ভাল লোক তারা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি আমার সত্যিকার বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম ফাদায় নিস্তার এ কয়দিন উঠতে-বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাকে সে বাড়ীতে ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বললে—আহা! আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড্ড ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড় গড় ক'রে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। আমি বললুম—আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

আদরিণী বললে—এখানকার কোনো জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়! এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন এক্ষুণি জন্মিয়েছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বললুম—তবুও একটা শাড়ী-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে

তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হ'য়ে আদারিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে সে বললে—এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে কিন্তু—

বললুম—বেশ।

আদারিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

- কারা?

—যেখানে যাচ্ছি।

—তারা ক্রীশ্চান, জাতটাত মানে না।

—এ্যাঁ! ক্রীশ্চান! গরু খায়?

আদারিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পোঁটলাটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বললুম—ক্রীশ্চান হ'লেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছমাংসও খায় না।

আদারিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন স্বরে বললে—না বাবা, জীবনভোর অনেক পাপ করেছি, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরাতে যা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে।

কথাগুলো শুনে আমার রাগ হ'লো। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী ক'রে যে হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দুত্ব যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজী হ'লো না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এরি মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হ'লো? দিনরাত অমন ক'রে মরছ কেন?

আদারিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ গা, ভালমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ-সব কি বুদ্ধি দিচ্ছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচানাচি শুরু করেছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুনি?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—লেখাপড়া শিখব। যা দিকিনু তুই—

আদারিণী এবার গর্জে উঠল—আলবাৎ যাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিক্রমে আদারিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে আরম্ভ করল। আদারিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল- মার, মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে বুঝব।

ফাদার নিস্তারের চিৎকারে বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটা ঘটি টেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ থেঁতলাতে আরম্ভ ক'রে দিল।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেললুম। বাড়ীর মধ্যে বাইরেরও অনেক স্ত্রীপুরুষ এসে জমা হয়েছিল, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আৎরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত্র নিস্তারিণী গর্জে উঠল—ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়ীউলি—আমায় চেনো না ?

আমার মাথায় তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলুম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বললুম—আমি একে পুলিশে দোব—তোমরা সবাই দেখছ, এ আৎরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দর্শকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদের পাড়ার এক পাল স্ত্রীপুরুষ দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কে কাকে মেলে! আৎরী—আৎরী কোথায় ?

একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক ক'রে দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আদরিণীকে দেখে বললে—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেলে? বল কে মেলে ?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বললে—চ আৎরী আমাদের ঘরকে চ—কাল নগনসা আছে।

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বললে চ!

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপরের মতন ভোঁস্ ভোঁস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম ক'রে কিছু ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হ'তে দেখে সে গর্জে উঠে বললে—খবর্দার আৎরী, বাড়ীর বাইরে পা বাড়িয়েছ কি খুন করে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া টপকে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাঁদি নৎ। দুই কানের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি করে মাকড়ী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নৎ ও কানের দুতিনটে মাকড়ী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তধারা ছুটতে লাগল।

—ওরে বাবা, এত রক্ত—বলে নিস্তারিণী তো ঘুরে মাটিতে পড়ল ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদরিণীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমাদম লাথি মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বাড়ীর অন্য মেয়েরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগল! আদারিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়া তাকে ধরে ফেললে।

আদারিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে - চ হেমা!

আমি গুটিগুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলুম। আদারিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বললে—বাবা বুঝি মেয়ের কীর্তি দেখে সরে পড়ছিলে?

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মাঠের কাছে পেঁছে আমি বললুম—আচ্ছা এবার আমি চললুম।

আদারিণী বললে—চললে বাবা! আচ্ছা তাহ'লে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বললুম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু'এক দিনের মধ্যে আসব।

—না না, কাল আসতেই হবে।

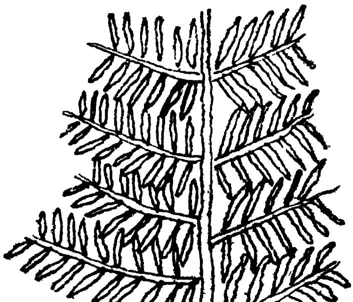
তারপর একটু হেসে বললে—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভরদ্বাজের দিব্যি রাখতে পারি নি। বোধ হয় সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আদারিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম তার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ী পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে ক'রে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হ'তে লাগল।

কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ডগমগ হ'য়ে আদারিণী বললে—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমাদের দু-জনেরই রেলে চাকরি হয়েছে—মেথর ও মেথরানীর কাজ। ও পাস আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—



সাকীর প্রথম রাত্রি

রমেশচন্দ্র সেন



অনেক দুঃখ কষ্টের পর বারিবালা রূপজীবিনীদের পাশে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। সবে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, করপোরেশনের লোকে মই লাগাইয়া উত্তরে গলির মোড়ে ও দক্ষিণে মেসবাড়ির দেওয়ালের গ্যাস জ্বালিয়া দেয়। বাদ পড়ে তাদের মাট-কোঠার সামনের আলোটা।

হরিমতী বারিবালার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, মিনসের মুখে আগুন, আমাদের আলোটা দেখতে পায় না। মারে ঝ্যাঁটা।

পাঁচি বলে, আমাদের বাতি যে খারাপ হয়ে গেছে।

হরিমতী জবাব করে, ইচ্ছে করে ওরা খারাপ করে দেয়। জানে ত যে আমরা কিছু করতে পারব না। যত সব হারামজাদার দল।

পাঁচি বলিল, অন্ধকারও মন্দ নয়। ভদ্দর নোকেরা এদিক ওদিক চেয়ে টুক করে ঢুকতে পারে।

হরিমতী বলে, সেদিন তোর ঘরে কলেজের সেই মাস্টার আসার পর থেকেই তুই আঁধারের ভূত বনে গেছিস। মর্ অন্ধকার নিয়ে।

খোয়া ও ইট তোলা গলি, উঁচুনিচু এবড়ো থেবড়ো। সংস্কারও হয় নাই বহু দিন। এক পাশে কতগুলি ঘরে টিনের সুটকেশ তৈরি হয়। আর এক ধারে মাটকোঠায় পতিতারা বাস করে। লোকে বলে সুটকেশের গলি।

কিছুদিন যাবৎ বারিদের বাড়ির সামনেটা অন্ধকার তবে দুই দিকের আলোর জন্য পথ ধরিয়া কোন রকমে চলা যায় কিন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। বারিবালার মনে হয় যেন কতগুলি ছায়া মূর্তি চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটা ফুলকি জ্বলিয়া

ওঠে, পথচারিদের মুখের বিড়ি সিগারেটের আগুন।

চলিতে চলিতে রূপজীবিনীদের দিকে চাহিয়া কেহ বলিয়া ওঠে, মেরি, জান, কেহ বা—প্রাণ তরু হয়ে গেল।

তুফানের উপর পানসির মতন কেহ কেহ মদের নেশায় টলিয়া চলে। দুইটি প্রৌঢ় কোন বিখ্যাত সিনেমা স্টারের গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল। একজন বলিল, পমেটম ত, ওর দাম ছিল দুটাকা। হাওড়ায় থাকত, ওর ঘরে কত গেছি।

তার বন্ধুটি সশ্রদ্ধভাবে বলিল, তুই মাইরি একখানা এনুসাইক্লোন।

পমেটমের পরিচিত ব্যক্তিটি হরিমতীদের সামনে আসিয়া দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া তাদের মুখের উপর তুলিয়া ধরে। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়া সবই যেন বারিবালার নাকের মধ্যে যাইয়া ঢোকে। সে পিছাইয়া পাঁচির পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

পথচারিদের উদ্দেশ্যে হরিমতী বলে, ধুত্তোর হাড় হা-ভাতের দল।

প্রৌঢ় দুইটি একসঙ্গে হাসিয়া ওঠে, সে কী হাসি—যেন করপোরেশনের দুইটা হাইড্রান্ট দিয়া কলকল করিয়া জল বাহির হয়।

বারিবালা এই সুটকেশের গলিরই মেয়ে। যেখানে মিত্র বাবুদের আস্তাবল উঠিয়াছে তার মা পরিবালা ঐখানে এক খোলার ঘরে থাকিত। তার বাবা কে বারিবালা তাহা জানে না, পরিবালাও জানিত কিনা সন্দেহ!

কৈশোরের ফুল মুকুলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবালা মেয়ের বিবাহ দেয়। পুরোহিত আসে, মন্ত্র পড়া হয়, মালা বদল হয়। কয়েকটি লোকও নিমন্ত্রণ খায়, সব চেয়ে বেশী খায়, তাদের পোষা একটা বাঁদর। একথালা চালমাখা, একছড়া কলা ও আট দশটি বিলাতী আমড়া। তার পর সোল্লাসে হাত তালি দিতে থাকে।

বিবাহের পরদিন বারিবালার স্বামী জামা-কাপড়, এই গলিতে তৈরি একটি সুটকেশ ও নগদ কয়েকটি টাকা লইয়া সেই যে বিদায় হয় তারপর আর এ পাড়ায় কেহ তাকে দেখে নাই। জামাইর ঠিকানা ও পরিচয় পরিবালা হয়ত জানিত। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলেই সে বলিত, তার ঠিকানার দরকার? এ বিয়ে ত পিত্তিরক্ষে।

পরিবালার কৈশোরেও এইরূপ পিত্তরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য বারবনিতার জীবন যাপনে তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু বারিবালা বেশ্যাবৃত্তি করিতে রাজী হইল না। পরিবালা বলিল, কি অলক্ষুনে কাণ্ড, তুই আমার নাম হাসালি।

পরিবালা মেয়েকে গালি দিত, তার খাওয়া বন্ধ করিত, মধ্যে মধ্যে তালা দিয়া তাকে ঘরে পুরিয়া রাখিত। কিন্তু বারির সুবুদ্ধির উদয় হইল না।

ক্ষুধার তাড়নায় সেই বারিবালা আসিয়া দরজায় দাঁড়ায়। আজ সকালেও সে পাঁচিকে বলিয়াছে, দুনিয়ায় পেটের জ্বালাই সব চাইতে বড়।

পাঁচি বলে, এক শ বার। এ রাস্তায় পনর আনা মেয়ে আসে পেটের জন্যে, যৈবনের তাড়ায় আর কটা?

হরিমতী গামছা পরিয়া কলতলায় স্নান করিতেছিল। সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,

আমি কিন্তু পেটের জন্য আসি নি। এসেছি যৌবন লুঠতে। নইলে মা মাসী ঘুঁটে দিয়ে আমায় সুখেই রেখেছিল, সকালে মুড়ি বেগুনি খেতুম আর চা। বিকেলে চায়ের সঙ্গে কোনদিন পাঁপর, কোনদিন পকৌড়ি।

মাতার মৃত্যুর পর অন্নের জন্য বারিবালা গলির দক্ষিণ প্রান্তে বড় রাস্তার মোড়ে পানের দোকান করে। তার খরিদ্দার জোটে অনেক, নানা বয়সের, নানা জাতির। লুঙ্গি পরিহিত কেহ উর্দু মিশ্রিত বাংলায় পান ও পানওয়ালীর সুখ্যাতি করে, যজন যাজন করিয়া টিকিতে ফুল বাঁধিয়া পুরোহিত বারিবালার পানের মিঠা খিলি খাইয়া যায়।

বই বগলে কলেজের একটি ছেলে তার দোকানের সামনে আসিয়া গান ধরে, ভাটিয়ালি সুরে তার প্রাণ ও বারিবালার পানের অনন্ত মিলনের গাথা।

বারিবালা সব উপদ্রবই নীরবে সহ্য করে। একদল ভাবে মেয়েটি বোকা। কেহ কেহ বা মনে করে গভীর জলের মাছ।

শেষের দিকে জুটিল এক প্রৌঢ়। আপিস ফেরার পথে ভুঁড়িওয়ালা এই ব্যক্তিটি রোজ দু পয়সার পান কেনে, চুন নিবার অছিলায় বারিবালার হাতে একবার করিয়া হাত ঠেকায়। একখানা আনি দিয়া বাকি দু পয়সা ফেরত নেয় না। খানিকটা আগাইয়া গিয়া একবার ফিরিয়া তাকায়।

শুনিয়া হরিমতী বলে, ঐ দুটো পয়সা হ'ল তোর যৌবনের পেন্নামি। যৌবন একটা দেবতা ত। দুনিয়ার সেরা দেবতা।

দোকান বন্ধ হইল কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য। ঐ রাস্তাটা ছিল হিন্দু মুসলমানের শক্তি পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র।

বারিবালা এবার গলির উত্তর প্রান্তে হিন্দু পল্লীতে দোকান করিল। নূতন এই রোয়াকের মালিক ঘোষজা মশাই বলিলেন, তুই পরীর মেয়ে, তুই দোকান করবি, সে ত সুখের কথা। তোর মাকে চিনতুম। সে মামাদের ভাড়াটে ছিল। তোর আর ভাড়া লাগবে না, তবে রোজ আমাদের ফ্যামিলির যা পান দরকার সেইটে দিস।

আগের রোয়াকের মালিক ছিল গরিব, ভদ্রলোকও নয়। কিন্তু সে কখনও ভাড়ার কথা তোলে নাই, বিনা পয়সায় একটা পান খায় নাই। ভাড়ার বিনিময়ে রসিকতাও করিত না।

বারিবালার এই নূতন দোকান বেশী দিন চলিল না। সে একদিন শুনিল, মোটা সেলামি এবং ভাড়া পাইয়া ঘোষজা রোয়াকটা আর একজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতেছেন। সে যাইয়া তাকে ধরিল, আপনি রোয়াকটা আর কাউকে দিলে আমি যে না খেয়ে মরব।

ঘোষজা কহিলেন, দূর পাগলি। তুই হলি পরির মেয়ে। তোকে কি তুলে দিতে পারি?

কৃতজ্ঞ গদগদ কণ্ঠে বারি বলে, আর জন্মে আমি আপনার মেয়ে ছিলুম।

মেয়ে নয়রে, নাতনি—বলিয়া ঘোষজা এদিক ওদিক চাহিয়া বারিবালার গালে

দুইটা টোকা দেন তারপর বলেন, বারি নামটা ভারী সুইট।

পরের দিন বারিবালা যাইয়া দেখে হিন্দু রাজমিস্ত্রীরা রোয়াকে ইটের উপর ইট গাঁথিতেছে।

রেশন কণ্ট্রোলের বাজারে দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত, অভুক্ত থাকিয়া সামান্য একখানা কাপড় জোগাড় করিতে না পারিয়া বারিবালা শেষটায় হরিমতীর উপদেশ মানিয়া লয়। হরিমতী বলে, গতরের উপর দিয়ে যৌবনের জোয়ার বয়ে যাবে আর তুই শুকিয়ে মরবি। সে কী হয়? আয় আমাদের পাশে এসে দাঁড়া।

বারিবালাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। মিনিট কুড়ির মধ্যেই বাবু জুটিয়া যায়। অলষ্টার পরিহিত একটি লোক তাদের দরজার সামনে আসিয়া ডাকে, শোন—

পাঁচি বারিবালাকে বলিয়া দিয়াছিল, তোর সাজ সজ্জে নেই কিন্তু যৌবন আছে ত। আগুনের মতন যৌবন। তুই ঘণ্টায় চার টাকা চাইবি। কয়লা, ঘুঁটে, কেরোসিন সব মাগ্‌গি। একটা উনুন ধরাতে গেলেও আট গণ্ডা পয়সার দরকার।

কিন্তু লোকটির সামনে বারিবালার সব গুলাইয়া যায়। কত চাই তোমার?— এই প্রশ্নের উত্তরে বারিবালা বলে, যা দেন।

হরিমতী আজ সকালে তার চৌকাঠে ঘোড়ার নাল লাগাইয়া দিয়াছিল। ইহা নাকি তাদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। বারিবালা সেই লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া আগন্তুককে ভিতরে লইয়া যায়।

ঘরে একটা হারিকেন জ্বলিতেছিল। তার পলিতা বাড়াইয়া বারিবালা আগন্তুকের দিকে চায়। দৃঢ় বলিষ্ঠ গড়ন, বেঁটে খাটো মানুষ, মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, তাতে পাক ধরিয়াছে। চোখ দুটি শিকারী বিড়ালের মতন।

বারিবালার ভয় করে। মানুষটিকে বলিতে ইচ্ছা করে, আপনি আমার বাপের বয়সী। আপনী এখানে কেন? যান এক্ষুনি চলে যান।

কিন্তু পেটের চিন্তা সব ছাপাইয়া ওঠে।

ছোট ঘর, পাকা মেজে তার উপর মাদুর ও বালিশ পাতা। এক প্রান্তে তোলা উনানের উপর মাটির হাঁড়ি, পাশেই কড়াইতে কি যেন ঢাকা রহিয়াছে। আর এক কোণে দুটা বালতি, একটায় জল আর একটায় পানের দোকানের সরঞ্জাম।

দেওয়াল মাটির, তার উপর বিভিন্ন আকার ও বর্ণের কতগুলি কাগজ আঁটা। তার মধ্যে থিয়েটার বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন ও চিত্র তারকাদের ছবিই বেশী।

বারিবালা মাদুরের একপাশে পান সাজিতে বসিলে লোকটি বলিল, ও কি চাঁদ, অত দূরে কেন? পান পরে হবে খন। তোমার নামটি কি বল দেখি?

বারিবালা।

না, না, তোমার নাম দিলুম সাকী। তুমি আমার মদ ঢেলে দেবে, বলিয়াই আগন্তুক অলষ্টারের পকেট হইতে দেশী মদের একটা বোতল বাহির করে, আর এক পকেট হইতে পাঁউরুটি ডিম সিদ্ধ ও পেয়াজের কুচি এবং কর্ক স্ক্রু। মানুষটা যেন

চলন্ত একটা ক্যাপ্টিন। সে বলে, দুটো সোডা আনাও, আর দুটো গেলাস দাও।

বারিবালা বলে, গেলাস ত আমার ঘরে নেই।

তার সাজা একটা পান মুখে ফেলিয়া আগন্তুক বলিল, গলিতে পানওয়ালা নেই?

হ্যাঁ, আছে।

তাকে বল সোডা ও সিগারেটের সঙ্গে যেন দুটো গেলাসও দেয়। গেলাস ভাঙলে দাম দেব খন।

একটা গেলাসেই চলবে। আমি মদ খাই না।

মদ খাও না? এ্যাঃ! একেবারে নিরামিষ্যি মেয়ে মানুষ, হাঃ হাঃ।

বারিবালা বড় রাস্তার পানওয়ালাকে সিগারেট সোডা ও গেলাস দিতে বলার জন্য বাহিরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে আগন্তুক বোতলটা মুখে লাগাইয়া ঢক ঢক করিয়া মদ গিলিতেছে। দেখিলে মনে হয় শুঁড়ওয়ালা একটা জানোয়ার।

বোতলটা নামাইয়া তালুতে জিভ ঠেকাইয়া চুম্বনের মত শব্দ করিয়া সে বলে, এত দেরি হল যে চাঁদ? এস এস, কাছে এস—বলিয়া সে বারিবালাকে কাছে টানিয়া নেয়।

মদের উগ্র গন্ধে বারিবালার দম বন্ধ হইয়া আসে, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ঘষায় মনে হয় গাল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে আগন্তুককে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেয়।

মাগনা নাকি? এর জন্য পয়া দেব না?—বলিয়া লোকটা আবার বারিবালাকে কাছে টানিয়া নেয়।

দুঃখ কষ্টের সঙ্গে বারিবালার পরিচয় যথেষ্ট, বহু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে কিন্তু জীবনের এত কদর্য রূপ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। বিরক্তিতে, ভয়ে ঘৃণায় তার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল এই সময়ে তাকে রক্ষা করিল পানওয়ালা ভালু সাহ। দরজায় ধাক্কা দিয়া সে ডাকিল, বারি দি।

আগে ডাকিত পানওয়ালী। তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিনে পানওয়ালী বারিদি বনিয়া গেল।

সোডা গেলাস সিগারেট রাখিয়া ভালু সাহ দাম চায়। আগন্তুক বলে, পরে হবে খন। তুমি জামিন রইলে দিদিমণি—বলিয়া ভালু সাহ চলিয়া যায়।

আগন্তুক এবার খাইতে আরম্ভ করে, একবার পাঁউরুটিতে কামড় দেয়, সঙ্গে খানিকটা কাটলেট মুখে পোরে আর পেঁয়াজের কুচি, কখনও আস্ত একটা সিদ্ধ ডিম। মধ্যে মধ্যে মদ দিয়া গলা ভিজায়, তাতে সোডা থাকে খুব কম। বারিবালা আলিপুর পশুশালায় সিন্ধুঘোটকের খাওয়া দেখিয়াছিল, তার মনে পড়ে সেই দৃশ্য।

খানিকটা পরে লোকটি বলিল, তুমি খাচ্ছ না যে? ডিম, কাটলেট সব ফাষ্টো কেলাস জিনিস। খাও।

হ্যাঁ খাচ্ছি—বলিয়া বারিবালা শশব্যস্তে একটা ডিম তুলিয়া লয়।

আরও খানিকটা মদ খাইয়া আগন্তুক বলে, আমায় তুমি ডাকবে রোজা বলে।

এর পরে সে অনর্গল বকিয়া যায়, সে একজন বে-পরোয়া লোক, যাকে বলে

ডোপ্টো-কেয়ার ম্যান। রোজগার করে, ফুর্তি করে, রেস খেলে। যে ঘোড়া তাকে বেশী পয়সা দেয়, নিজে সেই ঘোড়ার নাম গ্রহণ করে, পরের সপ্তাহে আবার অন্য ঘোড়ার নাম। জেতে খুব কম তাই অনেক সময় এক নামেই দীর্ঘ দিন চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে রেসও বন্ধ থাকে। গেল বছর একটানা প্রায় ছয়মাস তার নাম ছিল ব্ল্যাক ডেভিল। আজ রোজা তাকে তিন টাকায় এক শ' পঞ্চান্ন টাকা দিয়াছে। রোজা একটা মাদী ঘোড়া, ফিরোজার মেয়ে।

নিজের রোজা নামের ইতিহাস সে শেষ করিল এই বলিয়া—শেষটায় একটা মাদী ঘোড়ার নাম নিতে হ'ল এই হ'ল যা দুঃখ।

একটি ইঁদুর বালতি দুইটার মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছিল। কেহ কিছু না বলায় ক্রমে তার সাহস বাড়ে। শেষটায় মাদুরের কাছে আসিয়া পেঁয়াজের কুঁচি ও রোজার উচ্ছিষ্ট মাংসের ছিবড়া কুট কুট করিয়া খাইতে থাকে। একবার আসে আবার ছুটিয়া যায়।

রোজাবলে, ওটাকে ধরে একটু মদ খাইয়ে দেব নাকি?

তার পরই সে শুরু করে প্রেমের গল্প। ছেলেবেলা হইতে অনেককে সে ভালবাসিয়াছে। প্রথম বাসিয়াছিল তাদের গ্রামের এক নাপিতানীকে, সে রোজার চেয়ে অন্ততঃ পনর বছরের বড়। নারী জাতির প্রতি এই দুর্বলতা এখন আসিয়া এক জায়গায় ঠেকিয়াছে। রোজা বলিল, এই ভালবাসাই ফাইনেল।

সে ভালবাসে তার মনিবের স্ত্রীকে। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। তার স্বামী তাকে ডাকে সাকী বলিয়া।

তোমায় যদি আগে দেখতুম তা'হলে তোমায়ই ভালবাসতুম সারি। মেয়েলোক দেখলেই ডাকতুম সারি বলে, সাকী নয়। যাক তোমায় সেকেণ্ডো করে নিলুম। সাকীর পর সারি। কি বল ভাই?

বারিবালা বলিল, আমার নাম সারি নয়, বারি।

ভালো, বেশ তুমি আমার সেকেন্ডো সাকী—আর আমি রোজা—বলিয়া রোজা বারিবালার গায়ে ঢলিয়া পড়ে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে ঘরের আলোটা খুব তীব্র। সে বলে, আলোটা কমিয়ে দাও ত সাকী।'

বারি বলে, থাক না।'

না না, আলোতে ভালবাসা ঠিক জমে না।

বারি তবুও ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া রোজা তাকে ধমক দেয়, যাও, জলদি উঠে বাতিটা কমিয়ে দাও।

বারিবালা উঠিয়া বাতিটা কমাইয়া দিলে রোজা জিজ্ঞাসা করিল, এ রাস্তায় এসেছ কদ্দিন?

বারিবালা কোন উত্তর করে না। রোজা বলে, ভাগ্যিস বলনি, যে নতুন এসেছো। তা হ'লে রাগ করতুম।

কেন ?

সবাই বলে, আমি নতুন, আনকোরা। ও সব আমি ধরে ফেলতে পারি। পাকা জহুরী ত, ঝুটো আর আসল মাল চিনি।

বারিবালা বলে, হ্যাঁ আমি পুরোনো, খুব পুরোনো—এ রাস্তায় এসেছি অনেক দিন।

রোজা বলে, মদ আর মেয়েমানুষ পুরোনোই ভাল, হেঃ হেঃ। সে আবার বিনা সোডায় খানিকটা মদ খায়। তারপর হঠাৎ বারিবালার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলে, খাও তুমি একটুখানি খাও—তার মতামতের আর অপেক্ষা করে না। বারির মুখ জোর করিয়া খুলিয়া খানিকটা মদ ঢালিয়া দেয়।

না খাইলে রোজা হয়ত গলা টিপিয়া মারিবে। এই ভয়ে বারিবালা একটুখানি মদ গিলিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই বমি হইয়া যায়।

রোজা এরপর আর তাকে মদ খাওয়ার জন্য জিদ করে না। বলে, তুমি শুধু আমার সাকী হও। মদ ঢালো, আমি খাই। বেশী সোডা মিশিও না কিন্তু, ও হচ্ছে মেয়েদের ড্রিঙ্ক।

বারি মদ ঢালে, রোজা ঢুক ঢুক করিয়া খায় আর গল্প করে, দেশের গল্প, চাকরিরা গল্প।

আমি হচ্ছি মৈষণ্ডির দে। নাম ডাক আমাদের কত। ঠাকুরদা ডাকাত ছিল। বাবাটা গোবেচারী, পাঠশালার পণ্ডিত আর গাঁয়ের পোষ্ট মাষ্টার। লোকে বলে, ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতি হচ্ছি আমি ? পেতুম একটা ডিলারি, তা সে তেলেরই হ'ক আর চিনি কাপড়েরই হ'ক। দেশে তা'হলে কোঠা করতুম সাকী মঞ্জিল, আর সাকীর নামে দিঘি কাটাতুম।

বড় বড় মিলিটারি সার্ভিসও অনেক করেছি এখন করি সিভিল।

বারি তার মুখের দিকে চায়।

রোজা বলে, কোহিমা জান ? মণিপুর কোহিমা, যে অবধি নেতাজী এসেছিলেন ? কোহিমায় আমি মিলিটারি সাহেবের গাড়ির ক্লিনার ছিলুম। এখন করি ড্রাইভারি, বাসের ড্রাইভার। গাড়ির মালিক হচ্ছে সাকী।

রোজা গল্প বলে আর বারিবালাকে আদর করে। কখনও বলে, তোমার মাথাটা আমার ঘাড়ের উপর রাখ। কখনও তাকে কোলে বসায়।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। হঠাৎ তার শখ হয় বারিবালার গান শুনিবার। সে গান জানে না শুনিয়া নিজেই শুরু করিয়া দেয়,

এক রাজকুমারী স্বপ্নে দেখেছে সে।

কয়েক কলি গাহিয়া বলে, না সুবিধে হচ্ছে না। শোন একখানা মিলিটারি গান—

কদম কদম বাড়ায়ে যাও—
বাড়ায়ে যাও

পরক্ষণেই ধরে—

বুড়ো বয়সে নুপুর দেখি পায়

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচে, ধেই ধেই নৃত্য। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি লয়মান বোধ তার উপযোগী নাচ, সে এক মহাতাণ্ডব।

মাথায় টাক, চুলে পাক ধরিয়াছে কিন্তু লোকটা যেন উৎসাহের অবতার। নাচের পরই বারিবালাকে আদর করিতে আরম্ভ করে।

প্রথম প্রথম সিগারেটের ধোঁয়া মদের গন্ধ ও রোজার দাড়ি গোঁফের খোঁচায় বারিবালা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। সব কথা তার কানে যায় কিনা সন্দেহ। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন সে কখনও কখনও সাকীর গলা জড়াইবার ভান করে।

রোজা ভারী খুশি হয়। বলে, সাকী বরাতে ছিল তোকে পাব তাই আজ বেঁচে গেছি। সকালে যা ফাঁড়া গেছে আমার উপর দিয়ে।

নূতন এই প্রসঙ্গের অবতারণায় বারিবালা খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। জিজ্ঞাসু নেত্রে রোজার দিকে চায়।

রোজা বলে, সকাল আটটায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে বাস চালাচ্ছি। গাড়ি তীরের মতন ছুটছে। পাশেই আর একটা বাস, সেটা অনেকক্ষণ হেদোর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। পিছন থেকে আমি এসে ধরায় সেই গাড়ির ড্রাইভারও স্পিড বাড়িয়ে দিলে। চলল রেস।

হঠাৎ একটা চিৎকার—চিৎকার না যেন সমুদ্দুরে বাণ ডেকেছে। তার পরই শুনি, ধরু ধরু, মার শালাকে মার।

চেয়ে দেখি আমার সামনের চাকার তলায় একখানা কচি হাত। দিলুম পা দিয়ে এ্যাকসিলেটর চেপে, গাড়ি আরও জোরে ছুটল।

বারিবালা বলিল, আপনি গাড়ি থামালেন না?

আরে পাগলি। জানি, ছেলেটা চাকার তলায় থেৎলে পিষে যাচ্ছে! কিন্তু গাড়ি থামালে তোকে কি আজ আদর করতে পারতুম?

বারিবালা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ছেলেটা থেৎলে গেল, আর আপনি—

রোজা গর্জন করিয়া উঠিল, আপনি নয় তুমি। বলু তুমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি।

রোজা বলিল, একটু দূরে সেফ সাইডে গিয়ে গাড়ি বাঁধলুম। আর তার পরই নেমেই দে ছুট—

আর ছেলেটি?

আর ছেলেটি! তার ঘি আর রক্ত মাংসে রাস্তাটা তখন একাকার হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

রোজা আগেও কয়েকবার অট্টহাস্য করিয়াছে। প্রতিবারের হাসি আগের বারের

চেয়ে হিংস্র। কিন্তু এবারের হাঃ হাঃ'র তুলনা হয় না, ঠিক যেন ভালুকের হাসি।

রোজা বলিয়াই চলে, কম স্পিডে আমি চালাতে পারি না। আরও অনেকবার এ রকম হয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ি নি কোন দিন। আমি হচ্ছি মানুষ চাপা দেওয়ার কল।

আপনি আরও অনেক মানুষ মেরেছেন ?

আরে পাগলি। ঢাল ঢাল আর একটু মদ ঢাল। আর দুটো পান সেজে দে।

বারিবালা গেলাসে মদ ঢালে। তার হাত কাঁপে, চোখের উপর ভাসে একটি কিশোরের পিষ্ট দেহ। তার রক্ত মাংসে রাজপথ ক্লেদাক্ত হইয়া গিয়াছে।

রোজা বলিয়া উঠিল, তোর হাত কাঁপছে যে বড় ? সন্ধ্যের পর আমি ত ঐ পথ দিয়েই এলুম। একটু নজর দিতেই চোখে পড়ল ফুটপাথের নিচে একটা ঝাঁঝরির পাশে ক'টা দাঁত। ছেলেটির দাঁত, কচি কচি—

বারিবালা আর শুনিতে পারে না। তার মনে হয় লোকটা খুনী। সকালে ছেলেটিকে চাপা দিয়া সন্ধ্যায় তাকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল যাও, যাও—তুমি—আপনি যাও এখান থেকে।

রোজা বলে, মাগনা নাকি ? হাঃ হাঃ। তার মুখ দিয়া তখন গাঁজলা বাহির হইতেছে ;

বারিবালা শতরঞ্জির উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তার ডান পায়ের কাপড় হাঁটুর একটু উপরে উঠিয়াছে। পাশেই রোজার উচ্ছিষ্টের উপর মাছি ভন ভন করে।

খুব দূরে সাইরেন বাজিলে যেরূপ শব্দ হয় তার কানে আসে সেই রকম অর্ধস্পষ্ট শব্দ। রাস্তায় মানুষের কলরব। সাইরেন শুনিয়া দলে দলে মানুষ ছুটিয়া পালায়। সেও পলাইতেছিল, পিছন হইতে চুলের মুঠি ধরিয়া তার মা বলিল, পালাচ্ছিস কোথায় ? বাবু করবি না ত খাবি কি ?

বারিবালা ভয়ে ভয়ে বলে, মের না মা, মের না। আমি সব করব।

এই সময় পানওয়ালা ভালু সাহ ডাকে, বারি দিদিমণি। বারিবালা আধ ঘুমের ঘোরেই বলে, হ্যাঁ শুনব, বাবু—

ভালু সাহ বেশ একটু উঁচু গলায় বলে, ঝুটমুট কি বকছ ?

বারিবালা এবার চোখ মেলিয়া চায়।

ভালু সাহ বলে, আমার পয়সা দাও। সোডা, সিগ্রেট, গিলাচ।

বারি বলে, পয়সা কিসের ?

তার সর্বশরীরে একটা গ্লানি, গা ঘিন ঘিন করে। পর মুহূর্তেই মনে পড়ে অলষ্টার পড়া মানুষটাকে। সে চাহিয়া দেখে মেজেয় বোতল, ভাঙা গেলাস, পাশেই পেঁয়াজের কুচি ও চিংড়ির খোসা ছড়ানো।

মনে পাড় লোকটার নৃত্য, তার আদর। সে আদর করিয়া গিয়াছে কিন্তু একটা কানা কড়িও রাখিয়া যায় নাই।

হিঙের কচুরি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ির একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়িটাতে বাস করত। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করত। চুড়িওয়ালার নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসত, তখন সবাই মিলে ঘড়া কলসী টিন বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি শুরু হত জল ভর্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কাণ্ড এদের। এখান থেকে উঠে যাব শীগগির।

কিন্তু যাওয়া হত না কেন, তা আমি বলতে পারব না। এখন মনে হয় আমরা গরিব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই!

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত. গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তার ওপর একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়িতে বাঁশবাগানের ধারে ধুতরো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আসশ্যাওড়ার ডাল আর পাতা যে বয়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেন সত্যিকার বাড়ি একখানা। কালী তাই বলত। একটা

ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল। ও বলত, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এসব সম্ভব হয় নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়িতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানে তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখীর বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখী সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়িতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনে টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেছে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্ছে গরুর গাড়ি থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ির জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায় অনেক গাড়ি-ঘোড়া যায়। আমাদের গ্রামে কখনও একখানা ঘোড়ার গাড়ি দেখি নি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলি সারবন্দি খোলার বাড়ি, আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ি-ঘর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে, আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরেই যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমিও তাকে খুব ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিগ্যেস করে। তাদের বাড়ি বর্ধমান বলে কোন জায়গা আছে সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংড়ি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনও আস নি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, মুখে ময়দার

মত কি গুঁড়ো মাখত, চুল বাঁধত—কি চমৎকার মানাত ওকে! কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলত—তুমি এবার বাড়ি যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ি যাও।

আমার অভিমান হত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকব। কি করবে বাবু আমায়?

—না না, তুমি চলে যাও। তোমার এখন থাকতে নেই। এমন করে না লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ি।

আমার বড় কৌতুহল হত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ি যেতে বলে?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ঐ পাতা নেই; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বললে -এই নাও, খেতে খেতে বাড়ি যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগল। এমন কচুরি কখনও খাই নি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত সুরে বললাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার!

কুসুম বললে—হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ি যাও।

কুসুমের বাবু বললে—কে?

—কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললে—যাও খোকা, এইবার বাড়ি যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। লোকটা যেন রাগী মত, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিঙের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও।

কুসুমের বাবু বলত—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনব ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও কাল ঠিক আনব।

আমার ভয় কেটে গেল। বললাম—এনো ঠিক কাল?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বললে—আনব আনব।

কুসুম বললে—এখন বাড়ি যাও খোকা—

—আমি এখন যাব না। থাকি না কেন?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বললে, আমি তার মানে ভাল বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বললে—যাও, ওকি কথা ছেলেমানুষের সঙ্গে!

বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম—মা, তুমি হিঙের কচুরি খাও নি?

—কেন?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিঙের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না? ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিঙের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিঙের কচুরি! বাড়িতে খেতে পাও না কিছু? খবরদার, ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড়ি এর পরে দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারি নে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বললে—তুমি আস নি যে?

মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসি নি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা। তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করব, তেমন কপাল করি নি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবছি।

—মাকে বলব না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসব।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধ্যের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায়

দেখে বললে—এই যে ছোকরা। ক'দিন কেন দেখি নি? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনব গো বামুন ঠাকুর, ফলারে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনব। খেয়েছ অমৃতি?

—না।

—কাল আনব, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে ব'লো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বললে—আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ি যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও।

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বললে—কেন, ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁঝের সুরে বললে—তুমি থাম। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারব নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হল কুসুমের ওপর। কেন, আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বললে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বললাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজনের ডাঁটা কুটছে। আমায় বললে—এস খোকা।

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা! কি করলাম আমি?

—তুমি বললে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই! বস বস খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারি নে। বুঝলে? কুলের আচার করছি, খাবে? এখনও হয় নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেছি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তার পর আমি উঠে মাখনের ঘরে যাই। মাখন কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু, কত রকমের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখন বললে—এস খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বস এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখন হাসিমুখে বললে—শোনা কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবা খায়।

—শোন কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে? বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

—হি হি—শোন কথা ছেলের—কি যে বলে!—হি হি—ও কুসুমি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখনের বয়স কুসুমের চেয়ে বেশি বলে আমার মনে হত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখনকে দিদি বলে ডাকত কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারও ঘরে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেয়েদের ঘরের বাবু কখন আসত কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমায় হতাশ হতে হয়েছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বললে—অত শত কথা তোমার দরকার কি শুনি? ছেলেমানুষ, কোন ঘরে যেতে পারবে না, বস এখানে!

—আমি প্রভার কাছে যাব—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার। বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বললাম—আমি চেয়ে খাই নি। প্রভাকে জিগ্যেস কর।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

—একটিবার যাব? যাব আর আসব।

সত্যি বলছি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলে? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা! আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে? কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মত কথা কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বললে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেছে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েছে। আমি হেসে বললাম—মারবে নাকি?

—ও! পাগল ঠাকুর। তাই বল। আমি বলি কে এল দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই? কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েছে। খুব ভাল কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করব।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ে অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছে। ওখানকার কথা ছেড়ে দ্যাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বললাম—প্রভা, রাগ ক'রো না আমার ওপর।

—না না, রাগ করব কেন। দুঃখের কথা বলছি। আমিও একপুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসি নি। পনের বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘর থেকে বেরিয়েছিলে?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বস, আমার ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই?

—এস রান্নাঘরে।

প্রভার রং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকের ওপর কালো ভোমরার মত একটা জড়ুল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘরে এত জিনিসপত্তর নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া পাখীটা ছাড়া।

প্রভা রান্না করছে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাই নি, দেশ থেকে এসে পর্যন্ত নয়। সেখানে আমাদের মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বললাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা?

—বাজারে, আবার কোথায়?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বললে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগল।

আমি বললাম—তোমার বাবা মা কোথায়?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

-বাড়ি যাবে না?

—কোন্ বাড়ি?

—তোমাদের দেশের বাড়ি।

—যমের বাড়ি যাব একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়িতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ।

প্রভা এ কথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগল।

খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগল। আমায় একবার বললেও না আমি চা খাব কি না। অবিশ্যি আমি চা খাই নে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চা-এর মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগল ওদের দেশের বাড়িতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেত, ওদের বাড়ির ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সেসব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। বললে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—খাব। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বললে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেছে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেলে। বললে—ওকি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকনো হল বুঝি? এ ভাত মেখেছে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঁ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ, পাগল। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি বলে তুমি ওকে ভাত দিয়েছ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বললে—কেবল চালতে চালতে করছিল, তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত—

—না, ছিঃ! চল আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াব বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চল—হাত এঁটো নাকি? খেয়েছ বুঝি?

আমি সলজ্জ সুরে বললাম—না।

—চল হাত ধুয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বললে—আহা, মুখের ভাত কটা খেতে দিলি নি ওকে! সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চল।

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমায় হাত ধুয়ে দিতে দিতে বললে—তোমার অত খাই-খাই বাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ! ওবেলা কচুরি দেব এখন খেতে। আর কক্খনো

অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি, তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ, লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায় নি, সে এদিকেও ছিল না।

বললাম—মাকে যেন বলে দিও না!

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমার তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

—বললে মা মারবে কিন্তু।

—মার খাওয়াই ভাল তোমার। তোমার নোলা বন্ধ হয় তাহলে।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাস নি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল কুসুমেরই। সে আমাকে বললে—চল খোকা, বেড়াতে যাই। যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বললাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেছে।

—চল আমি সঙ্গে আছি ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়িতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বললে—আয় লো কুসুমি, কতকাল পরে—বাব্বা, আমাদেরও কি আয় নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বললে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটা।

—বাঃ—বস খোকা, বস।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই-খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশি।

—তাই তো, কি খেতে দিই। ঘরে কুলের আচার আছে, দেব?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই বলে উঠলাম—কুলের আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—তুমি কী না ভালবাস। খাবার জিনিস হলেই হল। না ভাই, ওর সর্দিকাসি হয়েছে। ও ওসব খাবে না। থাক।

আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুর। কখন হল আমার সর্দিকাসি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে-বাড়িতে বসবার পর আমরা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তারাও আমাকে দেখে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগল। বাড়ির তৈরি সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমার নাকি

পেটের অসুখ।

সন্ধ্যের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পার হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বললাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখব।

—সন্দে হয়েছে। তোমার মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্যি!

—আচ্ছা কুসুম, তুমি ওকথা বললে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝ। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেব? যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হল! তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জান?

—আচ্ছা কুসুম, 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে এ কথা!

—ওই যে ওরা তোমায় বলছিল?

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি। পাজি ছেলে কোথাকার!

কুসুম আমায় বাড়ির পথে এগিয়ে দেবার আগে বললে—চল, কচুরি এতক্ষণ এনেছে ও। তোমায় দিই।

—দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

—কোন্ সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পার? তোমার মাকে যদি সামনা-সামনি পাই তো জিগ্যেস করি, ছেলের অত নোলা কেন।

—নোলা আছে তো বেশ হয়েছে। কচুরি দেবে তো?

—চল।

—গজা এনেছে?

—তা আমি জানি নে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবা রে বাবাঃ!

—গজা দেবে তো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বললাম। কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম, কুসুম কচুরি খেতে দিয়েছে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বললেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে, তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর হল। চার-পাঁচ দিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানালার ধারেই আমাদের তক্তপোশ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখন। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও দুখানা বাড়ির পরে একখানা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছন ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখনকে ডেকে বললে—দিদি, এই বাড়ি—এই যে

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখন এসে জানালার ধারে দাঁড়াল।

কুসুম বললে—কি হয়েছে তোমার? যাও না কেন?

মাখন বললে—কুসুমি ভেবে মরছে। বলে, বামুন খোকার কি হল। আমি তাই বললাম, চল দেখে আসি।

বললাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বললে—তোমার মা কোথায়?

—কুসুম, তুমি চলে যাও। মা দেখতে পেলে আমায় আর তোমাদের ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাব। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। নীচু সুরে বললে—যাব?

মা ঘরে নেই। বদ্যিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েছে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস তো যেন বেড়ালে খায় না. আমি বদ্যিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি।

হাত দেখিয়ে বললাম—এস।

ও জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বলেল—কেমন আছ?

—ভাল। কাল ভাত খাব।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেব?

দাও তাড়াতাড়ি।

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাব।

—কাল ভাত খাবে?

—বাবা বলেছে কাল ভাত খাব।

—কাল আবার আসব। কেমন তো?

—এসো। আমি না বললে জানালার কাছে এসো না।

—তাই করব। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। শিস দিতে পার?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দু'দিন কুসুম ঠিক আসত বিকেলবেলা। একদিন প্রভা দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও দুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলব না। বালিসের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে দু'দিন কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তার পরেই এক ব্যাপার ঘটল। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়িতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেললে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু মারের হাত সারল না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারপ হয়ে উঠল। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগল। আমার মামার বাড়ির অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়িতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল দু'একটা পাকতে শুরু হয়েছে। মামার বাড়ির গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ি এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়িতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আপিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বললে—কাল ভাই সন্ধ্যের পর প্রেমচাঁদ বড়ালের স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে—দু'ধারে মুখে রং—হরিবল!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময় আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই, আমার। মাইরি বলছি।

—যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেব।

বছর পনের আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখনের বাড়ি যাই। কুসুম, প্রভা—কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখনই একমাত্র সে খোলার বাড়িতে ছিল তখনও।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখন এখন সেই

বাড়িতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যক্খি বুড়ির মত চেহারা। একটি দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখন বললে—এস এস! ভাল আছ?

—চিনতে পার?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারব না! আমাদের চোখের সামনে মানুষ হলে। ভাল কথা, কুসুমের খোঁজ পেইছি।

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার ষ্ট্রীটে একটা মেস-বাড়িতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ হাতে। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতালা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীল পুজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ি খুঁজে বার করলাম। সন্ধ্যে তখনও হয় নি, নীচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বললাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি-শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজছেন।

আমি ঝিএর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখনের মত অত বুড়ি না হলেও কুসুমও বুড়ি। বুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—আমায় খুঁজছেন আপনারা? কোত্থেকে আসছেন?

—মাখনের কাছ থেকে।

—কোন মাখন?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখন বাড়িউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন?

—চল ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে।

খাবার ঘরে গিয়ে বললাম—কুসুম, আমায় চিনতে পার?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা-মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ির ভাড়াটে। মনে হয়?

কুসুম হেসে বললে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর? কত বড় হয়ে গিয়েছ! বাবা মা আছেন?

—কেউ নেই।

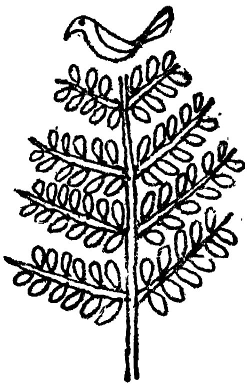
—ছেলেপুলে কটি?

—চার পাঁচটি।

—বস বস, বাবা।

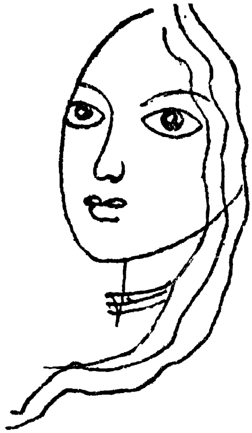
আরও অনেক কথাবার্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল-না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানি নে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যেবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।



মেলা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব উপলক্ষে নয়, কোন্ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহা-প্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাকের পয়সাও না।

সিউড়ীর ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারশো টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার দুশো টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে! প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-র দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি; রঙীন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেতপাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে

পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়িমুড়কী চূড়ো দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিকে যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জমজমাট দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশো চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভাল হে। চটক আছে।

সিং ও সায় দিল—হ্যাঁ, গোটা বিশ পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খপসুরৎ।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কমলি আর পটলি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ! ফেশান কি তাদের। টেরীবাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে।···কি চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে শুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস কত টাকায় ডাক হল জানো?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এ্যাঁ? ডাইস? দেড় হাজার।

—কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগার বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুট-ফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বনবন শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এসো খুকী, এসো। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর্-ফর্ শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কত দাম?

—কিসের ? পুতুল না এরোপ্লেনের ?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোন্‌টা নেবেন বলুন ?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিয়া লইল। পর মুহূর্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব্‌, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হল না।'

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দু পাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসার লোভে সংকীর্তনের পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী!

সংকীর্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল—না বাপু আমাদের কাছে দুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন ?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল - এস ভাই দাদা চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চেখে দেখুন আগে, ভাল না হয় দাম দেবেন না আপনি!

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা ?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন ? বাসি ? ফল কি কখনও বাসি হয় আজ্ঞে ?

ছোকরাটা কহিল—চাখ্‌না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বললেই খারাপ হবে নাকি ?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকাবাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বললেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ি বলতে যেও না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে তো। খবরদার !

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে···লাগিয়ে দিই।

জুতার পটির পথের দুপাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটির অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোড়ালী-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর দল কিন্তু নাছোড়বান্দা। অমর যত আগাইয়া চলে দুপাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু ! দিন না বাবু ! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ি থেকে—

অর্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু ছুঁয়ো না তুমি অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্যাদা ক্ষুন্ন করিল না। বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই ? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে বলে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ি যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি ?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয় বাজী দেখি গে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখ্‌মলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভাল চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে তো তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে,

নয় দাদা ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল—

—শাঁক আলু, পালং শীষ!

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত করে ভাই ?

—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাবলা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছোট একটি কাঁচের কেসে কেমিকেলের গয়না লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্ন শ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—তিন পাথরের আংটি একটি করে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা! বেশী নয় চার পয়সা করে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটি দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল—বসো দাদা, বসো।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিতেছিল—চার হাত কার দু'পয়সা, বড় বড় কার দু'পয়সা, রকম রকম দু'পয়সা—জামাই-বাঁধা কার দু'পয়সা। টানলে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না……দু-দু পয়সা, দু-দু পয়সা।

পটিটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলরোল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিরোধ দুইদিকে চলিয়াছিল। একদিকে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজীর ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা ?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া বড় চারিটি ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড়ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালী, খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গেছে।

একটাই আনন্দ বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্ততঃ পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতার মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইখানে তারপর ওই দরজায়. আবার আর একটা দরজায়···মোট কথা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডায় উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়াখেলা চলিতেছে। কোন্ ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরের জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহুর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায় শব্দ হইল—ওয়াক—ওয়াক।

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাসা নারীর দেহ।

বমির উপর বসিয়াই গান ধরিয়া দিল—

'মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব!'

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো।

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনমোহিনী খিলি বাবু, মনমোহিনী খিলি। যে যে-বয়সে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—'পান খেয়ে যাও হে বঁধু—'

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল—দেখেছিস?

অপরজন কহিল—এর চেয়ে ভাল আছে। তার নাম কমলি। ফড়িং বললে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম তোমার?

মেয়েটি বলিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী। বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পরা হয় না নাগর। গোটা গোটা।

একজন কহিল—মদ খাবে তো!

—খাওয়ায় কে? বলি বকে বকে মুখ তেত হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর!—

একটি ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কমলি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালবাসবি না তুই। তোর নামে আমি নালিশ করব। ডিফামেশন সুট!

মেয়েটি কহিল—যা যা যা; আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্নেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিষ্টার আনব আমি। কই যা দেখি সন্নেসী হয়ে।

বাজীর ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজী-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোস পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোষাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত দাদা ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটার কতকগুলো বড় বড় চামচিকার মত ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজী।"

অমর চুপি চুপি কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সব চেয়ে ভাল বাজীটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রং-এর তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই।

কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এসো ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান... ।' তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—কি, কি, ইউ ডাব্‌ল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

—ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মত দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোকলা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটা মুণ্ডু অফ বোম্বাই।' এক পাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অব বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরাজী বাজনা বাজছে। আয়, আয়! ওদিকে বড় বড় বাজী আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্ধমগ্ন কুটার মত। বাজীর তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিং-এর খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল —চলো, চলো, দো-দো পয়সা! দো-দো পয়সা!

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক।

—হাঁ—হাঁ। ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচেন কি?

—কি ভাবছেন মশা? ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে!

তাঁবুর সম্মুখের পর্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রং-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড়

উ'চু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম, রকম রকম দেখবেন। ভিতর যান ভিতর যান।

ক'জন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, হাতী—হাতী!

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্ট দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোকরা!

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারি পাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁস হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারি পাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝক্‌মক্‌ করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল মণি! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় যে আসিয়া পড়িল কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃংখল আবর্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃংখল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে দু'টাকা, দু'টাকায় চার টাকা!

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ? অমর দেখিল আঠারো-উনিশ বছরের একটি খদ্দর পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপী।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুনে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু'ঘুঁটিতে চার গুণ, তিনঘুঁটিতে ছ'গুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এসো আমার সঙ্গে এসো। কি, হয়েছে তোমার? পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীবকে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই ধর।

ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ' বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না-টয়না আছে না কি?

—হাতে দুগাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনি বাঁধা আছে!

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্তা দুই-চারিটা শুধু স্পষ্ট ভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায় সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজীকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই! থাক সে বাহিরে দাঁড়াইয়া! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দুপায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কুকুরে ডিগবাজী খায়, বাঁদরে ঘোড়া চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোড়ে! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা তো নাই! কয়েক মুহূর্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি দুষ্টু তাহার দাদাটা!

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে!

পথে একটা দোকানে দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এসো ভাই, চলে এসো। কাবাব রুটি। গোস্ পরেটা! চিংড়ী-কাঁকড়া—এই এই, ভিড় ছাড়ো. ভিড় ছাড়ো!

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল, এই বড়ো বাঘ!

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল - এই সরো'ই বটে রে বাবা—গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দেকানের পর্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্ গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াসার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে। মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক' ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকার পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ওপাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে সে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশালাই জ্বালিয়া সে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল, মণির ফুট্ফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া

আসিল। মণিরও ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী ?

তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি ? তুমি কেঁদ না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে !

—হোক্ না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো !

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—বসো তো মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

কে একজন কহিল—পুজো করব বলে।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ! মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ। কমল !

কমল কহিল—অনেক নরকের দোর তো খোলা রয়েছে, যাও না। আমি পারব না।

—একবার শোনই না !

কম্লি কহিল—বেশী উপদ্রব করলে পুলিশ ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কম্লি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদ না খুকী, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম তো খুকী নয়, আমার নাম মণি—

—মণি। তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার খিদে পেয়েছে ?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি বলে ডাকব ?

কম্লি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন ?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল ! বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানীটার কথা পর্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগর-দোলা, পুতুল দুটি কত ভাল তাহাও সে বলিল। মখমলের চটিও কেমন তাও অপ্রকাশ রহিল না।

কমলি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকত মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ডরূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কমলি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি।

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উঁ।

কমলি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলো কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই। নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভাল। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল! কমল সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কমলি কহিল—তোমার মা ভাল, না আমি ভাল!

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভাল, তুমিও ভাল।

কমলি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী! মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল তুমি শোও।

হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কমলি।

কমলি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কম্‌লি কহিল—মাসী!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস যে? কি হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুনতে হবে।

কম্‌লি কোন উত্তর দিবার পূর্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো? কার মেয়ে?

কম্‌লির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে?

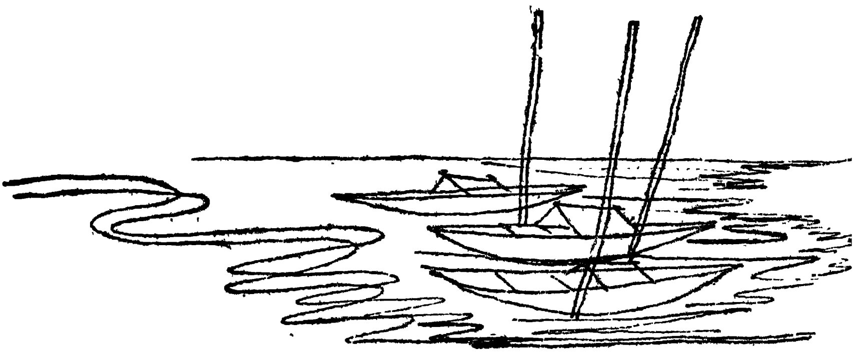
বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কম্‌লি জবাব দিল—না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভাল করে আগড়টা সরিয়ে দে!

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কম্‌লি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল· ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই একটা উচ্চ, জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজী, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গিয়াছে।

কম্‌লি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম্‌ থম্‌ করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কম্‌লি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর এক মুহূর্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।



মন্দ লোক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, ডাক্তার নীতিবাগীশ বৃদ্ধ ও স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য এ কাহিনী লিখিত হয় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পাতা উল্টাইয়া যাইবেন। কারণ, অযথা রিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কুড়ি বৎসর আগে আমার বয়স কুড়ি বৎসর ছিল। হিসাবে বর্ত্তমান বয়সের যে অঙ্কটা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ছ্যাবলামির পক্ষে অনুকূল নয়। সিদ্ধার্থ এ বয়সে পেঁছিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন; নেপোলিয়ান এ বয়সে অর্দ্ধেক য়ুরোপের অধীশ্বর আলেকজাণ্ডার এতদূর অগ্রসর হইতেই পারেন নাই, তৎপূর্ব্বেই পৃথিবী জয় শেষ করিয়া ফোৎ হইয়াছেন। সুতরাং যাহা বলিতেছি, তাহা কালসুলভ চপলতা নয়। কেহ দন্ত বাহির করিয়া হাসিবেন না।

কুড়ি বৎসর বয়সেই আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিতে পসার জমাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণ হয়তো রাগ করিতেছেন কিন্তু আমি জানি ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবান—পসার এবং পত্নী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত; পৌরুষ বা বিদ্যার বলে তাহাদের সংগ্রহ করা যায় না। যদি যাইত, পি, সি ও বি, সি, রায় আদ্যাপি অনূঢ় কেন?

আরম্ভে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নাম করিয়া গল্পটাকে শোধন করিয়া লইলাম, সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়াছে। অতএব শুরু করিতে পারি।

ছোট একটি শহরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখনও বিবাহ করি নাই; ছোট একটি বাসায় একাকী থাকিতাম, স্বপাক আহার করিতাম, এবং 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্ব ফলত সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতাম। সকাল

বিকাল আমার ছোট ঘরটি নানা জাতীয় রোগীতে ভরিয়া যাইত ; অধিকাংশই গরিব রোগের লক্ষণ বলিয়া অল্প মূল্যে ঔষধ কিনিয়া লইয়া যাইত। কদাচিৎ দুই একটি সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ি হইতে ডাক পাইতাম। মোটের উপর ভালভাবেই চলিতেছিল ; টাকা যত না হউক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

একদিন সকালবেলা রোগীর ভিড় হাল্কা হইয়া গেলে লক্ষ্য করিলাম, ঘরের কোণে একটি স্ত্রীলোক একখানা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ঘর যখন একেবারে খালি হইয়া গেল. তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জোড়হাতে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল।

সপ্রশ্ন চক্ষে তাহার পানে চাহিলাম। অধিকাংশ রোগীই আমার পরিচিত, কিন্তু ইহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। বয়স বোধ করি বছর চল্লিশ, থলথলে মোটা গড়ন ; মুখের বর্ণ এককালে ফরসা ছিল, এখন মেছেতা পড়িয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। চিবুকের উপর অস্পষ্ট উলিকর দাগ, একটা কানের গহনা পরিবার ছিদ্র ছিঁড়িয়া দুই ফাঁক হইয়া আছে। চোখে অসহায় উৎকণ্ঠার চাপা ব্যগ্র দৃষ্টি।

ও দৃষ্টি আমি চিনি। ঘরে যখন তিল তিল করিয়া প্রিয়জনের মৃত্যু হইতেছে অথচ হাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবারও পয়সা নাই, তখন মানুষের চোখে ওই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে।

জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি হয়েছে ?'

স্ত্রীলোকটি পাতিহাঁসের মত ভাঙা গলায় বলিল, 'বাবু, আমি মন্দ লোক।' তাহার দুই চোখে বিনীত দীনতা প্রকাশ পাইল।

একটু অবাক হইয়া গেলাম। নিজের সম্বন্ধে এতটা স্পষ্টবাদিতা তো সচরাচর দেখা যায় না। সত্যকাম ও জবালার কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারি নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আমার চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া হেঁটমুখে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের যে পরিচয় দিল, তাহাতে সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেও বুঝিতে বাকি রহিল না। জবালাই বটে।

সঙ্কোচ ও সংস্কার কাটাইয়া উঠা সহজ কথা নয়, এ জাতীয় রোগিণী আমার নাতিদীর্ঘ ডাক্তার-জীবনে এই প্রথম। তবু আমি ডাক্তার, নিজের দায়িত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে ডাক্তারের চলে না। গলার স্বর ঈষৎ কড়া হইয়া গেলেও শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি চাও ?'

স্ত্রীলোকটি তখন উৎসাহ পাইয়া ভাঙা গলায় একগঙ্গা বলিয়া গেল। উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতার আতিশয্যে অনেক আবোল-তাবোল বকিল। তাহার কথার নির্য্যাস এই—

পাপ-ব্যবসায়ের একমাত্র মুনফা একটি কন্যা লইয়া সে যৌবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টাকাকড়ি কিন্তু রাখিতে পারে নাই, দুই-চারিখানা গহনা যাহা ছিল তাহারই সাহায্যে কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু মা-মঙ্গলচণ্ডী তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। কন্যাটির বয়ঃক্রম এখন ত্রয়োদশ বৎসর ; গত এক বৎসর ধরিয়া সে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছে। শহরের

সকল ডাক্তারই একে একে চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির গহনা সব ফুরাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারেরাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আমি ভরসা।

বিবৃতির শেষে স্ত্রীলোকটি ব্যাকুলভাবে বলিল, 'বাবু, আমার আর কিছু নেই। নিজে খেতে পাই না, সে যাক—কিন্তু রোগা মেয়েটাকে খেতে দিতে পারি না। আমরা মন্দ লোক, কেউ আমাদের পানে মুখ তুলে চায় না। আপনি দয়া করুন, ভগবান আপনার ভাল করবেন।' বলিয়া অসহায় ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ভগবানের ভাল করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যদিও আমার খুব উচ্চ ধারণা নাই. তবু কেন জানি না, এই ঘৃণিতা নারীটার প্রতি দয়া হইল। বিশেষত যে রোগীকে শহর-সুদ্ধ ডাক্তার জবাব দিয়াছে, তাহাকে যদি বাঁচাইয়া তুলিতে পারি—

নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার প্রলোভন ছোট বড় অনেক নৈতিক ও লৌকিক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। আমি বিনা পারিশ্রমিকে মেয়েটার চিকিৎসা করিতে সম্মত হইলাম। এমন কি, গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।

কুৎসিত পল্লীর কুৎসিততম প্রান্তে একটা খোলার ঘর। দৈন্য যে চরম সীমায় পেঁাছিয়াছে, তাহা একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। কতকগুলা ছেঁড়া কাঁথা ও চটের মধ্যে মেয়েটা পড়িয়া আছে; কাঠির মত সরু হাত পা, গলাটি নখে ছিঁড়িয়া আনা যায়, গায়ের চামড়া কুঁচকাইয়া চামচিকার মত হইয়া গিয়াছে—চর্ম্মবৃত কঙ্কাল বলিলেই হয়। যথার্থ বয়স জানা না থাকিলে নয়-দশ বছরের মেয়ে বলিয়া মনে ভ্রম হইত।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কঠিন রোগ—ম্যারাসমাস, তাহার উপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। যেরূপ অবস্থায় পেঁাছিয়াছে, তাহাতে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আমার মুখে চোখে বোধ হয় মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, মেয়েটা রোগ-বিষাক্ত অচঞ্চল সর্পচক্ষু মেলিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ও পথ্যের জন্য একটা টাকা স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইতে লাগিল, টাকা ও পরিশ্রম দুই-ই জলে পড়িল।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি রোজ আসে। কখনও ঔষধ, কখনও নির্গুণ বড়ি দিই; মাঝে মাঝে দুই-একটা টাকাও দিতে হয়। স্ত্রীলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দীনভাবে গ্রহণ করে; ভাল করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারে না, ভাঙা গদগদ স্বরে বলে, 'বাবা, ভগবান আপনাকে রাজা করুন!'

এক মাস যখন মেয়েটা টিকিয়া গেল, তখন আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'বলতে সাহস করি না বাবা, কিন্তু আর একবার যদি পায়ের ধুলো দেন। আজ মঙ্গলবার, খুঁড়ব না, কিন্তু আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে। ঋতুরাণী আমার বাঁচবে।'

দেখিয়া আসিয়া আমিও বুঝিলাম, ঋতু বাঁচিবে! একটা মানুষকে—যতই ঘৃণ্য

হউক—যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল।

* * *

মাস ছয় সাত পরে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছি, ঘাটের উপর একটি মেয়ে হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মুখখানিও মন্দ নয়—সদ্য স্নান করিয়া ভিজা চুলে আমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিনিতে পারিলাম না। সে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লজ্জিত চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি ঋতু।'

নিজের কৃতিত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ চোখের উপর দেখিয়া প্রচুর আনন্দ হইবার কথা, কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার গৃহস্থকন্যার মত সলজ্জ কোমল মূর্ত্তিটি চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, তাহাকে না বাঁচাইলেই বোধ হয় ভাল হইত।

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত কিন্তু আর একটু আছে। সেটুকু বলিতেই হইবে, সংকোচ করিলে চলিবে না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ঋতুর মা অনেক দিন পরে আমার কাছে আসিল। মনটা খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর সে যে প্রস্তাব করিল তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহাদেরও নাকি নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধিবিধান আছে, ঘটা করিয়া, কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। ঋতুর শুভ বলিদান কার্য্যটা আমার মত সৎ পাত্রের দ্বারাই ঋতুর মাতা সম্পন্ন করাইতে চায়।

অজস্র গালাগালি দিয়া অকৃতজ্ঞ পতিতা স্ত্রীলোকটাকে তাড়াইয়া দিলাম। সে ভীত নির্ব্বোধের মত মুখ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল আমার অসংযত উষ্মার কারণটাই যেন বুঝিতে পারিল না।

তারপর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে আমার বয়স এখন চল্লিশ। সেদিনের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, ঋতুর মাতা 'মন্দ লোক' ছিল বটে কিন্তু বোধ হয় অকৃতজ্ঞ ছিল না। আদর্শের মাপকাঠি সকলের সমান নয়; বৈষ্ণবের কাছে যাহা মহাপাপ শাক্তের কাছে তাহা পুণ্য। মানুষের অন্তরগহনে যাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার তিনি হয়তো বুঝিয়াছিলেন ঋতুর মাতা আমাকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিতে আসে নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিল—তাহার দীন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিণীর মত আমার পদপ্রান্তে রাখিয়াছিল।

দন্ত কৌমুদী

বনফুল



যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরাণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ আমি ডাক্তার, রোগিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মার্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকসন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছর খানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি

মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায় ?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি ?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তারপর বলিল, কলকাতাই চলে যাই তাহলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলিনি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল!

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটাতে ?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

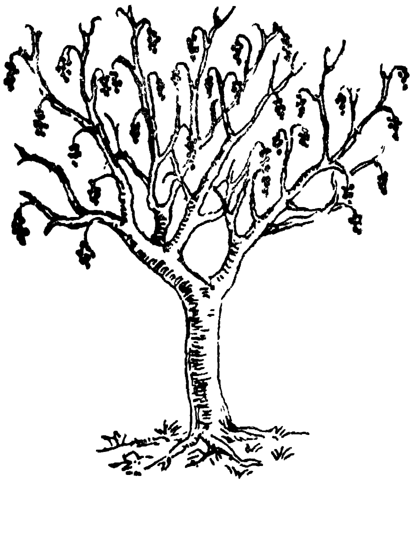
শ্রীচরণেষু,

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার

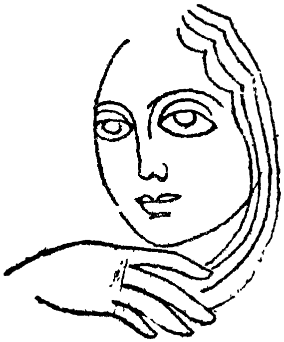
টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোন পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

সেবিকা
চাহনি



গোষ্পদ

যুবনাশ্ব



রবিবারের অলস দুপুর। চারিদিক নির্জীব, ক্লান্ত। গাছের ডালে কাকটা অনেকক্ষণ পর-পর অবসন্ন ভাবে মাঝে-মাঝে ডাকছে।

চারিদিকের এই শ্রান্ত-শান্তির মধ্যে আলস্য নেই, ওই ভিখিরির দলের। দল বেঁধে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, তারা দোরে দোরে ঘুরছে ' রবিবারেই তাদের যা কিছু রোজগার। দলের প্রায় সবাই মেয়ে।

আর ক্লান্তি ছিলনা তার, যে ওই ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ধ্বংসপথের যাত্রীদের মাথার ওপরে আগুন ঢালছিল। খাঁ-খাঁ রোদে পথঘাট তেতে উঠেছে, হাওয়ায় গা ঝলসে যাচ্ছে—মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড়!

কিন্তু ভিখিরির আবার রোদ-বিষ্টি! পেট চালাতে হবে তা?

সম্প্রতি রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা হচ্ছে পটলডাঙার দল। দলের মধ্যে সব গোনা-গুনতি? বাইরের কেউ যে ফাঁকি দিয়ে এসে দলে ঢুকে তাদের সাথে রোজগার ক'রে যাবে, তার যো'টি নেই। মোড়ল খেঁদি-পিসীর এমনি কড়া নজর! এইতো সেদিন হাটখোলার কুসুম এসে ভিড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হ'ল! খেঁদি তো বেটিকে খুন করতে বাকি রেখেছিল।

দলের সবাই তাকে ভয় করতও যেমনি, নামও তেমনি আশে পাশের পাঁচখানা পাড়ার সব দলই জানত।

এ-হেন ডাক-সাইটে খেঁদির দল চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে। সামনেই একটা বড় বাড়ি দেখে সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। কাচ্চা-বাচ্চা কতকগুলো চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছিল, চ্যাঁ-ভ্যা ক'রে কাৎরে উঠল। বড়দের মধ্যে এই সূত্রে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা অর্থাৎ ভিক্ষে পাওয়াটা তখনো বাকি,

তাই লড়াই বেশি দূর গড়াল না।

—হরেঃ কেস্টো,—দুটি ভিক্ষে পাই বাবা।

—এই-য়ো—ঠারু যাও, উধারু—মৎ আও—মাৎ আও—

দারওয়ানজীয় হুমকীতে আর কেউ বেশি দূর না এগিয়ে ওইখানেই থেমে গেল। তারপর আঁচল, কোঁচড়, থলে, যার যা ছিল, সবাই তাই পেতে, সিকি-মুঠো ক'রে চাল নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

বাইরে এসেই খেঁদি দাঁড়াল। এটা দলের নিয়ম। প্রত্যেক জায়গা থেকে বেরোন মাত্রই সবাইকে একবার গুনতি ক'রে নিতে হয়। আর সবাই যে যার মতো বক্-বক্ করতে করতে, অথবা ছেলে পিটতে পিটতে এগুলো। হঠাৎ খেঁদি চেঁচিয়ে উঠল, —এই মাগী, তু' কে লা ?

যাকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হ'ল, সে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চলেছিল। কেউ তাকে আগে লক্ষ্য করেনি। তার কাপড়খানা অন্য সবার মতো অত জীর্ণ নয়, একটু ফরসাই! চলনটাও বাধো-বাধো।

খেঁদি তার হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল। দলের দিকে ফিরে বলল, যা, যা তোরা এগো। তারপর মেয়েটির কাছে এসে বলল, তু'মাগী কোত্থেকে এয়েচিস ? খেঁদি মোড়লনীর নাম শুনিস্ নি ? দেখি দেখি মুখখানা তোর—ব'লে, একটানে তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিয়েই অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

—ওমা, —এযে ভদ্দর ঘরের মেয়ে গো!

খানিকক্ষণ তার মুখে কথাই ফুটল না। মেয়েটি ততক্ষণে নিজের মুখের কাপড় আবার টেনে দিয়েছিল। খেঁদি দলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, ক্ষ্যান্ত, আজ তুই খবরদারী করিস্। আমি ফিরনু।

মেয়েটিকে নিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

দলের সবাই একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল! কিন্তু ফেরবার উপায় নেই, তাহলে পিসী কি আর আস্ত রাখবে ? তাছাড়া পেটের তাড়া!

গলির পর গলি, সরু, মোটা, আবছা, অন্ধকার নানা রকম রাস্তা পার হয়ে আস্তানায় পেঁৗছে খেঁদি বলল, এইবার বলতো বাছা, কোত্থেকে এয়েচো ?

সার সার মাটি-লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম্ ফেলবার উপায়টুকুও বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে! মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই—সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া!

মেয়েটি দু'একবার চারদিকে তাকিয়ে ঘোমটার মধ্যেই শিউরে উঠল। তারপর মাগো—ব'লে, সেইখানেই বসে পড়ল।

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বলল,—কি গেরো! বলি ভিরমী গেল নাকি! কিগো ভালমানুষের মেয়ে, বলি দুকদম হাঁটতে পারবে ? চল, চল, আমার ঘরে, সেখানে

গে সব বলবে চল !

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে, দিনের রোজগার চাল ক'টি ও গোটা দু'য়েক পয়সা সযত্নে এককোণে রেখে, খে'দি এসে মেয়েটির সামনে বসল। বলল, এইবার মুখের কাপড় খোল। ওকি, কাঁদচ? তুমি নতুন নোক বুঝি? আর তাতো বটেই, সে তো তোমার চেহারাতেই নেকা রয়েছে! তা, এমন ছুরত্ থাকতে ব্যবসা না করে পথে বেরিয়েচ যে বড়? ব্যারাম পীড়ে হয়েচে বুঝি?

মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কে'দে উঠল।

খে'দি মহা বিরত হয়ে বলল,—ভ্যালা ঠ্যাকারের মধ্যে পড়নু যে! এযে রা-বাক্যি কিছুই নেই, যা বলি তাতেই কাঁদে। বলি বাছা, সব খুলে না বললে কি ক'রে বুঝব? আর, তা না হ'লে ঠাঁইও তো পাবেনা এখানে! বহেরের মানুষের হেথা থাকবার নিয়ম নেই! তুমি যদি দলে ভর্তি হও, তবে অবিশ্যি থাকতে পাবে। ঘর নিজেই গড়ে নাও, চাই আর কারো সাথে বকরা ক'রে থাকো, সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু আগে সব শোনা দরকার তো?

মেয়েটি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ফুপিয়ে কে'দে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যা বলল, তার মর্ম :

সে পাড়াগে'য়ে গেরস্ত ঘরের বউ। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, তেমনি এক পুরুষের সাথে কলকাতায় কালীঘাট দেখতে আসে। তাঁর সাথী তাকে নিয়ে এসে মানিকতলা খালের কাছে এক বাড়িতে রাখে। একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে তাকে নিয়ে, নেবুতলায় এক বাড়িতে পে'ছে দিয়ে সরে পড়ে। গয়নাগাঁটি টাকা কড়ি যা ছিল, সব সে নিয়ে গেছে। গলার একটা মালা ছিল, তা সেই নেবুতলার বাড়িউলি কেড়ে রেখেছে। তার সাথী চলে যাবার পর প্রথমটা সে কিছুই বোঝেনি। বাড়িউলি তাকে নানারকম আশ্বাস দিয়েছিল। দিন দুই থাকবার পর, একদিন রাত গোটা এগারোর সময় তার ঘরে দু'জন মাতাল ঢোকে। সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন সকাল হয়েছে—তারা ফিরে গেছে।

বাড়িউলি এসে বলল,—কি বাছা, খবর ভাল তো?

তার কথা কইবার শক্তি ছিল না। বাড়িউলি আগের দিনই তার হারটা দখল করেছিল, কাজেই জবাব না পেয়ে বিশেষ মেজাজ খারাপ করল না! বরং বলল,—তা ঘুমোও বাছা! পেথমদিন; একটু কাহিল তো লাগবেই!

বেলা গোটা দশেকের সময় মনের ও শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কোন্ পথ তার খোলা আছে? সে কয়বাড়ি আশ্রয়ের চেষ্টা করল। সবাই কেমন ক'রে যেন তাকায়, সব শুনে ফিরিয়ে দেয়। সব পথ বন্ধ। ভিক্ষেই করতে হবে! কিন্তু একা-একা নতুন মানুষ, ভেবে কুল পাচ্ছিল না, তাই পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাড়ি থেকে পটলডাঙার দল বার হ'তেই তাদের সাথে গিয়ে জুটেছিল! ভেবেছিল, এতবড় ভিখিরির দলে মিশে থাকলে কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না।

খে'দি বলল, তা—তোমার গে, বাছা, আমাদের দলে যাদের দেখলে, সবাই তো ওই করতো এককালে! পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে পড়ে, পতে বেরিয়েচে। তোমার এই বয়েস, অমন চেহারা—তা বাবু নিজে বোঝ।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার আর খে'দি কান্না শুনে খিট্-খিট্ ক'রে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি ভাবল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্চা, থাকো! কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কোলকাতা হেন জাগায় কি সামলে থাকতে পারবে? আমার খবরদারীতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সব সময় তো আমিও চোক রাখতে পারবো না?

মেয়েটি আবার চোখে আঁচল দিতেই খে'দি বলে উঠল,—আচ্চা, আচ্চা। ভয় নেই; কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। আমি একা থাকি, এইখানেই দু'জনে থাক্‌ব খন।

মেয়েটি পটলডাঙার দলে ভর্ত্তি হয়ে গেল।



ইতি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি ছিল না, তাই মুখের নিবন্ত চুরুট্টা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য গোটা চার-পাঁচ টান দিয়ে রমেশ শুধোল, 'এখন কি উপায়, কৃতার্থ ?'

কৃতার্থ ঠোঁট উল্টে বললে, 'উপায় একটা হবেই—'

রমেশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু গোঁফ-কামানো ছেলে আমি নামাতে পারবো না বলে রাখছি।'

কৃতার্থ বললে, 'তা আমি যোগাড় করে দেব-ই। এ-জায়গাটায় বহু বছর আগে একবার এসেছিলাম। সামনের ঐ বাবলা গাছটার ধার দিয়ে যে-পথটা খালের দিকে এগিয়ে গেছে—ঐ পথটা ভারি চেনা-চেনা। আপনি ঘাবড়াবেন না।'

চুরুটের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রমেশ বললে, 'না ঘাবড়েই বা কি করি! যোগাড় করে আনো একটি। এ বিষয়ে ত তোমার হাত আছে। কিন্তু খালি জোটালেই ত চলবে না, টালও ত সামলাতে হবে—'

'আচ্ছা দেখি।' বলে কৃতার্থময় চাদরটা কাঁধে ফেলেই তক্ষুণি বেরিয়ে গেল।

একটি অখ্যাত ছোট শহর—আশেপাশে দু'দশ খানি গ্রাম,—ম্যালেরিয়ায় ঠাসা।

বড়দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক থিয়েটার পার্টি এসেছে—বিনা নিমন্ত্রণেই। দু'রাত্রি থিয়েটার হবে বলে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, —'মালতী : শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।'—মানে, মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

এ-খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছল,—স্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষ বইয়ের কথা গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে—এ আশেপাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড। কিন্তু শহরের যাঁরা মাথা, মানে যাঁরা টাক ও টিকি, তাঁদের

কেউ-কেউ এ নিয়ে মহা গোল পাকিয়ে তুলছেন—বলছেন, 'ছেলেরা যাবে বিগড়ে, মেয়েদের মন যাবে বিষিয়ে। বন্ধ করে দাও।'

রমেশবাবু বললে, 'আপনিই হয় ত বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের যা দেশ,—মশাই-ই মশগুল। আসতে-আসতেই আমাদের চমৎকারিণী দাসীর জ্বর-চমৎকার হয়েছে। আমরা নিজেরাই পাল গুটাব।'

শহরের উকিল বগলাবাবু বললেন, 'তাই গুটোন মশায় ;—হাওয়া উত্তুরে। মেয়েমানুষ নাবালে এক পয়সাও মিলবে না আপনাদের, চমৎকারিণীর ওষুধের খরচটি পর্যন্ত নয়! আমাদের এখানে বনের মশা আছে থাক—বিলাসের মশাল চাইনে। অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয়।'

বগলাবাবুর আর যাই থাক, গলা আছে বটে ;—দেখতে ও শুনতে।

বগলাবাবু যেতে-না-যেতেই একখানা ছ্যাকড়াগাড়ি এসে দাঁড়ালো। দোর খুলে কৃতার্থ নামছে। পেছনে একটি মেয়ে।

কৃতার্থ ঘরে ঢুকেই বললে, 'এনেছি মশাই, দেখুন বাজিয়ে এবার।'

মেয়েটি ভারি ভীরু, ঘোমটাটি একটু টেনে দেয়ালের সঙ্গে মিশে রইল। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটি কোমলতা আছে। প্লে-তে মালতীকে এমনি একবার দাঁড়াতে হবে,—রমেশবাবুর পছন্দই হল হয় ত।

বললে 'তুমি যে আমাকে কৃতার্থ করলে হে! ব্যাপার ?'

বুক চাপড়ে কৃতার্থ বললে, 'খালের পারে যে এমন কলি ফোটে কলিকালের পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য, রমেশবাবু। বাৎচিৎ করে হাল-চাল সমঝে নিন। চলবে ? ব্র' এক পেগ পেটে খাওয়ার মতো একটু ঘোর-ঘোর লাগছে না ?'

মেয়েটি ততই যেন মীইয়ে যেতে থাকে।

রমেশ শুধাল, তোমার নাম কি ?'

মেয়েটি ঘোমটার ফাঁক থেকে জবাব দিল, 'সরলা।'

স্বরটা একটু ভীতু বটে, একটু জোলো—কিন্তু ভারি স্পষ্ট।

কৃতার্থ বললে, 'ঘোমটা একটু কমিয়েই আনো না, দিনের আলোয় এত ভয় কিসের ?'

নিবিড় অন্ধকারের মতোই কালো দু'টি চোখ,—সরলা ঘোমটা একেবারে মাথার ওপর তুলে আনলে—কিন্তু দু'টি চোখেই যেন অন্ধকারের অগাধ স্নেহ মাখা। সমস্ত মুখে একটি ভারি মিষ্টি কমনীয়তা আছে, পাতলা ঠোঁট দু'টি পরস্পরের সঙ্গে ভারি আলগোছে ছোঁয়াছুঁয়ি করে আছে, একটুখানি কপাল—রমেশের মনে হচ্ছিল মাপলে হয় ত দু'আঙুলের বেশি হবে না, চিবুকটি একটু চ্যাপটা হয়ে গালের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়াতেই মুখখানিতে এমন একটি পেলবতা এসেছে।

মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই, যেন বিকেলের আলোয় টলটল করছে।

নাটকের নায়িকার সঙ্গে কল্পনায় যতবার রমেশের সম্ভাষণ হয়েছে—অমনি তার

মুখের ডৌলটি, ভাসা-ভাসা দু'টি চোখে অমনি একটি সস্নেহ কুণ্ঠা শুধু দাঁড়ানোটিতেই অমনি একটি সুষমা। মেয়েটি বেশ।

রমেশ ঢোক গিলে বললে, 'তুমি পড়তে জানো ত?'

সরলা বললে, 'জানি একটু-একটু। তবে কয়েকবার শুনলেই মনে করে রাখতে পারি।'

রমেশ হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস রে, নিমাই? দে ঐ চেয়ারখানা সরলাকে এগিয়ে।'

তিন-চারখানা হাত বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

চেয়ারের দরকার হল না। সরলা মাটিতেই বসল।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে প্লে করবে? প্লে মানে খেলা নয়, নাটক।

কৃতার্থ ভুরু কুঁচকে বললে, 'ও' তা খেলা-ই। কি বলো হে—

ঠোঁটে হাসি ফুটতে না দিয়েই সরলা বিজ্ঞের মতো বললে, 'সংসারটাই ত খেলা শুনেছি।

কৃতার্থ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কেয়াবাৎ। সরলা শুধু আমাদের দর্শন দেনই না, শেখানও।'

রমেশ বললে, 'পারবে করতে?'

সরলা বললে, 'শিখিয়ে দিলে কেন পারব না? আমাদের শুধু পাখা নেই, নইলে ত আমরা পাখিই।'

কৃতার্থ ফের ভুরু কুঁচকোল। বললে, 'পাখা নেই, কিন্তু উড়তে জানো খুব। তোমরা পোকাও।'

সরলা বললে, 'আগুন দেখলেই উড়ে পড়ি। তাতে আগুন নেভে না, পাখাই পোড়ে।'

মেয়েটি দেখতে ভীতু, কিন্তু কথায় জিলিপি।

রমেশ বললে, 'ছোট্ট একটুখানি পার্ট, কিন্তু ভারি শক্ত। দু'তিন দিনে তৈরি করে দিতে হবে। আমরা আসচে শনিবারেই নামিয়ে দিতে চাই. আজ মঙ্গলবার।—পারবে ত? মোটে তিনটি সিন।

সরলা ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিলে।

আজ দুপুরেই তা হলে তোমাকে নিয়ে আসব। যার এই পার্ট করবার কথা ছিল, সে পড়েছে অসুখে,—তাই মুশকিল যেমন মারাত্মক, তাড়াও তেমনি। কেননা আসচে হপ্তায় বগুড়ায় একটা বায়না আছে, আগাম টাকা নিয়ে বসে আছি। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে আসবে ত? বাড়ির ভিড় এ দু'দিন একটু সরিয়ে দাও;—এই নাও।'

বলে রমেশ মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট সরলার দিকে প্রসারিত করে দিল। সরলা আঁচলের খুঁটে নোটটি বেঁধে কোমরে ভালো করে গুঁজে নিলে। ওর দুই চোখ খুশিতে উছলে উঠেছে।

রমেশ বললে, 'গাড়ি করে ওকে পেঁৗছে দিয়ে এসো, কৃতার্থ।'

সরলা বললে, 'গাড়ি কি হবে? কতটুকুই বা পথ,—দু'কদম। হেঁটেই যাচ্ছি।'

রমেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে যা নিমাই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

নিমাই পা বাড়াচ্ছিল, সরলা পেছন না চেয়েই বললে, 'দিনের বেলা লোক লাগবে কেন? একলাই ত যাওয়া-আসা করি,—আমি খুব যেতে পারব। আসব দুপুরে।'

সরলার চলাটিও বেশ—এক মুঠো ঝিরঝিরে বাতাসের মতো, বেশ জিরিয়ে-জিরিয়ে চলে। বাবলা গাছের গোড়া থেকেই পথটা বাঁক নিয়েছে। আর দেখা যায় না।

কিসের গাড়ি,—কিসের লোক!

সরলার সঙ্গে পৃথিবীর আজ নতুন করে শুভদৃষ্টি,—মগ-ডালের লাজুক হলদে ফুলটির পর্যন্ত। খালে জেলেরা জাল ফেলেছে নৌকোর গলুইএ দাঁড়িয়ে, পারে কারা বেত চাঁচছে' রোদ্দুরে খোলা পিঠ পেতে কাদের বাড়ির বৌ কলার পাতায় তেল মেখে বড়ি দিচ্ছে,—সরলা। ইচ্ছা করে সবাইর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়। ওদের ছায়া মাড়ালে স্নান করে—ঐ যে পুরুতঠাকুর আসছেন. তাঁকে দূর থেকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসে; কাউকে খামোকা জিজ্ঞেস করে, বাবুইহাটির এ-রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর' বেরিয়ে গেলে কত দূরে ঐ সবুজ মেঘটাকে মুঠির মধ্যে ধরা যায়—'

সরলা টঁ্যাকে-গোঁজা নোটটা বারে-বারে অনুভব করতে-করতে বাড়ি চলে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সরলা ডাক ছাড়ে, 'ওলো ও ভূতি, কি করছিস? দেখে যা শিগগির—আমি থেটার করব। খোদ ফরিদপুর থেকে থেটারের দল এসেছে,—আমাকে পার্ট দিয়েছে। আমি রাণী সাজব,—মাথায় মুকুট, গলায় মটরমালা, পায়ে সেই জুতো—ঐ যে ঘোড়ায় চড়ে ছোটলাট এসেছিল, তারা বিবির সেই খুর-তোলা জুতো দেখেছিলি, তেমনি। রাজা আমার পায়ের কাছে পড়ে কত কাঁদবে, কপাল কুটবে,—আমি ঘাড়টা এমনি করে থাকব—'

সরলা ঘাড়টা তেমনি করে দেখালো।

ভূতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরলার এ অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে একেবারে থ' হয়ে গেছল। বললে, 'কি লো. ঘোড়দৌড় দেখে এলি নাকি?'

সরলা বলতে থাকে, 'এই দ্যাখ বায়না দিয়েছে দশ টাকা। দশ পয়সার বেপারি—দেখেছিস এমনি কাগজ,—সবুজ নীল কালো কালি,—পড়তে পারিস? দশ রুপেয়া! ক'আনা জানিস? এক টাকায় ষোল আনা,—দশ টাকায়?'

এবার সত্যি ভূতির চোখ চড়ক-গাছ। দম নিয়ে বললে, 'সত্যি বলছিস, সরি? পথে কুড়িয়ে পেলি নাকি লো? এত ভাগ্যি তোর?'

'পথে আমার জন্যে সব মুক্তো ঢেলে রেখেছে, তোদের জন্যে তেঁতুল-বিচি! পাঁচ মুখে পাঁচ হাটে আমার নাম বিকোয়,—কে জানত আগে? কোথা সে ফরিদপুর, সেখান থেকে আমার নাম শুনে এসেছে এই শহরে! আমাকে তাদের দলে ভর্তি করে নেবে। ভারি শক্ত প্লে নিয়ে নেমেছে রে ভূতি,—সবচেয়ে শক্ত পার্ট পড়েছে আমার হাতে। কে আর করবে বল্? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটাকে,—মুখ দিয়ে একটা রা

বেরুল না,—আর আমাকে যেই বলা, দিলাম বলে গড় গড় করে ঃ প্রাণনাথ, রাখো তব পদতলে! বাবুদের সে কী তারিফ! বললে,—সরলা, তোমার ছাড়া কারু আর সাধ্যি নয়।—বারে-বারে হাঁটু গেড়ে বসতে-বসতে পা দু'টো ব্যথা হয়ে গেছে।

কি যে বলবে সরলা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। বলে, 'আসছে শনিবার সন্ধ্যায় হবে। তোদের দেখিয়ে দেব মাগনা, পাস পাওয়া যাবে ঢের। দেখবি রাণীর পোষাকে কী মানায় আমাকে। রাজা—সে সেজেছে নবিগঞ্জের জমিদারের ছেলে—আমার পায়ের কাছে মুক্তো ঢালবে, মাথার মুকুট খুলে রাখবে, রুমাল মুখে পুরে কত ফুঁপিয়ে-ফুঁফিয়ে কাঁদবে, আমি ঠায় সিংহাসনে বসে থাকব, মাথা উঁচু করে রাখব।'

বলে সরলা মাথাটা কড়িকাঠের দিকে উঁচু করে ধরে।

ভূতি বলে, 'মাগনা দেখাবি ত সত্যি? ছাপানো কাগজ বিলি হবে না?'

'হবে লো, সব হবে।'

বলে সরলা বারান্দার ওপাশে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ল ঃ 'ও বাড়িউলিদিদি! বড়ো যে সেদিন ঘরভাড়ার পাওনা টাকা নিয়ে তম্বি করছিলে, নাও তোমার টাকা—সাড়ে পাঁচটাকা ফিরিয়ে দাও দিকিন।'

বাড়িউলি নোটটা হাতে পুরে বললে, 'সাড়ে পাঁচ টাকা কি? সেদিন যে তোর অটলবাবু দু'পাইট মদ খেয়ে গেল—তার দাম কে দেবে?'

সরলা বললে, 'তা আমি কি জানি? যে গিলেছে তার থেকে নাও গে—'

'তা ত বটেই লো, ছুঁড়ি। কে সে যে তাকে আমি শখ করে মদ দিতে যাবো? তোরই পীরিতি পোড়ে বলে না আমি—সে আমি বুঝছিনে বাছা, হাতের কাছে করকরে টাকা পেয়ে আমি ছাড়ছিনে, নিতে হলে তুমি আদায় করে নিয়ো—'

সরলার মোটেই ঝগড়া করবার মন ও অবসর ছিল না; বললে, 'নাও, নাও, ঝামেলা রাখো, যা নেবার নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দাও শিগগির। হিসেব-ফিসেবে পরে হবে খন। আমার ঢের কাজ।'

খুচরো টাকা কটা নিয়ে যেতে-যেতে সরলা বললে, 'অমন বাবুর মুখে ঝাড়ু!'

বাড়িউলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুখ-ঝামটা দিয়ে বললে, 'কার মুখে ঝাড়ু লো, ছুঁড়ি? লজ্জা করে না বলতে? সেদিন ত ঐ বাবুই জুতোর গোড়ালিটা দিয়ে বোঁচা নাকটা থেঁৎলে দিয়েছিল! ঐ থেৎলানো নাক নিয়েই ত সেই বমি-মুখো বাবুর সামনে পিকদানি তুলে ধরেছিলি!'

পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'অত ছুটোছুটি ভালো নয় সরি, কানে তুলব কিন্তু—

সরলা বললে, 'তুলো না! পাখি এবারে সরে পড়ছে,—বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না। পায়ের কড়ে আঙুলের ডগায় বেঁধে রাখতে পারি—'

বাড়িউলি চাপা গলায় শুধু বললে, 'আচ্ছা।'

সরলা ঝিকে পাকড়ালে। বললে, 'তোমাকে এক্ষুনি সাজো-ধোপার বাড়ি যেতে হবে, মাসি। পয়সা না পেলে কাপড় দেবে না বলে শাসিয়েছে—এই ছ'টা পয়সা

ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দিয়ে এসো ত। বোলো,—এবার থেকে ছ'টাকা দিয়ে বিলেত থেকে কাপড় কাচিয়ে আনব। ও ভয় দেখায় কি? এক্ষুনি যাও, মাসি,—গঙ্গাজলিটা পরে আমার এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। আর শোনো, এখন আর রাঁধবার সময় হবে না,—দু'পয়সার ফুলুরি নিয়ে এসো,—আর, আর দু'পাতা আলতাও কিনে এনো,—কতটুকুনই বা হাঁটতে হবে,—যাও লক্ষ্মী! মোটমাট দশ পয়সা দিলাম,—কিছু ফিরলে আমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, তোমার ছেলে হরির নামে নিয়ো—'

ঝি বলতে-বলতে যাচ্ছিল, 'ফিরবে তোমার মাথা—'

সরলা আর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'নাও তবে আরেকটা।'

সরলার চোখে নিজের ঘরটাই শুধু আজ বিশ্রী লাগছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘরের সমস্ত কদর্যতা যেন বের করে ফেলেছে। নোংরা বিছানা, ছেঁড়া বালিশ, আ-মাজা বাসন-কোসন, দেয়ালে ঝোলানো মাংসের ও মদের দাগ-লাগা অটলবাবুর চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবিটা। দিনের আলোয় ঘরটাকে যে এত বিরস এত বেমানান লাগে সরলার তা কোনোদিন চোখে পড়েনি।

সরলা জানলাটা বন্ধ করে খালের পারে এসে দাঁড়ালো। রোদ কতকটা চড়া হলে ওখানে যাবার মতো দুপুর হবে মনে-মনে ও তারই হিসেব করছিল। ছাই গাড়ি! ওর পা বেতো ঘোড়ার চেয়ে আগে যাবে।

ঝি এসে হিসেব দিলে। মোট এগারো পয়সাই লেগেছে।

বললে, 'দু'পয়সার ফুলুরিতে কি লোকের পেট ভরে?'

সরলা বললে, 'তুমি কি বোকা, মাসি! আমি কি পেট ভরে খাবার জন্যে তোমাকে বাজারে পাঠিয়েছি নাকি? আমার যে আজ নেমন্তন্ন থেটার-পার্টিতে। আমি রাণী সাজছি।—সেখানে কত খাবার দেবে'খন। ক'টা না ক'টায় খাওয়া হয়, সেজন্যে ক্ষিদেটাকে একটু মেরে রাখবার জন্য দু'টো চিবিয়ে যাওয়া। ও আর আমি ছোঁব না মাসি, ও তোমার হরিকে নিবেদন করে দাও গে। আর শোনো—আমি তোমাদের মাগনা থেটার দেখিয়ে দেব'খন। তুমি যেয়ো হরিকে নিয়ে—বাপের বয়সে তোমরা তা কখনো দেখোনি।'

সরলা তাড়াতাড়ি চান করে নিলে। আয়নার কাছে বসে-বসে অনেক কসরত করবার সময় নেই মনে করে তাড়াতাড়ি চুলটা জড়িয়ে নিয়ে, ধোয়া শাড়ি সেমিজ পরে পায়ে টাটকা আলতা আর কপালে কাঁচপোকার টিপ লাগিয়ে না-খেয়েই বেড়িয়ে পড়ল। বড়ো রাস্তার উকিলবাবুর বৈঠকখানায় ঘড়িটা দেখবার জন্য একবারটি নিচু হয়ে চোখ পেল না। যা হোক গে, একটু আগে যাওয়াই ভালো।

এখন কোচোয়ানরা সব খেতে গেছে. আড়গাড়ায় গাড়ি মেলাই ভার হবে। থেটারের বাবুদের শুধু-শুধু কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সরলা এমন কি নবাবের বেটি!

পথ যেন সরলার এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে গেল। পায়ের কাঁচা আলতার দাগ তখনো শুকোয়নি, কাঁচা মাটির রাস্তায় ছোট-ছোট দাগ লেগেছে।

শহরের এ-বাড়িটা রমেশবাবুরই, এতদিন পড়ে ছিল।

পাশের মাঠে সকাল থেকেই স্টেজ খাটানো চলেছে,—এ-পাড়ার সমস্ত ঘরামিই লেগে গেছে,—হোগলা তেরপল বাঁশ দড়ি পাটাতন বেঞ্চিতে ঠাসা। ময়মনসিং থেকে সিন্ এসে পেঁচিছে। কে একজন সিনগুলিকে তদারক করছে, একটু-একটু মেরামত করছে,—ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়,—একজন ধমকে উঠলেই সবাই ছিটকে পড়ে—আবার গুটি-গুটি এসে জড়ো হয়,—কোলাহলে বাতাস যেন টুক্রো-টুক্রো হয়ে যাচ্ছে!

সরলা এসে দাঁড়ালো।

রমেশবাবু তখন ভেতরে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল। শহরের কয়েকটি বয়স্ক ছেলে রমেশকে অভয় দিচ্ছিল, 'বগলাবাবুর গলাবাজিতে ভড়কাবেন না, মশায়। আর যাই হোক, গেঁজেল ছোঁড়াদের হেঁড়ে গলায় 'প্রাণনাথ' ডাক শুনতে কক্ষনো পারব না আমরা—আত্মারাম খাঁচাছাড়া আর কি! চোখ বুজে কানে আঙুল ঢুকিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যাবে?'

রমেশ হেসে বললে, 'সে-ভয় আমার নেই,—ঢের ঢের বগলাবাবু দেখেছি।'

ছেলেদের থেকে একজন বললে, 'নিচু ক্লাসের চার আনাই করবেন মশাই,—তাই জোটাতে আমদের প্রাণান্ত।'

রমেশ বললে, 'যতই কেন না উনি বগল বাজান, আমাদের চমৎকারিণীকে দেখে ও তার য়্যাক্টিং শুনে উনি যদি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে না যান, ত কি বলেছি!'

এমনি সময় নিমাই উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সরলা এসেছে।'

রমেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ছেলেগুলিকে বিদায় দেবার চেষ্টায় বললে, 'আচ্ছা, তাই কথা রইল। একদিন না-হয় স্টুডেন্টদের হাফ করে দেব।

'বেশ, বেশ, চমৎকার।' বলে ছেলেরা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তেমনি কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন টেনে সরলা এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটায় তলা দিয়ে ভিজা চুলগুলি পিঠের দু'দিকে ঝেঁপে পড়েছে,—ফিনফিনে শাড়িটি পরাতে সরলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে,—সরলার কটিটি যেন মুঠির মধ্যে ধরে নেওয়া যায়,—এমনি—হালকা। সমস্ত মুখে বিষাদের একটি স্তিমিত অপূর্ব শ্রী।

রমেশ খুশি হয়ে বললে, 'তুমি এসেছ, সরলা? বেশ, বেশ। খেয়ে এসেছ ত?'

সরলা ঘোমটাটা আলগোছে একটু কমিয়ে আনলে; বললে, 'খেয়েই এসেছি।'

—'তবে তুমি ওখানে একটু বোসো, আমরা চান করে খেয়ে নিই, পরে মহড়া শুরু হবে। ও নিমাই, সরলাকে একখানা বই এনে দে ত। তুমি ত পড়তে পার, একটু-একটু, —এখন একটু চোখ বুলিয়ে নাও,—পরে হাত-পা নাড়া সব আমি শিখিয়ে দেব। মোটে তিনটি সিন তোমার, লাস্ট সিনটার সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে,—তুমি বেঁকলেই সমস্ত বই বেফাঁস। ঐটেই বেশ ভালো করে করতে হবে। পার্টে তোমার নাম মালতীমালা—জালন্ধরের রাজার একমাত্র মেয়ে। তুমি রাজকুমারী।'

সরলা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল,—গলা যেন শুকিয়ে

আসছে। জেগে-জেগে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে ও স্বপ্ন দেখছে। ওর সমস্ত জীবনের সঙ্গে বেখাপ্পা এই মুহূর্ত ক'টি যেন সুমধুর মদিরায় ভিজে গেছে। ও রাজকুমারী।

রমেশ একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

সরলা চেয়ারে না বসে ঘরের একটি কোণে মাটির ওপর তেমনি বসেছে—দেয়ালে পিঠ রেখে। নিমাই বই নিয়ে এল। পাতাগুলি উল্টোতে-উল্টোতে কাছে এসে বললে, 'তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তোমার প্রথম আবির্ভাব,—স্টেজে তুমি আর আমি। দুজনে প্রগাঢ় প্রেম হচ্ছে। মাঝের দৃশ্যটাতে তুমি আমার প্রেমে সন্দিহান হবে,—শেষ দৃশ্যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি নিয়ে মারতে আসবে,—কিন্তু—'

ও-ঘর থেকে রমেশ হেঁকে উঠল, "নিমাই!"

নিমাই বললে, যাই কিন্তু আমাকে, আমাকে কি করে মারবে তুমি? কে আমার নাগাল পায়? তোমাকে পেয়ে সরলা, সত্যিই আমার য়্যাক্টিং খুলে যাবে, পিপের মতো মোটা চমৎকারিণীর সঙ্গে স্টেজে প্রেম করাও একটা প্রকান্ড দুর্ভোগ। ওর দু'পল্লা গলার চামড়া দেখলে ভয়েই আমার গলা কাঠ হয়ে আসে,—প্রেমের বুলি বেরুবে কি ছাই! তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম—দু'টি চোখে এমনি একটা লজ্জা,—তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠবে—গানের মতো, ছবির মতো!'

সরলার দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে এসেছে,—নিমাইর প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধায় ও স্নেহে ওর মুখের সমস্ত রেখাগুলি কোমল, কমনীয় হয়ে এল। কিছুই বলতে পারল না, খালি একটি সপ্রেম কুণ্ঠায় নিমায়ের মুখের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

ও-ঘর থেকে রমেশবাবুর আরেকটা বিকট আওয়াজ আসতেই নিমাই তাড়াতাড়ি বইখানা সরলার কোলের ওপর ফেলে পিঠ দেখালো।

চমৎকার ছেলে এই নিমাই! উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না? ছিপছিপে পাতলা চেহারাটা, টানা-টানা চোখ; কথায় যেন মধু ঢালা। এর সঙ্গে প্রেম করবার সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে কি কি কইতে হবে জানবার জন্য সরলা তাড়াতাড়ি বইয়ের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য খুলে বসল। একটু কষ্ট করে-করে পড়তে লাগল,—চমৎকার।

প্রথমেই মালতী অর্থাৎ সরলা বলবে: 'কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে—জ্যোৎস্নায় আকাশ ধুয়ে যাচ্ছে; পিকগণ কলরব করছে,—ফুলের গন্ধে, আকাশের নীলিমায় এত মধু। চলো উদ্যানে যাই।'

তারপর হিরণকুমার ওরফে নিমাই বলবে: "উদ্যান? ছার উদ্যান,—এ গৃহই আমার আকাশ, আমার স্বর্গ, মালতী। তোমার মুখখানি আমার চাঁদ, তোমার কণ্ঠস্বরে লক্ষ পিকের কুহরণ, তোমার দু'টি পরিপূর্ণ অধরের রঙিন পেয়ালায় রঙিন মদিরা।..'

সরলা আর পড়তে পারে না, আবেশে সমস্ত গা অবশ হয়ে আসে। কে যেন ওর দিকে দু'টি সকম্প সাগ্রহ বাহু বিস্তার করে দিয়েছে,—কার কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহপূর্ণ কাতর কাকুতি! শুধু কথার মধ্যে যে এত মাদকতা থাকতে পারে সরলা কি তা

জানত? নিমাই,—নিমাই ওকে এই সব বলবে?

তার পরে—

খাওয়া-দাওয়ার পর রিহার্সেল শুরু হল।

দি ইয়ং ইণ্ডিয়া থিয়েট্রিক্যাল পার্টির প্রোপ্রাইটার, ম্যানেজার ও প্রধান য়্যাক্টার—সমস্তই রমেশবাবু। এমন কি জালন্ধর-পতন নাটকের লেখকও স্বয়ং উনিই। লোকটি চৌকস।

যাই হোক, শুরু হল রিহার্সেল। সবাইরই পার্ট তৈরি—দু'বছর নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জালন্ধর-পতনেরই অভিনয় চলেছে। তাই সমস্ত দিন-রাত্রি ভরে সরলার পার্টেরই মহড়া দিতে হবে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য: সরলা আর নিমাই। দূরে চাঁদ, কাছে নদী—দৃশ্যের পৃষ্টপট।

সমস্ত রাজ্যের লজ্জা এসে সরলাকে গ্রাস করেছে। দু'বার তিনবার চেষ্টা করে সরলা যা বললে তার আর তুলনা হয় না। স্বাভাবিক লজ্জায় ওর কণ্ঠস্বরে একটি অস্ফুট কোমলতা এসেছে, তা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সমবেত অভিনেতার তারিফ শুনে সরলার মন গভীর আনন্দে স্নান করে উঠল,—জীবনের এই আনন্দের আস্বাদ যিনি ওকে প্রথম দিলেন, ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে সেই কৃতার্থবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়,—রমেশবাবু, নিমাইবাবুরো।

আর নিমাই! এই দু'বছরের মধ্যে নিমাই আর কখনো এত ভালো অভিনয় করেনি।

রমেশ সরলাকে মোশন দেখিয়ে দেয়, উচ্চারণের তারতম্য শেখায়, স্টেজে চলা-ফেরার ভঙ্গিতে সজ্জিত করবার চেষ্টা করে। সরলা ঠিক-ঠিক শিখে নেয়,—যেখানে যেটুকু ভুল করে সেই ভুলটুকুই যেন সবার চোখে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

কৃতার্থ বলে, 'কেয়াবাৎ! এই ঠিক।'

একেবারে একটি আনকোরা মেয়ের পক্ষে এমন স্টেজ-ফ্রি হয়ে অভিনয় করে যাওয়া—সবাই প্রশংসাসূচক বলাবলি করে। ততই সরলার মনে একটা আত্মবিশ্বাস আসে, তেজ আসে, নিমাইর প্রতি ওর সত্যিকার স্নেহ যেন ততই একটা প্রকাশ পাবার আশা করতে থাকে।

এই এক সিন-এই সরলা দাঁড়িয়ে গেছে।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার সরলায় অভ্যুদয়; এবারে অন্য প্রকার মনোভাব নিয়ে। মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর সঙ্গে হিরণকুমারের প্রেম হয়েছে মনে করে মালতীর ক্রুর সন্দেহ, আহত অভিমান!

মালকানা-নগরের রাজপুত্রীর ভূমিকায় যে নেমেছে সে রোগা, চিমসে—তার দিকে তাকালে সরলার রাগের চেয়ে করুণাই বেশি হয়।

সে সিনটাও কোনো রকমে উৎরে গেল—চলনসই।

এবারে শেষ অঙ্কের দৃশ্য। রমেশবাবু কলমের খোঁচা মেরে এই দৃশ্যটিকে একেবারে জমজমাট করে তুলেছে—সব দৃশ্যকে টেক্কা মেরেছে এ।

কিন্তু এই সিনটিতে এসে সরলা হাঁপিয়ে পড়ল। কিছুতেই পারল না ফোটাতে।

এই সিন-এ মালতী হিরণকুমারকে হত্যা করবার জন্য হাতে বিষাক্ত ছুরিকা নিয়ে প্রবেশ করবে—চোখে জ্বলবে দীপ্তি, অধরে কুটিল হিংসা, ক্রোধে সমস্ত দেহ যেন একটি লালায়িত বহ্নিশিখা! সরলা কিছুতেই মুখে-চোখে সেই দৃপ্তভাব আনতে পারে না, মুখখানি তেমনি সুকোমল ও সুকুমারই থেকে যায়।

ছুরি তোলা-টিও ঠিক হয় না।

কৃতার্থ অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বলে, 'না, হল না। আমাদের চমৎকারিণী এ-জায়গাটা কি চমৎকার করত!'

নিমাই প্রতিবাদ করে, 'প্রথম দিনে চমৎকারিণীর সাধ্যি ছিল না এমন উৎরোয়।' দু' পাঁচবার দেখিয়ে দিলে সরলা চমৎকারিণীর ওপর ডবল প্রমোশান পাবে।'

রমেশবাবু সরলাকে দেখিয়ে দেয়, গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে মুখে একটা বিকটতা আনে, কণ্ঠস্বরকে হেঁড়ে করে তোলে;—সরলা অনুকরণ করে বটে, কিন্তু মুখে কিছুতেই সে-দৃঢ়তা আসে না। ওর নিটোল চিবুকটিই ওর মুখের এই কৃত্রিম অমানুষিক বন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে,—ওর দু'টি চোখের সেই ব্রীড়ার কুয়াসা কিছুতেই কাটে না, কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হয় বটে, কিন্তু তার মৃদুতা ঘোচে না। হাতে ছুরি তন্ময়, যেন ফুলের মালা নিয়ে এসেছে।

কৃতার্থ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'হবে না। কিন্তু এ-সিনটাই সব, একে মার্ডার হতে দিলে-প্লেই ফক্কা। এখানে চমৎকারিণীর কি আশ্চর্য রকম ডেলিভারি ছিল।

রমেশও হাল ছেড়ে দেয়। সরলার মুখ এতটুকু হয়ে আসে।

সরলা ঢোক গিলে বলে, 'একদিনেই কি আর হয়? অভ্যেস ত নেই—কালকেই দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে।'

নিমাই সায় দিয়ে ওঠে, 'নিশ্চয়ই। একদিনে ওর পার্টসের যা প্রমাণ পাওয়া গেল, কোচিং পেলে চমৎকারিণী ত ছার, প্রভাও ওর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আচ্ছা, তার পরেরটুকু হোক।'

সরলা উৎসুক হয়ে প্রম্প্‌ট্ শুনতে লাগল—এর পরে কি আছে!

মালতীমালা প্রথমে ত ছুরি উঁচিয়ে হিরণকুমারকে খুন করতে এল,—এসে খুব খানিকটা স্বগত উক্তি করে যেই সত্যি সত্যি ঘুমন্ত হিরণকুমারের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে যাবে, দেখবে—হিরণকুমার আগেভাগেই বিষ খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! তখন মালতীর কী সে অনুশোচনা!—ছুরি ফেলে দিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে, কী কান্না সে—হিরণকুমারের বুকের ওপর লুটিয়ে-লুটিয়ে।

সেই কান্নার মধ্যেই যবনিকা-পতন।

নিমাইর মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি

নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল ক'টির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো সমস্ত হৃদয় গলে পড়ছে!

নিমাই চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে সরলার কোলের কাছে মাথাটা রেখে মড়ার মতো পড়ে আছে। সরলার কান্না শুনে ওর নিজেরো চোখ ভিজে উঠছে। খালি ওর সেই দিদির কথা মনে পড়ে, যিনি ওর অসুখের সময় প্রাণপণ সেবা করেছিলেন সেবার।

সরলার কান্না ও কাকুতি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। একজন বললে, 'অডিয়েন্স্-এর বুক ফেটে যাবে।'

খালি কৃতার্থ-ই সর্বান্তঃকরণে মানতে চায় না। বলে, 'বুক ত ফাট্‌বে, কিন্তু এর খানিক আগে যে, ছুরি-হাতে দেখে হেসেই বুক ফেটে গেছে। ফাটা বুক আবার ফাটে কি করে?'

সেই লোকটা বললে, 'তবে ফাটা বুক জোড়া লাগবে, কৃতার্থবাবু।'

প্রম্প্‌ট্‌ করতে-করতে রমেশ এতক্ষণ ভাবছিল—জালন্ধর-রাজের পার্ট ছেড়ে হিরণকুমারের পার্টেই নেমে যাবে কি না! বললে, 'কিন্তু এই দেখো চমৎকার মানিয়ে যাবে, কৃতার্থ!'

'তা মানিয়ে নিতেই হবে এক রকম করে। কিন্তু চমৎকারিণী কি সুন্দর করেই যে কন্‌ট্রাস্ট্‌টা ফুটিয়ে তুলত! পড়ল জ্বরে—'

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে, 'ওকে ওষুধ-পথ্য দিয়েছিস ত রে নেমা! সন্ধ্যে হয়ে গেছে যে।'

নিমাই ওষুধ-পথ্য নিয়ে ও-ঘরে গেল। চমৎকারিণী বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছে। জ্বরটা একটু কমেছে বিকেলের দিকে। উঠে বসে কান খাড়া করে সরলার রিহার্সেল শুনছিল।

বললে, 'কে নিয়েছে মালতীর পার্ট?'

নিমাই উদাসীনের মতো বললে, 'চিনি না।'

চমৎকারিণী বললে, 'পারছে না বুঝি! বোকার মতো হাপুস-হুপুস কি রকম কাঁদছিল, একলা হাসতে-হাসতে আমার কোমরে ব্যথা ধরে গেছে—'

নিমাই চটে উঠে বললে, 'তোমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো করে। ওকে পেয়ে আমি বর্তে গেছি। হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছি—'

'বটে? হাঁফ ছেড়ে বেচেছ? খাব না আমি ওষুধ, ডাকো রমেশবাবুকে।'

'ডাকছি।' বলে নিমাই সরে পড়ল।

রাত বাড়ছে।

এক-থালা খাবার ও এক-পেয়ালা চা দু'হাতে করে নিমাই সরলার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, খেয়ে নাও খানিকটা।'

সরলা অল্প একটু হেসে বললে, আপনার মুখও তো শুকনো, আপনিও খান।'

'আমি খাব' খন।

'আপনি না খেলে আমি খাব না।'

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দুজনে খাবারের থালাটা শেষ করল।

রমেশ ডাকলে, 'নিমাই!'

নিমাই তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা সরলার হাতে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যাই।'

রমেশ সরলার হাতে আবার একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে। বললে, 'গাড়ি ডেকে দি?'

সরলা বললে, 'দরকার হবে না।'

'কালকে ঘুম থেকে উঠেই এসো। এখানেই খাবে দাবে! বুঝলে?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সরলা একা পথে বেরিয়ে পড়ল।

বাবলা গাছটার বাঁক ঘুরতেই সরলা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিমাই। বললে, 'গাড়িতে উঠে এসো, সরলা।'

সরলা আপত্তি করল না। গাড়ি খালের দিকে গড়ালো।

দুজনে মুখোমুখি বসেছে। নিমাই বললে, 'তোমার দিকে টেনেছিলাম বলে চমৎকারিণী ফণা তুলে আছে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি সরলা, তুমি না থাকলে আমি কক্ষনোই এবারে প্লে করব না; ডাঙার কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারব ওদের।'

সরলা যেন সমুদ্রের কূল দেখে; গর্বে, সুখে ওর বুক ডগমগ করে ওঠে!

নিমাই পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলে, 'খাবে?'

সরলা সিগারেটটাই খায়, তবু বলে, 'না।' নিমাইর সামনে ওর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে না।

নিমাইও খায় না। বলে, 'ঐ সিনটাতে খুন করতে আসাটাই বড়ো নয়, ভালোবাসার লোককে মরে গেছে দেখে ছুরি ফেলে আর্তনাদ করাটাই বড়ো কথা। কার্টেন্ পড়বার সময় লোকের মনে খালি তোমার ঐ কান্নাই ঘুরে বেড়াবে,—চোখের জলে ভেজা তোমার মুখখানিই তাদের চোখের তারায় আঁকা থাকবে।'

সরলা বলে, 'আপনি পৃথিবীতে আর নেই, এ-কথা মিথ্যি-মিথ্যি করে ভাবলেও আমার কান্না পায়।'

কিন্তু কথাটা শেষ করতে না করতেই সরলার ভারি লজ্জা পেল।

নিমাই ভাবে—সরলার ঐ আঙুল ক'টি আবার নিজের চুলের মধ্যে রাখে কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরবার পর্যন্ত সাহস হয় না। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

খালের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সরলা নিজেই কবাট খুলে নেমে পড়ে। বলে, 'আসবেন?' কিন্তু বলেই মনে-মনে পীড়িত হয়ে ওঠে।

নিমাই বলে, 'কৃতার্থবাবু ওরা তোমাকে অপমান করেছে, কিন্তু তার শোধ আমি নেব। আচ্ছা, যাই—'

নিমাই গাড়োয়ানকে বললে, 'শহরটার খানিক এদিক-ওদিক ঘোরো। ডবল ভাড়া পাবে।'

এবারে সিগারেট ধরায়।

সরলা ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে,—গাড়িটা যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার পর্যন্ত হুঁস নেই।

ভেতরের দাওয়ায় পা দিতেই বাড়িউলি খ্যা খ্যা করে উঠল, 'বলি, সরি এসেছিস ? তুই কেমনতরো মানুষ লো, ছুঁড়ি ! সারা দুপুর-সন্দে টো টো করে বেড়াবি, আর এখেনি যত রাজ্যের লোক এসে মুখ-খারাপ করে যাবে ?'

সরলা যেন গাড়ি থেকে এবারেই সত্যি নেমে আসে। ওর গতানুগতিক কদর্য বিরস জীবন ওর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ফুলশয্যার ওপর কে যেন এক বোতল মদ ঢেলে দেয়,—ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

বলে, 'কি হল বাড়িউলি-দিদি ?'

'কি হল ? সেই অটল ছোঁড়া বিকেলের দিকে এসেছিল কতকগুলো চেলা জুটিয়ে। তোকে ঘরে না-দেখে কি কেলেঙ্কারিটাই না করে গেল ! আমার থেকে তিন-চার পাঁইট করে দিশি-বিলিতী চেয়ে নিয়ে খেয়ে বমি করে গালাগালি দিয়ে জিনিসপত্র ছরকট করে লম্বা দিলে—একটি পয়সা দিয়ে গেল না। বললে সরি দেবে।'

সরলা ক্ষেপে ওঠে, 'হ্যাঁ, সরিই ত দেবে ! কেন ? সরি কি ওর জুতোর সুখতলা নাকি ? খালি-বোতলগুলো ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারলে না ? এবারে আসুক না, ঝাঁটাপেটা করে যদি না তাড়াই ত আমি বামুনের মেয়ে নই।'

বাড়িউলি বলে, 'বামুনের মেয়ে বলে আর দেমাক করিসনি ছুঁড়ি। কেন বাড়ি থাকবিনে শুনি ? বাঁধা লোকের টাকা আবার তার ওপরে চালবাজি ! কেন সে গালাগাল করবে না ?'

সরলা বলে, 'রেখে দাও, অমন লোক বাজারে কাণা-কড়িতে বিকোয়। ও রকম বাবু আমার চাইনে। আমি কালই এ-বাড়ি থেকে খসে পড়ব।'

'থেটার-ফেটারের কথা সব তার কানে উঠেছে। বলেছে,—থেটারে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর তোর মুণ্ডুটা আস্ত রাখবে না।'

'তার হয়ে তুমি লড়তে এসো না, বাড়িউলি-দিদি। আসুক সে, দেখি তার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা ! তার মুখে যদি নোড়াটা আমি না ঘষি ত কি বলেছি ! কত টাকার মদ খেয়েছে সে ? কত টাকা পেলে তুমি গলা থামাবে ?' বলে সরলা আঁচলের খুঁট থেকে নোটটা বাড়িউলির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

সব ঘর নোংরা, জিনিসপত্র এলোমেলো, কাচের জাগ গ্লাস ভাঙা, ট্রে-টা উল্টোনো ; কোথা থেকে একটা উৎকট গন্ধ আসছে। সরলা অন্ধকারে থমকে রইলো—দেশলাই জ্বালাবার পর্যন্ত যেন সামর্থ্য নেই।

বুকের মধ্যে সরলা যে গানের সুরটি নিয়ে এসেছিল, টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ও যেন আবার নরককুণ্ডে এসে পড়েছে, যেখানে সেই অটল আর সরলা ; যেখানে না আছে মালতী, না বা হিরণকুমার !

সরলা ঘর থেকে বেরিয়ে খালের পারে এসে দাঁড়ালো।

পরে কি ভেবে আবার ঘরে গেল, ল্যাম্প জ্বালালে—কোমরে কাপড় জড়িয়ে বালতি করে জল এনে ঘর সাফ করতে বসল।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নিমাইর মাথাটি কোলে নিয়ে যে-হাত দিয়ে ওর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে, সেই হাতে ঘৃণ্য অটলেয় বমি নিকোতে হচ্ছে ভেবে ওর চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগলো। ও সত্যিই আর এখানে থাকবে না, থিয়েটারে ভিড়ে যাবে—যে-থিয়েটারে হিরণকুমার আছে, সে-থিয়েটারে মৃত বন্ধুর উদ্দেশে কৃত্রিম শোক করতে গিয়ে সত্যি-সত্যিই কান্না পায়।

ভুতি ঘরে এল। বললে, 'আজ কি হল রে, সরলা?'

সরলা বললে, 'কত! কত বড়ো শক্ত পাট যে হাতে নিয়েছি, সে দেখবি গিয়ে। স্টেজে খুন করতে হবে - '

ভুতি ভয়ে আঁতকে ওঠে, সরলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বলিস কি লো?'

সরলা হেসে অভয় দিয়ে বলে, 'সত্যি সত্যিই কি আর খুন করব নাকি বোকা মেয়ে! পুলিশ নেই? খুন করতে যাব খাঁড়া উঁচিশে, এমনি করে—চেয়ে দ্যাখ, এমনি দাঁত খিঁচিয়ে—দ্যাখ ত ঠিকমতো হচ্ছে কি না—'

ভুতি অত-শত বোঝে না, বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে—তারপর কি হবে?'

রসবোধের চেয়ে ভুতির কৌতুহল বেশি।

'তার পর যেই খাঁড়া চালাতে যাব, দেখব হিরণকুমার আগেই বিষ খেয়ে ভবলীলা ঘুচিয়েছে। তারপরে অস্তর ফেলে দিয়ে তার মাথাটা কোলে নিয়ে কাঁদব।' বলতে-বলতে সরলার চোখে ব্যথার কুয়াসা ঘনিয়ে আসে।

সরলা ভুতিকে ফের অভয় দেয়, 'সেই হিরণকুমার সত্যিই বিষ খাবেনা রে পরে পর্দা পড়ে গেলে জেগে উঠবে। আমাকে খাবার খাইয়ে দিলে, গাড়ি করে বাড়ি পেঁছে দিলে,—ভারি সুন্দর ছেলেটি, ভাই। মনের মতো। দেখিস এখন।'

দোর-গোড়ায় কে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়ালো,—ঝি মাসির ছেলে, হরি।

হরি বললে, 'আমাকে আর মাকে সত্যি-সত্যি মাগনা থেটার দেখাবে সরলা-দি?'

সরলা হাসিমুখে বললে, 'দেখাবো। যাস তোরা।'

হরি খুশিতে উছলে পড়ে বললে, 'তোমাদের হয়ে গেলে দেখো আমরা একটা থেটার করব বাবুতলার মাঠে। কাগজ দিয়ে সব ভীমের গদা বানিয়েছি। বাঁশের ধনুক। সেদিন তোমাদের নিয়ে যাবো। দেখবে—

ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

ঐ সামান্য দু'টি মিষ্টি খেয়েই সরলার পেট ভরে আছে। ঝিকে বিদায় করে দিল।

পাড়াটা নিরিবিলি হয়ে এসেছে। সরলা দোর বন্ধ করে দিয়ে ওর ছোট আয়নাখানি বেড়ার গায়ে মাননসই করে লাগিয়ে ছুরির অভাবে চিরুনিটাই ছুরির মতো বাগিয়ে নিজের মনে শেষ দৃশ্যের মহড়া দেয়। আয়নায় সমস্ত মুখের ছায়া পড়ে না দূর থেকে, যেটুকু পড়ে তাতেই ও মুখের চেহারার আন্দাজ করে নিতে পারে। যতই ও ওর মুখ রুক্ষ কর্কশ বলদৃপ্ত করতে চায়, ততই ওর মুখের শীর্ণতা বীভৎসতর হয়ে উঠতে থাকে! গাম্ভীর্যের সঙ্গে হিংসার কাঠিন্য মেশাতে পারে না—

তাই দেখায় কুৎসিত, হাস্যকর।

কি করে যে মানিয়ে নেবে ভেবে উঠতে পারে না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে একটা ছেঁড়া বালিশ কোলে নিয়ে পার্টের বাকি অংশ-টুকুর মহড়া দেয়— বালিশকে ভাবে হিরণকুমার। তার জন্য রাত করে সরলা অনর্থক অশ্রুবর্ষণ করে।

এমন সুন্দর করে সরলার জীবনে ভোর হয়নি! ভোরবেলাটি ওর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন লাগছে।

ঘুম থেকে উঠে সরলা ভাবছে, কে যেন ওর কাছে আসবে আজ। নিমাইকে ত ও আসতে বলে দেয়নি। কিন্তু না বলে দিলে কি আসতে নেই? অটলকে তাড়িয়ে দিলেও ত সে আসে।

বেলা বেড়ে চলে কিন্তু সরলার ভারি খালি খালি লাগে। অদূরে রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলেই ওর বুক আশায় দুলে ওঠে। কিন্তু পরে ভাবে,—ওর কাছে আসবার এই একটিই ত সদর রাস্তা নয়,—শুধু গাড়িই ত তার বাহন নয়,—সে এসেছে তার ঘুমের মধ্যে, অজানতে ঘুম ভাঙার মধ্যে, মনের গোপন খিড়কির দুয়ার দিয়ে।

যে আসবে না, তার জন্যে এমনি অনর্থক প্রতীক্ষা করে থাকবার মধ্যে যে দুঃসহ সুখ আছে, সরলা কোনোদিন তা জানত না।

রোদ উঠতে-না-উঠতেই সরলা বেরিয়ে পড়লো।

নিমাইকে কাছে পেয়ে সরলা শুধোল, 'ভেবেছিলাম সকালবেলা আসবেন।'

নিমাই বললে, 'ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে-করতেই সব গরমিল হয়ে যায়। আজ থেকেই স্টেজ-রিহার্সেল শুরু হবে। তোমার প্রবেশ-প্রস্থানগুলি ঠিক করে নিতে হবে। মুখস্থ হয়েছে?'

সরলা বললে, 'একটু-একটু হয়েছে।'

ম্যানেজার বলেছিল পার্টটা তোকাকে লিখে দিতে,—আমার হাতের লেখা ত আর বুঝবে না ছাই, তাই আমার বইখানাই তুমি নাও।'

বলে নিমাই পকেট থেকে ছেঁড়া জালন্ধর-পতন বইখানি সরলার হাতে গুঁজে দিল।

নিমাই বললে, 'দেখো, আজ আরো ভালো হবে। তোমার হাতের আদর পাবার জন্য আমার কপালটা নিসপিস করছে। তোমার কান্না শুনলে আমার মন কেমন করে উঠে।'

সরলার ঠোঁট দুটি শুধু একটু কাঁপে।

স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে,—বেড়া ও টিন দিয়ে চারিদিকে ঘেরা, পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলো ফুটো করে উঁকি দিতে চায়, আর কে ওদের সব ভাগিয়ে দিতে থাকে। ঐখানে গানের আর নাচের মহড়া চলছে,—এ পারে য়্যাক্‌টিং—ঐখানে সিন পেন্টিং, সিন শিফটিং চলেছে।

সমস্ত বাড়িটা গৈ গৈ করছে, যেন একটা উৎসব !

সরলা সব ভুলে যায়—খালপারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটল বাবুর বীভৎস মুখ ! ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড়ো লাগে,—সমস্ত অবকাশ পুজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা কৃতদাসী নয়, ও সত্যিই রাজকুমারী ! ও ভালোবাসে, প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে,—ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা ! সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়—ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।

শুধু দু'টি দিনের জন্যেই। তা হোক্।

আজ ভোরে চমৎকারিণীর জ্বর ছেড়েছে। শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু অচল নয়,—গড়াতে-গড়াতে এসে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। অভিনয় সম্বন্ধে টিপ্পনীর তার আর শেষ নেই। কৃতার্থময় পেছনে দাঁড়িয়ে চমৎকারিণীর টিপ্পনীরই তারিফ করে।

রমেশ বলে, 'তুমিই আজ থেকে প্রম্প্ট্ করো হে, মধুসূদন। তোমারই ত কাজ।'

মধুসূদন বই হাতে করে।

আজকে একেবারে গোড়াগুড়ি থেকে। তৃতীয় অঙ্ক পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বাজে।

শুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। সরলা মাৎ করে দিল।

কিন্তু শেষ দৃশ্য আসতেই সরলার আর হয়ে ওঠে না। মারবার সময়ে এমন একটা ভাব হয়, যেন খুব শক্ত একটা দড়ির গেরো খুলছে মাত্র—খুন করতে আসছে না। মুখ কিছুতেই কুঞ্চিত কর্কশরেখাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে না। একটা বিশীর্ণ দৈন্য ফুটে ওঠে শুধু।

চমৎকারিণী মুখ টিপে-টিপে হাসে। কৃতার্থ তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সুর সপ্তম গ্রামে তুলে দেয়। বলে, 'হবে না, রমেশবাবু। লুডিক্রাস্ !'

রমেশ বলে 'হবে না বললেই ত হয় না। এ নিয়েই চালিয়ে দিতে হবে আপাতত।'

চমৎকারিণীর হাসি কিছুতেই থামে না। যেন মদের পিপের মুখ ছুটে গেছে, তার থেকে ফেনিল উচ্ছ্বাস উঠছে।

নিমাই একেবারে রুখে ওঠে; বলে, 'চোখের সামনে অমনি হাসলে কে পার্ট করতে পারে ? রইল আপনার থিয়েটার। চলে এসো, সরলা !'

সরলা আয়ত চোখ মেলে নিমাইর দিকে তাকায়। ওর অপমানের বেদনা স্নেহে সুশীতল হয়ে ওঠে।

রমেশ হাঁকে, 'নিমাই ! এ কি অন্যায় কথা তোর ! পরের সমালোচনা কি করে বন্ধ করবি ? এগিয়ে এসো সরলা, আবার চেষ্টা করো। অমন হাসাহাসি কোরো

না, চমৎ! আমাদের এ-ই চালিয়ে নিতে হবে। জ্বরে পড়েই ত তুমি সব বিতিকিচ্ছি করে দিলে।'

'বিতিকিচ্ছি?' নিমাই ফের প্রতিবাদ করে: 'সরলার সমস্ত শরীরে প্রেমের যে একটি সহজ লীলা ও পেলবতা আছে তা চমৎকারিণীর কোথায়? ওর স্বরে আপনি-থেকে একটি স্নেহের সুর আছে,—কেমন চমৎকার মানায় ওকে! চমৎকারিণীকে খুনের পার্টেই বেশি খোলে, কিন্তু সরলা যেন মূর্তিমতী সরলা। আপনার বই থেকে ঐ খুনের অংশটুকু কাটা-প্রুফের মতো বাদ দিন।'

রমেশ এ-সব কথা কানেই তোলে না। আবার পার্ট চলে। সরলা আবার ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

পরেরটুকু আর আসে না। নিমাই বলে, ও যেমনি হচ্ছে হোক, বাকিটুকুতে কেঁদে সরলা আগের সমস্ত ত্রুটি ধুয়ে নিয়ে যাবে। দেখেছেন, একদিনে কেমন মুখস্থ করে ফেলেছে? চমৎকারিণীর লেগেছিল পুরো একটি বছর '

চমৎকারিণী চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাকে এমনি ধারা অপমান করলে আমি আজই চললাম কলকাতায় ফিরে।'

কৃতার্থও চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুখ সামলে, নিমাই!'

ঝগড়ার সম্ভাবনাটা কাটিয়ে ওঠবার জন্য রিহার্সেলটা খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে।

রাত্রে সরলাকে গাড়ি করে এগিয়ে দিতে-দিতে নিমাই বললে, 'আমার যদি অনেকগুলি টাকা থাকত, তবে তোমাকে নিয়ে নতুন একটা থিয়েটার খুলতাম। তোমাকে কো-য়্যাক্‌ট্রেস পেয়ে সত্যিই আমার ভেতরে একটা আবেগ আসে,—কাউকে দিয়ে খুব মিষ্টি করে একটা প্রেমের গল্প লিখিয়ে নিতাম!'

সরলা হেসে বলে, 'আপনি নিজেই ত পারেন। পরকে খোশামোদের দরকার হয় না।'

একটুখানি মাত্র পথ—এক নিশ্বাসেই ফুরিয়ে যায়। সরলার ইচ্ছা করে নিমাইকে ঘরে নিয়ে যায়, নিজ হাতে রেঁধে ওকে কিছু খাওয়ায়, ফরসা চাদর বের করে ওর জন্য নিজ হাতে নতুন একটি বিছানা পেতে দেয়, ও ঘুমিয়ে পড়লে শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতো ওর চুলগুলিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে-দিতে দুটি-ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

সরলা মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে না।

ভাবে, এই বন্ধ গাড়ির মধ্যেই শুধু দু'টি মুহূর্তের জন্য ওর এই ছোট্ট ক্ষণিক সংসার—নিমাইর সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মালতী আর হিরণকুমার!

গাড়িটা থামলে সরলা নামে, নিমাই হঠাৎ ওর আলোয়ানটা সরলার গায়ে জড়িয়ে দেয়; বলে, 'তোমার শীত করবে না-হলে।'

সরলা আপত্তি করে না, আলোয়ানটি আরো নিবিড় করে জড়িয়ে পরিচিত ঘরে এসে ঢোকে। আজ আর কারু সঙ্গে কথা কয় না, ভূতির সঙ্গেও না। আলোয়ানটা

গায়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলার জীবনে আরেকটি পরিচ্ছন্ন রাত্রি কাটে, ঘুম থেকে জেগে পবিত্র প্রভাতকে মনে-মনে অভিবাদন করে।

শুক্রবার। কাল প্লে। আজ ড্রেস-রিহার্সেল।

পার্ট সরলার মুখস্থ হয়ে গেছে। ওর একাগ্র মনোযোগের দরুনই তা সম্ভব হল। ছুরি-মারার ভঙ্গীটিও এক-রকম চলনসই করে এনেছে।

ও এর মধ্যে নিজের ত্রুটির ব্যাখ্যা পর্যন্ত বের করে ফেলেছে ; বুঝিয়ে বলে, 'এই অবস্থায় মালতীর মুখে খুব একটা হিংস্রতা আসতেই পারে না, সেই হিংসা ও ক্রোধের সঙ্গে যে ওর একটি মমতা ও শোক মেশানো আছে—তাই তার মুখে কোমলতাটা স্বভাববিরুদ্ধ নয়।'

বলা বাহুল্য ভাষ্যকার স্বয়ং নিমাই।

সকালবেলা ছুটতে-ছুটতে হরি এসে হাজির, হাতে একখানা ছাপানো কাগজ। সরলার দোর-গোড়ায় এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'গাড়িতে করে কাগজ বিলি হচ্ছে, সরলা-দি। আমাকে কি দেয়? বললাম—আমার সরলা-দি থেটার করবে, তখন দিলে। গাড়ির ছাতে বসে সানাই বাজাচ্ছে, আর কত লোক যে গাড়ির সঙ্গে ছুটছে, সরলা-দি! রামু ত চাকার তলায়ই পড়ে গেছল আরেকটু হলে!'

গর্বে আনন্দে সরলার বুক দুলে ওঠে। এত বড়ো একটা আনন্দব্যাপারে ওর কিছু অংশ আছে ভেবে ও ধন্য হয়ে যায়।

ভুতি কৌতূহলী হয়ে কাছে আসে। সরলা হরির হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দেয়। মাঝখানে একটা ছবি আছে—তার অর্থ করে।

বলে, 'এই হিরণকুমার বিষ খেয়ে শুয়ে আছে, আর আমি এমনি ছুরি নিয়ে মারতে আসছি।'

সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে রোমহর্ষক বলে তারই ছবি ব্লক করে বিজ্ঞাপনে ছেপে দেওয়া হয়েছে।

ভুতি ও আর-সব মেয়েরা ঈর্ষায় জর্জর হয়ে সরলার পানে তাকায়। ভুতি বলে, 'কিন্তু এ ত তোর ছবি নয়—'

সরলা তা জানে। এ চমৎকারিণীর ছবি। যেন নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা ; হিরণকুমারকে ও কোনোদিন ভালোবেসেছিল তার কোনো প্রমাণই তাতে পাওয়া যায় না—যেন বরাবরই ও একটা শাঁকচুন্নি। আর শুয়ে আছে নিমাই—রুখু চুল, চোখের পাতা বোজা, একখানি হাত মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে।

সরলা হেসে জবাব দেয়, 'আমার ছবি কোথায় আর পাবে বলো। এমনি একটা এঁকে দিয়েছে। আমার অমনি মোটা হলেই হয়েছিল আর কি! পার্ট থেকে নাকচ করে দিত।'

কিন্তু নিজের মনকে এই বলে বোঝায় অনেক দিন আগে থেকেই এগুলি ছাপা বলে

মালতীর ভূমিকায় সরলার নামটা আর ছাপা হয়ে ওঠেনি।

সরলা বলে, 'আজ সব পোশাক পরে রিহার্সেল হবে, এখুনি যেতে হবে।'

হরি মিনতি করে বলে, 'আমাকে টুপ্ করে কোনোখান দিয়ে আজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে না, সরলা-দি? তোমাদের পোশাক-পরা নাটক দেখব।'

সরলা হেসে ওকে প্রবোধ দেয়, 'আজ কি, কালই ত দেখবি। খুব ভালো জায়গায় বসিয়ে দেব'খন। মাকে নিয়ে যাস্।'

হরির যেন তর সয় না; বলে, 'খুব ভালো জায়গা দেবে? বাঃ, কেয়া মজা! রামু ওরা ত জায়গাই পাবে না।'

হরি নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল।

সরলাকে এখুনিই বেরুতে হবে। ঘরে যেটুকু সময় থাকে—স্নান করা, একটু খাওয়া কি না খাওয়া—সব সময়েই অস্ফুটস্বরে পার্ট আওড়ায়। ও এই নিয়েই আছে। ওর তিনদিন আগেকার অতীত জীবনের সঙ্গে যেন ওর কোনোই সম্পর্ক নেই—তাকে ও চেনেই না।

ড্রেস-রিহার্সেল শুরু। সবুজ রঙের শাড়ি পরে জালন্ধর-রাজকুমারী শ্রীমতী মালতীমালা ওরফে সরলাসুন্দরী যেন সবুজ মেঘের পরীর মতো পাখা মেলে এই শহরের মাটিতে নেমে এসেছে।

সরলার দিকে চেয়ে কে বলবে ও সত্যিই একগাছি মালতীর মালা নয়!

পিঠে কালো পরচুল মাটি ছোঁয়-ছোঁয়, শাড়ি-পরার ভঙ্গিতে কি আশ্চর্য সুষমা! হাতে আভরণ! গলায় পুষ্পহার।

আর সম্মুখে হিরণকুমার,—রাজপুত্রের বেশে। মাথায় সোনার মুকুট তাতে পাখির পালক গোঁজা।

সমস্ত স্টেজ গমগম করে ওঠে,—ডে-লাইটের সুতীব্র আলোতে পরস্পরের চোখে একটি বিহ্বল মুগ্ধতা আবিষ্কার করে দুজনে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। অভিনয় শুনে সবাই তর হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে আবার তেমনি জোলো হয়ে আসে। কৃতার্থময় কিছুতেই সায় দেয় না, দুর্বল বলে উচ্চহাস্য থেকে বঞ্চিত হয়ে চমৎকারিণী একটা বীভৎস বটু আওয়াজ করে।

নিমাই বলে, 'আর-আরদের অভিনয়ের প্যাঁচে কত যে গলদ থাকে তার কেউ খোঁজ করে না, এ-বেচারির ছুরি-ধরা ঠিকমতো হয় না বলেই যত ঠাট্টা! আপনার ত ছাই সমঝদার, দেখবেন লোকে কি রকম নেয়!'

কৃতার্থ বলে, 'লোকে ত আর তোমার মতো গাড়োল নয়, তাদের রসবোধ বলে একটা জিনিস আছে।'

রমেশ মীমাংসার সুরে বলে, 'না না—এই আমাদের চালিয়ে নিতে হবে। বেশ হবে, সরলা। তুমি একটুও ঘাবড়িয়ো না।'

রিহার্সেলের শেষে সরলা দামী পোশাক ছেড়ে তার আটপৌরে শাড়িখানি পরলে।

সরলা যেন নিমাইর চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে!

নিমাই বললে, 'দেখবে কি রকম ভিড় হবে, হাততালিতে প্রত্যেকটি কথা ডুবে যাবে দেখো।'

সরলা মনে-মনে ছবি আঁকে,—বিপুল জনসমারোহের কূল-কিনারা করতে পারে না।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে সরলা কারুর দেখা পায় না। গাড়ি নিয়ে কেউই বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নেই। সরলা ভাবে, হয়ত গাড়ি আনতে গিয়ে দেরি হচ্ছে; একটু অপেক্ষা করে, কেউ আবার পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও পারে না। অন্ধকারে গা ছমছম করে। এ কেমনতরো লোক, একটুও ভাবনা নেই? সরলা বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ভাবে, দোরের বন্ধ তালাটা খুলতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

নিমাইর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, হয়ত তক্ষুনিই নিমাই গাড়ি নিয়ে এসে ঘুরে গেছে।

রাতের মতো রাত একটা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা! ওর চোখের সমুখে রাশীকৃত লোক—সবাই হাততালি দিচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের ওর পোশাকের দিকে চেয়ে আছে। অটল যদি যায়, সেও হাঁ হয়ে যাবে, চিনতেই পারবে না। কেউ দিস্তা খানেক নোট নিয়ে আসতে পারে, ও তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে—ও হিরণকুমারের বাসনাবাসিনী প্রিয়া! তার জন্যেই ও গেরুয়া পরবে।

শনিবার। দিনের মতো দিন! পাঁজিতে এ-দিনটি যেন সরলার জন্য রিজার্ভড্ ছিল।

চোখ-মুখ ধুয়েই নিমাইর র‍্যাপারটি গায়ে জড়িয়ে সরলা রওনা হল থেটার-বাড়ি।

যাবার সময় ভূতিকে বলে গেল, 'দুপুরে একবার এসে পাস দিয়ে যাব তোদের।'

সরলার সুখের আজ অন্ত নেই। ওর মধ্যে এত বড়ো শক্তি প্রসুপ্ত ছিল, এত বড়ো কাজের যোগ্যতা ছিল জানতে পেরে ও গর্বে একেবারে ফুলে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করার মতো অহংকার বোধকরি আর কিছু নেই। ও এ ক'দিন একটা মাতালেরো মুখ দেখেনি, ওর সমস্ত আচরণে একটি ভদ্রতা এসেছে—মনে একটি বিশ্রামের সঙ্গে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে! কত ভালো লাগছে ওর—জীবনের বৃহৎ বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়ে ও ধন্য হয়েছে।

সত্যিই, আজ ও মালতীমালার মতো সন্ন্যাসিনী হয়েও যেতে পারে।

সরলা এসে পেঁছুলো। সব ফিটফাট। সব সিজিল্-মিছিল্ হয়ে গেছে।

কিন্তু সবাই কেমন উদাসীন। সরলাকে দেখে কারু ঔৎসুক্য নেই। নিমাই কই?

রমেশবাবুকে বল্লে, 'আজ রিহার্সেল হবে না?'

রমেশ বললে, 'হ্যাঁ, দুপুরের পরে একবার হবে—কয়েকটি সিন।'

সরলা কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

রমেশ আর যাই হোক মুখচোরা নয়; বুঝিয়ে দেয়। বলে, 'তোমাকে আর

আমাদের প্লে-তে লাগবে না। চমৎকারিণী সেরে উঠেছে, সে-ই মালতীর পার্টে নামবে।'

সরলা বসে পড়লো। ওর তাসের ঘর দমকা হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে গেল।

রমেশ আরো খুলে বললে, 'মার্ডারের সিনটা তোমাকে দিয়ে কিছুতেই হল না,—কৃতার্থ ওরা কিছুতেই রাজি হয় না। তা ছাড়া চমৎকারিণী ভালো হয়ে এই পার্টটা এখানে আবার করবার জন্য ভারি ঝুঁকে পড়েছে। জানই ত, ও আমাদের দলের সেরা য়্যাক্‌ট্রেস। ওকে ত আর চটাতে পারি না।'

সরলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, ছেলেমানুষের মতো! এক মুহূর্তে ও যেন একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

রমেশ বৃথা প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, সরলা। বিকেলে তুমি এসো থিয়েটার দেখতে। তোমাকে আর কয়েকটা টাকা দেব'খন, থিয়েটারের পরে কিংবা কাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।'

রমেশ চলে গেল।

সরলা কোথায় গিয়ে যে ওর এই কান্না লুকোবে, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর কাছে পৃথিবী যেন আজ সমস্ত জায়গা খুইয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ এ-দিক ও-দিক নিমাইর খোঁজ করলে, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পোশাকের ঘরে এল, সেখানেও নিমাই নেই। মধুসূদন বাক্স থেকে পোশাক আর চুল খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছে। কাল রাত্রে সরলা ঐ সবুজ শাড়িটি পরেছিল, আর নিমাই ঐ মুকুটটা।

একজনকে জিজ্ঞেস করলে, 'নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারেন?'

লোকটা কি কাজে ব্যস্ত ছিল; বললে, 'জানি না।'

চট্ করে একটা কথা সরলার মনে পড়ে গেল,—বোধ হয় নিমাই পালিয়েছে। নিমাই ওকে বলেছিল, যদি সরলাকে শেষ পর্যন্ত না নামায়, তবে ও বেঁকে বসবে, পালিয়ে যাবে, পারের কাছে নৌকো এনে ডুবিয়ে মারবে!

ঠিক তাই। সরলাকে নামাবে না জেনে অভিমানে বেদনায় নিমাই বিবাগী হয়েছে।

সরলার মনে বল এল,—ধর্মের জয় আছেই। এই প্রবঞ্চকদের সমুচিত শাস্তি দরকার! বেশ হবে। নিমাই না থাকলে থিয়েটারই হতে পাবে না, হিরণকুমারের পার্টে আর কেউ তৈরি নেই।

নিমাইর প্রতি শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় সরলার মন ভরে ওঠে।

সরলা বিমর্ষ মুখে থিয়েটার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাবলা গাছটার তলায় বসে ও চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে নি। জীবনে ও ঢের কেঁদেছে, এর চেয়ে ঢের বড়ো বেদনায়; কিন্তু আজকের মতো নিজেকে কোনোদিন এমন ব্যর্থ মনে করেনি। ওর চোখের থেকে দিনের আলো যেন কে শুষে নিয়েছে।

কিন্তু নিমাইকে আজ ওর চাই—একান্ত করে চাই। এ সংসারে ও-ই সরলার

একমাত্র বন্ধু, খালি ওকেই সরলার অপমান স্পর্শ করেছে। নিমাইকে আজ সরলা তার ছোট ঘরটিতে নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নাগালের থেকে আড়াল করে রাখবে।

নিমাইকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে! বাজার, গাড়ির আড্ডা, অলি-গলি কোথাও নিমাই নেই। নিমাই নেই। নিমাই দেশ ছাড়া হয়নি ত?

হঠাৎ মনে হল, নিমাই হয়ত ওরই বাড়ি গিয়ে বসে আছে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য। সরলার সমস্ত শরীর আনন্দে শিউরে উঠল।

সরলা তখুনি বাড়ি গেল। রোদ তখন বেশ চড়া হয়েছে। সরলার ঘরে কেউ আসেনি, কেউ ওর খোঁজও করেনি।

বাড়িউলি ঠাট্টা করে 'আজ যে লোকের ওপর ভারি দরদ—'

ভুতি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সরলার চেহরা দেখে থমকে যায়। বলে, 'তোর কী হয়েছে, সরলা? কাঁদছিস কেন?'

সরলা বলে, 'এই মাত্র পার্ট করে আসছি। আমার যে কাঁদবারই পার্ট।'

মুখে ঠুনকো হাসি ফুটোবার চেষ্টা করে বলে, 'সেই তখন থেকেই কাঁদছি। নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাব,—তাই বড়ো শক্ত রে; হ্যাঁ রে ভুতি, আমার কাছে কেউ আসেনি,—ঢ্যাঙাপানা ফরসাপানা একটি ছেলে, গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি? আসেনি? কেউ না?'

সরলা ভগ্নোৎসাহ হয়ে বলে, 'তবে যাই ফের থেটার-বাড়ি। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তার সঙ্গেই আমার পার্ট। তাকে কোথাও না দেখে সবাই ভারি ভড়কে গেছে। কোথায় গেল!'

বলে সরলা ফের বেরিয়ে পড়ল থিয়েটার-বাড়ির দিকে।

ভুতি বললে, 'আমাদের পাস কই সরলা?'

সরলা বলতে-বলতে গেল, 'দরজায় গিয়ে আমার নাম করলেই ছেড়ে দেবে,—ভাবিসনে।'

সেখানে গিয়ে ফের নিমাইর খোঁজ নিলে,—কেউ কিছু জানে না। কিন্তু কারু মুখে লেশমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। স্বয়ং রমেশবাবুও হাসিমুখে গল্পগুজব করতে-করতে তদারক করে বেড়াচ্ছে,—সরলার দিকে চেয়েও দেখছে না।

ঠিক উচিত প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হিরণকুমার মালতীর অপমান সইতে পারেনি, তার দণ্ড দিয়ে গেছে।

একজন বললে, নিমাই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়িতে-বাড়িতে উঁচু ক্লাসের টিকিট বেচতে গেছে।'

টিকিট বেচতে গেছে? অসম্ভব!

অসম্ভবই বা কেন? হয়ত এই অন্যায় পরিবর্তনের খবর এখনো নিমাইর কানে ওঠেনি। তাই সরলার অভিনয় সবাইকে দেখাবার জন্য টিকিট বেচতে নিমাইর এত আগ্রহ! নইলে নিজে গা করে টিকিট বেচবার মতো ছেলেই নয় সে।

সরলা যেন নিমাইর মনের সমস্ত গলি-ঘুঁজি চিনে ফেলেছে।

চলল ফের শহরের দিকে। যদি রাস্তায় দেখা হয়।

ক্ষুধায় শরীর টা টা করছে,—সরলার হুঁস নেই। ও এই অবিচারের প্রতিবিধান চায়—যে তার প্রেমিক, যে তার সর্বস্ব—তার কাছে।

কোথাও নিমাইর দেখা নেই। যদি গেলই, সরলাকে কেন সঙ্গে নিয়ে গেল না?

সন্ধ্যা হতে-না হতেই হরি আর তার মা সরলাদের বাড়ি এসেছে।

হরি বললে, 'আমাদের জন্য পাস রেখে গেছে, ভূতি-দি?'

হরি নতুন জামা-কাপড় পরে এসেছে, হাতে একটা খেলনা রিস্ট-ওয়াচ্ বাঁধা, মাথায় দিব্যি টেড়ি বাগানো। হরির মা-ও কাপড় কেচে শুকিয়ে পরে এসেছে।

ভূতি বললে, 'পাস রেখে যায়নি। বলেছে, টিকিট নিতে দরজায় যে থাকবে তাকে সরলার নাম করলেই বসবার জায়গা করে দেবে।'

হরি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তবে আগে-ভাগে চলো ভূতি-দি, জায়গা পাওয়া যাবে না। বেজায় ভিড় হয়ে যাবে। আর কাপড় বাছতে হবে না, একখানা এমনি পরে চলো।'

ভূতি ধমক দিয়ে উঠল, 'এখনো আরম্ভ হতে দু' ঘণ্টা বাকি—'

ভূতিও তার সাধ্যমতো সেজে নিল। তিন জনে বেরিয়ে পড়ল,—হরি আগে-আগে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাত দুলিয়ে-দুলিয়ে। পথঘাট ওর নখদর্পণে।

দারুণ সোর-গোল, লোকে গিসগিস করছে। বগলাবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক রূপেও সফল হয়নি। হরি বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ভূতি-দি। জায়গা পেলে হয়। মেয়েমানুষগুলো চলতেই পারে না, কাপড় পরতেই তিন ঘণ্টা!'

থিয়েটার আরম্ভ হতে এখনো কিছু দেরি আছে। হরি দরজার সামনের লোকটিকে গিয়ে গম্ভীরভাবে বেমালুম বললে, 'সরলা-দিকে ডেকে দাও ত?'

লোকটি বললে, 'কে সরলা-দি?'

হরি অবাক হবার ভান করে বললে, 'কে সরলা-দি? বাঃ,—তুমি নতুন লোক বুঝি? সরলা-দি, যে য়্যাক্টো করছে, কাগজে-কাগজে যার ছবি উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সেই-যে একটা মরা মানুষ খুন করতে ছুরি নিয়ে ছুটেছে—সেই সরলা-দি!'

ভূতি বুঝিয়ে বলে, 'এই নাটকে মালতীর পার্ট নিয়ে যে নামবে আজ।'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'সরলা-ফরলা বলে এখানে কেউ নেই। মালতীর পার্টে যে নামছে তার নাম চমৎকারিণী দাসী। সরলা আবার কে?'

'বাঃ, আমাদের বলেছে গেটে এসে তার নাম বললেই আমাদের ছেড়ে দেবে, ভেতরে জায়গা করে দেবে,—তার নাম সবাইর মুখে-মুখে!'

লোকটি বললে, 'তোমাদের সরলা-দিটি ভারি সৌখিন দেখছি। যাও, জায়গা ছাড়ো, অন্য লোকদের পথ করে দাও।'

হরি বিমর্ষ হয়ে বললে, 'ঢুকতে দেবে না? দেখো না ভেতরে গিয়ে, সরলা-দি বসে আছে, হয়ত সাজছে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, ভদ্রলোক, আমাদের ছেড়ে দাও।'

ভদ্রলোক কথা গ্রাহ্য করে না।

ও দিকে ঘণ্টা পড়ে, সিন ওঠে য়্যাক্‌টিং শুরু হয়।

হরি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে। হরির মা বলে, 'কি দারুণ মিথ্যুক এই ছুঁছো হারামজাদি,—কি ভীষণ চালবাজ! এ যে জাঁহাবাজ ডাকাত বাবা,—একে পুলিশে দিতে হয়।'

ভূতি দুম দুম করে পা ফেলতে-ফেলতে বলে, 'ফিরুক ও বাড়ি। ওর দেমাক আমি ভাঙাছ অটলবাবুকে দিয়ে।'

হরি কিছুতেই আসবে না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে ও কি দেখছে ও-ই জানে। মা যত টানে ও ততই বেড়া আঁকড়ে থাকে। শেষে মার হাতের চার-পাঁচটা কিল খেয়ে হরি হেরে যায়। হরির চীৎকারে বাইরের অন্ধকার বিদীর্ণ হতে থাকে।

সরলা আরেক প্রতিবেশিনীর ঘরে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, যখন ঘুম ভাঙে তখন থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় কাবার হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখনো নিমাই ফেরেনি,—রমেশবাবুর উদ্বেগ অশান্তির আর সীমা নেই চমৎকারিণী খুব জব্দ হয়েছে। কৃতার্থের ফুটুনি ঘুচেছে। খুব মজা! নিশ্চয়ই থিয়েটার আর হয়নি, লোকেরা খুব গালাগাল করছে, রমেশবাবুকে বাধ্য হয়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

মজা দেখতেই হয়ত সরলা ও-দিকে পা চালালো। কিন্তু একটু কাছে আসতেই ওর সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ভারি শীত করতে লাগল, এত শীতেও পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে এল। দূরে ডে-লাইট দেখা যাচ্ছে। থিয়েটার হচ্ছে বৈকি!

সরলা গেল এগিয়ে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ছুটে গিয়ে দরজার লোকটিকে বললে, 'নিমাইবাবু এসেছেন?'

'সে কখন—'

'তাঁকে একটু ডেকে দিতে পারেন?'

'বাঃ, এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে। উনি য়্যাক্ট করছেন যে—'

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। সরলার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল! সমস্ত দৃশ্যটি সরলার মুখস্থ। সেই সব কথাগুলি নিমাইকে আবার চমৎকারিণী বলছে—সরলা যা বলেছিল আগে! কণ্ঠস্বরে সেই আবেগ, স্পর্শে সেই উত্তাপ! তার মনের কথাগুলি যা বইরের আখরে সরলার অজানতে প্রকাশ পেয়েছিল, তা চমৎকারিণীর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে!

তবু নিমাই বলেছিল,—তোমাকে পেয়ে সরলা, আমার মনে ভাবের জোয়ার আসে; তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারব।

ঈর্ষায় অভিমানে কেঁদে সরলা ধুলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

কানে কিছুই আসে না বটে, কিন্তু সরলা চোখের সামনে সমস্ত হাব-ভাব আঁকা দেখতে পায়। সেই মোটা বেঁটে চমৎকারিণী তার মৃত নিমাইকে কোলে নিয়ে আদর

করবে ভেবে সরলা নিজে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়, কপালে করাঘাত করে।

ইচ্ছা করে একটা ক্ষুধিত আর্তনাদের মতো স্টেজের ওপর গিয়ে ফেটে পড়ে। বিকট চীৎকার করে অভিনয়ের সমস্ত লজ্জা ঢেকে দেয়।

ক্ষুধায় সমস্ত গা অবশ,—নিমাইর খোঁজে হেঁটে-হেঁটে পা একেবারে ভেঙে পড়তে চাইছে।

আস্তে-আস্তে থিয়েটার ভেঙে যায়। কোলাহল করতে-করতে লোক সরে পড়তে থাকে। ততক্ষণ সরলা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সবাই চমৎকারিণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রত্যেকটি কথা সরলার কানে আসে।

'খুনের সিনটা কি রকম করলে! ওয়াণ্ডারফুল!'

'কি সুন্দর! অথচ কি ভীষণ! ভয় লাগে, ভালোও লাগে। পয়সা সার্থক, ভাই।'

সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চলতে আর পারে না, কেঁদে কেঁদে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

নিঃঝুম পাড়া, সবাই ঘুমিয়েছে। ভূতিও হয়ত। সদর খোলা ছিল।

ওর ঘরে এসে দেখে মিটমিট আলো জ্বলছে। ভেতরে অটল একা বসে মদ খাচ্ছে। সরলার সমস্ত শরীর কালিয়ে এল।

অটল তখনো বেহুঁস হয়ে পড়েনি, সরলাকে দেখেই ওর রক্ত ফুটে উঠল। হাতের মুঠিতে ধরা ছিল মদের গ্লাসটা, তাই মারল ছুঁড়ে সরলার মাথা লক্ষ্য করে।

বললে, 'শালির আমার থেটার করা হচ্ছে! তিন দিন ধরে ঘুরে-ঘুরে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি—'

সরলা 'বাবা গো' বলে ঘুরে পড়লো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে।

এতেও অটলের তৃপ্তি হয় না, জুতোটা দিয়ে সরলার পিঠের খাল ছিঁড়ে দেয় বলে, 'বলে কিনা থেটারের দলে ভিড়ে যাব,…মদের দাম দেবে না, রাত্তির বেলা বাড়ি আসার নাম নেই…'

বলে আর লাথি-জুতো চলতে থাকে।

সরলা অটলের পায়ের নিচে পড়ে একেবারে ভেঙে গেছে। বাড়িউলি প্রথম মনে-মনে মজা দেখে, পরে অটলকে থামাতে আসে। ভূতিই মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দেয়।

ভোরবেলা সরলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে,—যেন সারা বছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছের জানলা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে—মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা!

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে

প্রেমেন্দ্র মিত্র



ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভরসন্ধেয় দরজা বন্ধ কেন লা, বেগুন ? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব !'

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হ'লেও সিল্কের শাড়ীটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পে'ীচেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা করতে গেছল, কিন্তু তারপর বাড়িউলীর গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।' তারপর আবার সে সেলাইএ মন দিলে।

তার হারান-যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছে'ড়া জুতোর নতুন ফিতার মতো একেবারে বেখাপ্পা !

বাড়িউলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতি কষ্টে একপায়ের ওপর ভর দিয়ে বে'কে আর একপা তুলে উ'চু চোকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'সে ছোঁড়া ত আজও এল না রে, বেগুন—সে এবার ভেগেছে।'

বেগুন কোনো কথা না বলে নীরবে শাড়ীটা সেলাই করতে লাগল।

বাড়িউলী তক্তপোষ কাঁপিয়ে বসে বললে, 'বলছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রী করে ফেল্ ; শশীর বাবু ত শশীকে এক জোড়া কিনে দেবে বলছে, আমি বন্দোবস্ত করে তোর তাগা জোড়াই গছিয়ে দেব'খন।'

শাড়ীটা সেলাই শেষ করে সেটা সন্তর্পণে পাট করতে করতে বেগুন বললে, 'আমি তাগা বিক্রী করব না তোমায় কতবার বলেছি, তবু তুমি বিরক্ত করতে আস কেন বলো ত মাসী—? এখন যাও বাপু, আমার কাজ আছে।'

অতিরিক্ত ক্রোধেও মাসীর স্থূলদেহ স্থূলতর হবার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বর কিন্তু সপ্তমে উঠল—

'কেন যাব লা, কেন? দে আমার দু'মাসের ভাড়া দে, গাণ্ডে পিণ্ডে যে দু'মাস গিলেছিস সেই খোরাকি দে। আমি তোর কাছে ভিখিরী হয়ে এসেছি? আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরো আমার বাড়ি থেকে, কালই আমি খেঁদিকে এনে বসাব। ঘাটের মড়া! দু-দু'মাসে একটি মিনসে ওর চৌকাঠ মাড়াল না, ওর আবার রোখ্! কিছু বলি না বলে; ভালোমানুষীর কালই নেই, ভালো কথা বলতে এলুম না আমি বিরক্ত করতে এলুম! তাগা বেচবি না ত ক'দিন তোকে অমনি-অমনি পুষ্ব রে মড়া?

দম ফুরিয়ে গেছল বলেই বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবার চুপ করে মাসী হাঁপাতে লাগল।

মাসীর কণ্ঠস্বরে বাড়িময় সাড়া পড়ে গিয়েছিল, দরজার কাছে যে কয়েকজন এসে জমেছিল তার মধ্যে শশীই সব চেয়ে মাসীর আদরের—মাসী তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। তার দেহে যৌবনের কমনীয়তা হয়ত ছিল না কিন্তু বাঁধুনী ছিল, উগ্রতাও ছিল। তার রোজগার বেশী ছিল বলে সে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার হিংসার ঈর্ষার ও মাসীর স্নেহের পাত্রী। একটা সোনার চিরুনি হাতে ঘরের ভেতর ঢুকে সে ন্যাকামি ভরা আদুরে নাকীসুরে বললে, 'ও—মাসী, তুই এখানে কোঁদল কচ্ছিস আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে সারা! তুই চিরুনিটা ভালো করে গুঁজে দিবিনে ত—বেশ আমার খোঁপা খুলে যাক!'

শশী আবার ঠোঁট উল্টে মুখ ঘুরিয়ে দরজার কাছে ফিরে গেল।

মাসী তখনও ভালো করে দম ফিরে পায়নি, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রোধ-কর্কশ গলাটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললে, 'আয় না লো দিই, রাগ করিস কেন?

মাসীর পাওনা সত্যি সত্যি বাকী থাকলেও অন্যদিন হলে বেগুন মাসীর মুখনাড়ার প্রতিশোধ দিতে কিছুতেই পেছ্পা হ'ত না। কিন্তু আজ সে চুপ করেই রইল। বুকের পুরোন ব্যথাটা আজ আবার বেড়ে উঠেছিল। প্রত্যুত্তর দেবার লোভ সামলান শক্ত হ'লেও চেঁচামেচির পরিণাম শরীরের পক্ষে কখনই ভালো হবে না, হয়ত তার ফলে এই দুঃসময়ে ক'দিন অকর্মণ্য হয়ে শয্যাগত থাকতে হবে জেনে সে অতিকষ্টে সংযত হয়ে রইল।

শশীর পায়ে জুতো লক্ষ্য করে মাসী বললে, 'ও আবার কি ঢং লা, মেমসায়েব হলি নাকি!'

শশী আগেকার মতনই কচি খুকির গলা নকল করবার চেষ্টায় নাকীসুরে উত্তর দিলে, 'বা! আজ যে একজিবিশনে যাচ্ছি, জানিস্ না বুঝি?'

'সে আবার কি?'

'ওমা, একজিবিশন্ লো একজিবিশন্ ; সায়েবদের মেলা, জানিস না ?'
'তা আমায় নে যাবি নে ?'
শশী মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তুই যে ধুমসি, তোকে আবার নে যাবে ! নড়তে পারিস না, থপ্ থপ্ করে চলিস, তোকে নে' গে' মুস্কিলে পড়ি আর কি ?'
এ কথা শশী ছাড়া প্রায় আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য করত না, কিন্তু শশীর এখন রাজপাট ; সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম করে মাসী বললে, 'বেশ আমি না হয় ধুমসি, তুই না হয় রূপসী, তা বলে তোর মাসী ত, তুই পারিস বলেই সাধছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি ?'
মনস্তত্ত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী বলায় ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশি হয়ে শশী বললে, 'আচ্ছা, চ' দেখি, বাবু গাড়ি আনতে গেছে।'
ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেগুন ইতিমধ্যে নীরবে টীনের ভাঙা পেঁটরা থেকে কাপড়-চোপড় বার করায় মন দিয়েছে।
'সায়েবদের মেলায় যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'খোরাকি আর ভাড়া না পেলে বাছা, বলে যাচ্ছি কাল থেকে আমার বাড়িতে আর তোমার জায়গা হবে না।
'আচ্ছা, আজই ভাড়া দেব।' বলে বেগুন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি সাজপোশাক করতে মন দিলে। আজকের এই একজিবিশনই তার একমাত্র আশা। সত্যই দু'মাস তার ঘরে কেউ আসে নি, দু'মাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেলটুকুও আজ ক্ষ্যান্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে না বলে নিয়ে এসেছে! মাসী যে পয়সা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখবে না একথা সে ভালো রকমই জানে। আজ কোনো রকমে শিকার হাতড়ান চাই-ই। তাই মান্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়ীটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মতো খাওয়া বন্ধ জানলেও এখন জলখাবারের জন্যে অপব্যয় করবার তার একটা পয়সাও নেই। তার শেষ পয়সা ক'টি টিকিট কেনবার জন্যে রাখতেই হবে। প্রদীপের স্তিমিত আলোর সামনে সে চুলটা বাঁধতে গেল।
ডানদিকে কপালের ওপরেই চুল অত্যন্ত পাতলা হয়ে টাক পড়বার মতো হয়েছে, সেখানটা যথাসাধ্য অন্যদিকের চুল টেনে ঢেকে সে খোঁপা বাঁধলে। একটি মাত্র ভালো সেমিজ ছিল তা ধোপা বহুদিন থেকে পয়সা না পেয়ে আর ফেরৎ দিয়ে যায় না—সুতরাং পুরোন আধ-ময়লা সেমিজটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। পাউডারের কৌটো বহুদিন খালি! কেরোসিনের ডিবের আলোয় খড়ির গুঁড়ো ধরা পড়ে না কিন্তু একজিবিশনের উজ্জ্বল আলোতে খড়ির গুঁড়ো মেখে যেতে তার সাহস হল না। দুই চোখের কালিভরা কোটর, লুকোবার কোনো উপায় নেই। তাদের ব্যবসায়ে ভালো সাজপোশাকের মূল্য যে কত, তা সে বেশ জানে, বিশেষতঃ এই যৌবনের পারে এসে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাতে হ'লে সাজপোশাকের অন্তরালে আসন্ন-বার্ধক্যের কুশ্রীতা গোপন না করলে যে চলতেই পারে না। কিন্তু বেশভূষা দূরের কথা,

কিছুদিন ধরে দু'বেলায় উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থান করাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে। যে তাগা জোড়া বিক্রী করবার পরামর্শ দিতে এসে মাসী এইমাত্র ঝগড়া করে গেছে, সেই তাগা-জোড়াটা বার করে নিয়ে সে পরলে। কেন সে তাগা বিক্রী করতে চায় না, তা যদি মাসী জানত! তার শেষ অলঙ্কার যে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে গেছে, একথা জানিয়ে, তার তাগা-জোড়া এবং সমস্ত গহনাই যে গিল্টি এই সংবাদ দিয়ে, সে আর বাড়ির সবার কাছে ছোট হ'তে চায় না।

শেষকালে কিন্তু শশীর কথা মনে করে সে তাগা-জোড়া খুলে রাখলে। বহুদিন আগে তার এক শৌখীন সাহেবী-ঘেঁষা প্রণয়ী জুটেছিল। সে তাকে জুতো পরিয়ে বিবি সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তারি দেওয়া এক জোড়া হিল্-তোলা জুতো বহুদিন পেঁটরার এক কোণে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল। আজ সেটিকে বার ক'রে, ভালো করে পরিষ্কার করে অনেক দিন বাদে পায়ে দিলে। জুতোর সঙ্গে তাগা মানাবে না ভেবে, সে তাগা-জোড়া খুলে রেখেছিল।

সাজগোজ সমাপ্ত করে যখন সে পথে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হবে। অনেকদিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে চলতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত নয় বলে তার চলন নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না।

চৌরঙ্গীর চৌমাথা পার হবার সময়, দুজন লোক তার সম্বন্ধে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করে হেসে উঠল। তার আকর্ষণী শক্তি একেবারে লোপ পায় নি মনে করে বেগুন একটু খুশিই হ'ল।

টিকিট-বিক্রেতা মনস্তত্ত্ববিদ্ নয়; তাদের সে অবসরও নেই, নইলে সেদিন দক্ষিণ তোরণের টিকিট-ঘরের কাউণ্টারে টিকিট নেবার সময় একটি শিরওঠা কঠিন সৌষ্ঠবহীন হাতের কাঁপুনিতে তারা অনেক কিছু দেখতে পেত। এটি বেগুনের শেষ আধুলি।

আলোকের উন্মত্ত উৎসব! অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলের সঙ্গে দূরের ব্যাণ্ডের অপরিস্ফুট সুরধারার মাধুর্য ও সমস্ত আনন্দ-সমারোহের ওপর অতল গভীর আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্র-খচিত রহস্যাবরণ,—সমস্তই বেগুনের কুটিল পথক্লান্ত জীবনের,—নিত্য অবহেলার মরুচেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত নির্জন পথটা দিয়ে সে এগিয়ে চলল। দুর্বল শরীরে এতখানি হেঁটে এসে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। বুকের ভেতর পুরোন বেদনাটা তাকে পরিহাস করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে চিড়িক দিয়ে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই অল্প অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি দেখে কিছুটা জিরিয়ে নেবার জন্যে সে বসে পড়ল। এ পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কম। সামনেই একটা বৈদ্যুতিক বাতির পোস্ট, কিন্তু তাতে আলো ছিল না। বেগুন কতকটা নিজের অজ্ঞাতে ও কতকটা সজ্ঞানে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে যেন শক্তি সংগ্রহ করছিল। কিছুক্ষণ অবসন্নভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ পাশে চোখ পড়াতে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল। তার অলক্ষ্যে কে একজন বেঞ্চির অন্য পাশে এসে

বসেছে! অন্ধকারে তার মুখ ও বেশভূষা ভালো করে দেখা না গেলেও, সে যে পুরুষ এবং বলিষ্ঠ পুরুষ তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বেগুন সজাগ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ভালো ক'রে বসল। ডান পায়ের জুতো মাটিতে ঠুকে বারকয়েক শব্দ করলে এবং মাথার কাপড় ফেলে হঠাৎ খোঁপার কি ত্রুটি শোধরাতে বিশেষ করে মন দিলে।

সামনের বাতিটা কোনো কারণে নিশ্চয় খারাপ হয়েছিল। একজন মিস্ত্রী সেটা জ্বালাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাতিটা পলকের জন্যে জ্বলেই নিভে গেল। ঐ পলকটিতে লোকটাকে দেখে নেবার সুযোগ কিন্তু বেগুনের হয়নি। যাই হোক লোকটা তাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সেও এবার তার দিকে একটু পাশ ফিরে একটা পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বসল। মাথার খোঁপার কাল্পনিক ত্রুটি শুধরে বেগুনে বেশ একটু জোরেই হাতটা নামালে। হাতের গিল্টির চুড়িগুলি বেজে উঠল—রিন্‌ঠিন্‌ রিনিঠিন্‌।

অন্ধকার হ'লেও বোঝা গেল লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে ; কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও তার দিক থেকে অগ্রসর হবার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না। বেগুন একটু অধীর হয়ে উঠল! তবে কি লোকটা এখনো বোঝেনি, না কোনো গোবেচারী গোছের চাষাভূষো হবে?

আলোটা জ্বলে না কেন? কিন্তু এই বেশভূষা নিয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই যে তার পক্ষে সুবিধার একথা সে জানত। কিরকম লোক না জেনে আরো অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় লোকটা একবার কাশলে। বেগুনও একবার কাশলে। লোকটা আবার কাশলে!

বেগুনের বুকটা আশায় দুলে উঠল! এ যে জোর করে নকল কাশবার চেষ্টা, তা বোঝা আর কঠিন নয়। আঁচল থেকে ধীরে চাবিটা খুলে বেগুন পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তারপর খানিক খোঁজবার ভান করে লোকটার দিকে ফিরে বললে, 'আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার চাবিটা একটু খুঁজে দেখব—'

লোকটা চমকে উঠল। সত্যি সে কণ্ঠস্বর চমকাবার মত। এই কণ্ঠস্বরটিতে এখনও কৈশোরের অপরূপ কোমলতা ও যৌবনের অসীম মাধুর্য ও স্নিগ্ধ মাদকতা অটুট হয়ে ছিল। আর সে স্বরে ছিল—নিখিলের সুষমাময় নারীত্বের প্রচ্ছন্ন বিস্ময়ের আভাষ!

এই পতিতার জীর্ণ জীবনের জঞ্জালে এই সদ্য-স্ফুট শেফালির মতো সৌরভ-শুচি কণ্ঠস্বর কেমন করে থাকতে পারে এইটেই আশ্চর্য! লোকটা চমকে উঠেছিল কারণ সে এতটা আশা করেনি।

নীরবে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে বেগুনের প্রসারিত হাতে সে গুঁজে দিল।

বেগুন নীচু হয়ে দেশলাই জেলে চাবি খোঁজবার ছল করবার মধ্যেই টের পেলে লোকটা আর একটু সরে বসেছে।

সামনে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা আর একবার জ্বলে উঠল কিন্তু বেগুন মুখ তুলে

লোকটাকে দেখবার আগেই আবার নিভে গেল। বেগুন মনে মনে বাতির ও বাতি-ওয়ালার সপ্তম পুরুষ উদ্ধার ক'রে আবার আর একটা দেশলাই জ্বাললে। বাতিটা যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে তামাসা করছিল। এবার আর চাবি খুঁজে পেতে দেরী হ'ল না। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার ছলে বেগুন লোকটার হাতে একটা আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করলে, তারপর আর একটু ঘেঁষে বসল। বললে, 'ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন, নইলে এই অন্ধকারে চাবি খোঁজা কি সোজা!—'

লোকটা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু অন্ধকারে একটা হাত বেগুনের কোমরে এসে ঠেকল! বেগুন সে হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় খপ করে ধরে ফেলে একটু চাপ দিলে। অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ করে বেগুন অনুভব করছিল, হাতটা অত্যন্ত লোমশ ও চামড়া অত্যন্ত কর্কশ—লোকটা দেখতে খুব সুশ্রী বোধ হয় হবে না—তা না হোক্।

বারকয়েক মিট্ মিট্ করে সামনে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার উপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাতি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে, আর বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝল্‌সে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

লোকটা বেগুনের এই আতঙ্কে একটুও হতভম্ব হয়নি এমন নয়, কিন্তু সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। বেগুন তার দিকে আর না চেয়ে এগিয়ে চলল। অনেক সময় ও অনেক কলাকৌশল তার বৃথা নষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু তা বলে ঐ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করতে পারে না! এর চেয়ে ভালো শিকার সে নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে।

অনেক দিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে অতখানি হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। একটানা চলার সময় তার বেদনা বিশেষ কিছু অনুভব না করলেও অনেকক্ষণ জিরোবার পর এখন হাঁটা একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এখন জুতো খুলে ফেলাও অসম্ভব, খুঁড়িয়ে হাঁটলেও হাস্যাস্পদ হ'তে হয় সুতরাং যন্ত্রণা গোপন করে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। তাকে হাঁটতেই হবে যে। কিছু দূর গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা তখনও তার দিকে চেয়ে সেই বেঞ্চিতেই বসে ছিল।

নির্মম জুতোর নিঃশব্দ পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠলেও সে অনেকক্ষণ নানাদিকে ঘুরে বেড়াল। মেলার মজা ও আমোদ লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকার অনুসন্ধান করাতেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে ছিল। যত সময় যাচ্ছিল তার আশঙ্কা ও অস্থিরতা তত বেড়ে উঠছিল। এ পর্যন্ত কোনো সুবিধা সে করতে পারেনি। কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে ও কয়েকজনকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে আকর্ষণ করবার

চেষ্টা করে কোনো ফল হয়নি।

শাখায় শাখায় লালবাতি-দেওয়া ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় বেশী ভিড় জমে ছিল। সেটা জুয়ার আস্তানা। লোহার আলের ওপর ঘুরে ঘুরে একটা ছ'কোণা কাষ্ঠখণ্ড খেলোয়াড়দের ভাগ্য নিরূপণ করছিল। বেগুন যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল তখন ভাগবাঁটরা হচ্ছে একতরফা খেলা শেষ হয়ে গেছে।

একটি বামনাকার স্থূলকায় লোক স্মিতবদনে একতাড়া নোট পকেটে রাখছিলেন। খুশিতে তার দু'ভাঁজ চিবুক তিন ভাঁজ হয়ে উঠেছে। বেগুন ঠেলেঠুলে তাঁর পাশে জায়গা করে নিলে। তার ঠিক বিপরীত দিকে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে একটি ফিরিঙ্গি যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি বলছিল। তাদের কথাবার্তা না বুঝলেও হাব-ভাবে বেগুন বুঝতে পারলে ছেলেটি সম্প্রতি অনেক লোকসান দিয়ে আর খেলতে না চাইলেও মেয়েটি তাকে ছাড়তে দিতে চায় না।

ইতিমধ্যে মোটা ভদ্রলোক পাঁচ নম্বরে একটা দশ টাকার নোট ধরেছেন। আবার কাষ্ঠখণ্ড ঘুরলো! তারপর চারিদিক থেকে কোলাহল উঠল, 'চার নম্বর মার দিয়া!'

মোটা ভদ্রলোকটি রাগে টেবিল চাপড়ে আর একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ওদিকে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সাথে মেয়েটির বচসা সুরু হয়েছে। ছেলেটি এবারও হেরেছে ও মেয়েটি আর একটি ফিরিঙ্গি বুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! খানিক বচসা করে ছেলেটি মুখ রাঙা করে চলে গেল। বেগুন মোটা লোকটির আরো কাছ ঘেঁষে একবার জুতো দিয়ে তার পাটা মাড়িয়ে দিলে! তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষমা চেয়ে সে বলতে যাচ্ছিল, 'মাফ করবেন, দেখতে পাইনি।' কিন্তু লোকটির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি তার জুতোর চাপ টেরই বোধ হয় পান নি!

আবার খেলা শুরু হ'ল। এবার নম্বর উঠল 'দুই'। মোটা লোকটির টাকা ছিল তিনে।

পেছন থেকে একটা ধাক্কা এল। বেগুন সামলাতে না পেরে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে।

'এইও পাজী বদ্‌মাস!' ভদ্রলোক এক ঝট্‌কায় তার হাত দুটো ছাড়িয়ে তাকে অন্য পাশে ছিটকে দিলেন। বেগুন এবার সত্য সত্যই অতি কষ্টে পেছনে লম্বা-চওড়া এক শিখের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাল।

'আরে হিঁয়ে ত মর্‌ যাওগে' বলে শিখ তাকে ভিড় থেকে ঠেলে বার করে দিলে। সে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে আর তার সাহস হচ্ছিল না। ভিড়ের বাইরে সে এর পর কি করা যায় ভেবে পেল না!

যে সব পথে সারি সারি আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দোকানের সামনে দিয়ে অসংখ্য লোকজন যাতায়াত করছিল, সেখানে তার যাবার উপায় নেই। তার সাজসজ্জার অসংখ্য ত্রুটি, তার অস্তমিত যৌবনের কুশ্রীতা সেখানে আলোকের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে। নিশাচর শ্বাপদের মতো তার অন্ধকারের সঙ্গেই

আত্মীয়তা। একটি বয়স্ক সুবেশ বলিষ্ঠকায় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে একবার চেয়ে গেলেন। খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে চাইলেন, তারপর ডানদিকের ঝিলের উপরকার ছোট সাঁকো পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুন সন্দিগ্ধ মনে তাঁর পিছু নিলে। সাঁকো পার হয়ে একটা ছবির ঘরে গিয়ে বেগুন আবার তাঁকে দেখতে পেলে। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে যেন কি খুঁজছিলেন। সে বিপরীত দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ বেগুন তাঁর দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা, তের বছরের মেয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে?'

ভদ্রলোক বোধ হয় শোনেন নি, কোনো উত্তর দিলেন না। বাম পাশ থেকে কে মিহি গলায় বললে, 'হ্যাঁ; তের বছরের মেয়ে আবার অমনি আঁকতে পারে! ও অমনি বাড়িয়ে লিখেছে।'

পেছনে শশী, তার জিরাফ-গর্দান কাঠঠোকরা-মুখো বাবু ও মাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। বেগুন আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল। মাসী একবার তার বেশের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। শশী একটু হাসলে। কিন্তু তখন শশীর সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিত যৌবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে ঈর্ষান্বিত হবার সময় তার ছিল না। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন; বেগুন তাঁর পিছু নিলে। মাসী পেছন থেকে বলছে শুনতে পেলে, 'ওই রূপের আর দেমাক দেখে বাঁচি না!—'

ভদ্রলোক বেশ জোরে হাঁটছিলেন। হয়ত এ অনুসরণে কোনো লাভ হবে না ভেবেও এবং পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেগুন যথাসাধ্য জোরে হাঁটতে সুরু করলে। প্রকাণ্ড একটা নাগরদোলার সামনে গিয়ে তিনি বসলেন। বেগুন এবার মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেলে বললে, 'আসুন না, ঐ চেয়ারটা খালি আছে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলেন। ভদ্রলোক শুনতে পাননি ভেবে বেগুন কম্পিত বুকে, হাতে একটু টান দিয়ে বিবর্ণ-মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে আবার বললে, 'আসুন না, ওই দোলাটায় একবার চড়ে আসি।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকের মুখে চোখে অসীম বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ ফুটে উঠেছিল। এমন দুঃসাহস অবশ্যই তিনি আশা করেন নি। ক্রোধকটুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার এই বেয়াদবির জন্যে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জান?—নচ্ছার পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার!—'

বহুদিনের পুরাতন বেদনাটা আবার বুকের পাঁজরায় পেরেক ঠুকছিল। ভদ্রলোক বলছিলেন, 'তোমার এতবড় আস্পর্ধা--'

হঠাৎ পাশ থেকে একটি ছেলে ডাকলে, 'বাবা! ওমা, এই যে বাবা!' আধা ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেগুন ভদ্রলোকের ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সেখান থেকে সরে গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা চেয়ারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছিল, চোখেও যেন একটু ঝাপসা দেখছিল—এখন

যদি একটু মদ পেত !

কিন্তু ক্রমশঃ সময় যাচ্ছে। আজ যাহোক কিছু রোজগার করা চাই-ই। এখন মনে হচ্ছে, সেই প্রথম শিকার অবহেলা করা হয়ত উচিত হয়নি, কিন্তু সে যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! কিছুক্ষণ পরে এক জড়ভরতকে কাঁধে ভর করিয়ে এনে একটি মেয়ে তার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মেয়েটি যে তারই সমশ্রেণীর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অষ্টাবক্র মূর্তিমান জরাকে কোথা থেকে সে পাকড়াও করলে !

বুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটা বললে, 'খবরদার, এখান থেকে নড়িস্ নি বুড়ো, তাহ'লে তোর হাড়মাস একজায়গায় রাখব না !' বুড়ো সুরা-জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট-ভাবে কি বললে বোঝা গেল না। মেয়েটা বললে. 'দে টাকা, এক বোতল আনি।' তারপর বুড়োর পকেটে হাত দিলে। কিন্তু এ বিষয়ে বুড়ো এখনও খুব সজাগ ; সে আর্তকণ্ঠে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বললে. 'ঐ নিলে, সব চুরি করে নিলে !' মেয়েটা বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, দে তবে হতচ্ছাড়া, তুই নিজেই দে।' বুড়ো পকেট থেকে একটা নোট কম্পিত হাতে বার করে দিলে, মেয়েটা চলে গেল।

বেগুন নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। বুড়োর যেমন রূপ তেমনি বেশ ! তার দেহের গঠন দেখলে মনে হয়, মাত্র সম্প্রতি সে চতুষ্পদে চলা ত্যাগ করেছে। তার কুৎসিত মুখের লোল-মাংসে ও প্রতি রেখায় সারাজীবনের পৈশাচিক ইতিবৃত্ত লেখা। বেশ তার অদ্ভুত। শীর্ণ দেহে একটা ময়লা চাপকান এবং সে চাপকানের ওপর আবার এক দুর্গন্ধ নোংরা চাদর। গলায় কম্ফর্টার জড়ান, পাঁকাটির মতো সরু ও ধনুকের মতো বাঁকা পায়ে লাল মোজা ও ক্যাম্বিশের ছেঁড়া জুতো। ঐ ধ্বংসাব-শেষের মাঝে মৃত্যুর ভ্রূকুটির তলেও কদর্য কামনার বীভৎস উৎসবের লীলা আজও থামে নি। বেগুনের নিঃসাড় মনেও ঘৃণা ও বেদনা জাগছিল।

কিন্তু বৃদ্ধের পকেট টাকায় ভরা ঐ মেয়েটার বদলে যদি সে নিজে আজ একে শিকার করতে পারত, কিছুদিনের দুর্ভাবনা অন্ততঃ ঘুচত। একবার ইচ্ছে হ'ল যে, মেয়েটার অনুপস্থিতিতে বুড়োকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা যদি আর না আসে, তাহ'লে হয়ত ভালো হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব কম। মেয়েটার কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটিকে আর ফিরতে না দেখে বেগুন অবশেষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলে না। বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমোচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বসল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা উঁকি মারছিল। একবার ইচ্ছে হ'ল এই অবসরে মনিব্যাগটা নিয়ে সরে পড়ে ; কোনো হ্যাঙ্গামা নেই, কেউ দেখতেও পাবে না। কিন্তু সে সাহস হ'ল না, বুড়ো সে সুযোগ দিলেও না, হঠাৎ চোখ চেয়ে বললে, কে, রূপো এলি ? দে, বোতল দে।'

বেগুন বললে, 'আমি রূপো নই—'

'আচ্ছা তুই সোনা, দে এখন, বোতল দে।'

সে হাত বাড়ালে।

'বাঃ, আমি বোতল কি জানি!

বুড়ো এবার চটে বললে, 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি' হচ্ছে? দে বলছি বোতল!'

বেগুন বুড়োকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'মর বুড়ো, আমি কি তোর রূপো, তোর রূপো চম্পট দিয়েছে।'

বুড়ো এবার সচেতন হয়ে উঠল। বেগুনের দিকে চেয়ে বললে, 'কোথায় গেল রূপো? তুই কে!' তারপর দুর্বল পায়ে উঠবার চেষ্টা করলে। বেগুন তাকে নিরস্ত করতে গেল। বুড়ো চিৎকার করে বললে, 'না না, আমার রূপোকে খুঁজব, ছাড় তুই মাগী।' কিন্তু বুড়োর ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, বেঞ্চিতে আবার টলে পড়ল। বেগুন বৃদ্ধের গলা বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বললে. 'রূপো থাক্‌গে, আমি তোকে বোতল দেব, চ আমার সঙ্গে!'

'না না, আমার রূপোকে চাই!' বৃদ্ধ বেগুনের বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্ত হবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগল। বৃদ্ধের বুকে মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে কান্নার অভিনয় করে এবার বেগুন বললে, 'কে তোর রূপো? তোকে ফেলে সে পালিয়ে গেল, আর আমি তোকে সাধছি তবু আমায় পায়ে ঠেলছিস!' অভিনয়ে চির-অভ্যস্ত এই পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ও সে জঘন্য অভিনয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল—কিন্তু উপায় নেই।

বুড়োকে রাজী করিয়ে অনেক কষ্টে তাকে গেটের কাছাকাছি এনে বেগুনের একটু আশা হ'ল। এই দুর্বল অসুস্থ শরীরে এই অথর্ব বৃদ্ধের ভার বয়ে আনা সহজ নয়। বেগুনের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়তে চাইছিল কিন্তু গেটের কাছে পেঁছোলেই কিছুদিনের মতো দুঃখের অবসান হবে ভেবে, আশায় সে প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে হাঁকলে, 'এই ও, খাড়া হো যাও—'

বেগুন তখনও এগিয়ে চলছিল। লালপাগড়ী-পরা পাহারাওয়ালা পেছন থেকে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'এত্তা চিল্লাতা, শুনতে নেহি?'

সভয়ে বেগুন দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের শিথিলপ্রায় দেহ তার কাঁধে ঝুলছিল।

'ইতো মাতোয়ালা হ্যায়, ছোড়্‌দো ইসকো—'

বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'হ্যাঁ বাবা, মাতাল হ্যায়।' বেগুন হতাশ হয়ে শেষ চেষ্টা করে বললে, 'আমার স্বামী যে, পাহারাওয়ালা সাহেব!' দু'চারজন লোক মজা দেখতে জড় হয়েছিল, তারা হেসে উঠল।

'চুপ্‌ বদমাস মাগী, দিল্‌লাগি কর্‌তা—' পাহারাওয়ালা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল! অনেকদিন বাদে বেগুনের চোখ সজল হয়ে উঠছিল বোধ হয়।

লোকের ভিড় অনেক কমে গেছল। রাত্রি অনেক হয়ে এসেছে। যে পথে প্রথম একজিবিশনের ভেতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার বেগুন চলতে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামি হয়েছে।—

ভাগ্যহীনার আবার সুরূপ কুরূপ।

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কে যেন শুয়ে আছে মনে হ'ল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করবার তার সাহস ছিল না। কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পারল না। যাকে দেখে সে কিছু পূর্বে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল তার সেই বীভৎস মূর্তিই খানিক পরে তার এত আনন্দের কারণ হবে, এ কথাও সে কল্পনা করতে পারেনি। সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নই বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণা-ভরা আনন্দ দমন করে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে. 'রাত অনেক হয়ে গেছে—' এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোনো সন্দেহ কোনো দ্বিধা তার মনে আর ছিল না।

লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটার গায়ে খাকী ছেঁড়া কোট, পরনে আধ-ময়লা কাপড় দেখে নিম্ন শ্রেণীর মিস্ত্রী-টিস্ত্রী হবে বলে মনে হয়। লোকটার হাত ধরে তুলে বেগুন কিন্তু অবিচলিতভাবে বললে, 'চলো, যাবে না ?'

প্রথমে ঘুমের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দু'হাতে চোখ রগ্‌ড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিল না বললেই চলে। তারা দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে, 'দাঁড়াও কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের করো দেখি।'

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখালে।

কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলতে লাগল, মিনি-পয়সায় ইয়ার্কি দিতে এসেছ হারামজাদা চোর।—'

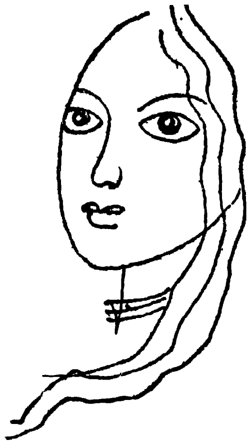
লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোনো ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেগুন হতাশ হয়ে একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সম্ভব-স্থান নিজে হাতড়ে দেখলে। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিড়ি ছাড়া তার কোনো সম্বল ছিল না।

দাঁতে দাঁত চেপে অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, 'চলো—'

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।

অঙ্গার

প্রবোধকুমার সান্যাল



বছর আটেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না।

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছু দিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাস ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয় নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'রে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে

আমি তোর নামে পনোরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এই ভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কি ভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুংখানুপুংখ খোঁজখবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিতই প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তাঁরা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম' এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা করে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধ-সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গবর্ণমেন্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনো-দিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে

টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টুনু ?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা ?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে ?

খবর ?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি ? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে ? পঁচিশ বছরবয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি ?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষ্যা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি ?

টুনু বললে, না, আফিস থেকে পাই কনট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো।—আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস ? তারা কি ফরিদপুরে নেই ?

না—ব'লে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়োনা ছোড়দা !

কেন রে ? তারা থাকে কোথায় ?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে—এই বলে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, নুটু হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চির নির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশি মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কনট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়া-খেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত নুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব ?

ওদের খবর নেবো কি নেবোনা এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টি'কছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনোমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা! তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বার করতে আমার বিলম্ব হল না। মনে করেছিলাম। তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান. ভিতরে ভূষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমায় হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে যখন একটা গন্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপরতলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে।

না।

তোর মা কোথায়?

ভিতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলু দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধাঁ। আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! ব'লে তার হাত ধরলুম;—চলু ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বলব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস?

আমাকে দেখে উপরতলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তার ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে,

চৌবাচ্ছার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তার কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু—পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কি এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তা'র সর্বাঙ্গে। তা'র অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময়-চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, হাতে নীল কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে?—এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস? তোর মা কোথায়!

সে আমাকে চিনলো কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এ পাশে নর্দমা, ও পাশে কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দু ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান ধ্যান—এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান-পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন

মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি।

বললুম, পিসিমা, প্রণাম করবো, পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা ক মাস হোলো এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কা'র খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম···কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের কোনো খোঁজ খবর নেই!

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ!

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীকোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্‌কা-তপসে মাছ এসেছে—একেবারে ধড়ফড় করছে!

তা'র লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না!—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট কিনা—বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধহয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা, নুনটা, মাঝে মধ্যে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে।

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাটা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না

নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

তা পারবে না কেন বলো? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন। অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বারো চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করিনি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি।—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় কই, কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ!

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসে ছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালে। বললে, মা, মা শুনছ? এই নাও একটা আধুলি হরিশবাবু দিল—

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমি ত' বলেছিলে!

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস, মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয়-পরিবারেই আমার জন্ম! অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত-অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের

বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি !

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। যেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধীকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা ? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন করে ?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস তোরা শুনি।

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত ?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি ?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা ?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা ?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না ? অমন দয়ালু কে রে ?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ !

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধ হয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি

প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়্দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকাটা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে?

একটু থিতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি!

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়্দা?

চুপ ক'রে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললাম, নুটু কোথায়?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে. টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, নুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে. ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়িটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস ত।

বাইরে জুতোর মসমস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ—লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে. কই, বিনোদ কোথা গেলে? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙ্গা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে. দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোত্থেকে—গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে

থাক।—বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে ?

না। ও'র সবাই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তা'র জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে ? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না ?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে : চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরুসরু হাত দুখানা শির-ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথার ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সন্ত্বানা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টি'কে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম ?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা ? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলুম। কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড় ? কোন্ মিথ্যাবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না ? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসী মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে ? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে তাদের কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো ? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা পিসিমা-খুড়িমা-বোন বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো ? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ ? মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা ?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কন্‌ট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা তার কোনো সুবিধে পাও না ?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মীনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন, কাঁদছিস কেন, শুনি ? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ীর হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা —হারু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা ? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি ?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না ? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে ?

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা ? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি ? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ ? পেটের ছেলে-মেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে ?

শোভনা গর্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার ? মেরে মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আক্কেল ? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর-খরচ চলবে কোত্থেকে ? লজ্জা নেই তোমার ?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই বলে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল ? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই ?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, আমিও বলি ? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায় ? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে ? আমাকে কেরাণী-বাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল ? উত্তর দাও ? জবাব দাও ? হোটেলের

পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মীনুর,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই! কিন্তু অপরাধ যাদের, তা'রা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা! যাকগে, আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা!

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গেলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোলো না বাবা নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে খেয়ে তৈরী হও দিকি? গলাবাজি করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝকমারির কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্যকলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের উপর দিগন্ত-জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মত কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মত নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নটু, মীনু—এরা কি সেই তা'রা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন ক'রে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈকি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে যেতে পারিনে।

সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে-ঘুরে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশী দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্র-জীবনের নীচের তলাকার লুকানো আশ্রয়, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না—আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের ওপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারী-কণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নীচের তলাটা নিঃসাড় —মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মীনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মীনু, ও হারু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মীনু ও-বাড়ীতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়দা। দরজা খোল দেখি?

ছোড়দা?—শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ব'সে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললুম। বললুম, কাঁদিসনে, চুপ কর্। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি করেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন্, কালকেই

আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলেন। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না!—এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ্, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে।

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তার ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তার ঘরে তুলে আনছে। মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি!

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয়ে চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীরকণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও, ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ্‌ আগে সবাই মিলে ?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি—তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না...লক্ষ্মীটি ছোড়দা

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি ?

আমি কারখানার ভূত, স্যার।—এই বলে হঠাৎ সে শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে !—লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে. আগাম একটা টাকা দিইনি কাল ?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে ?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে ? বেশ কথা বলে পাগলি !

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগগির ? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয়, তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো ?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি ? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই ? দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা—

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন ? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি খেয়ালী ! তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি 'এসেন্‌সিয়াল্‌ সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করি মেয়ে-মানুষের মেজাজ টেজাজ অত বুঝিনে ?' এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে !

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

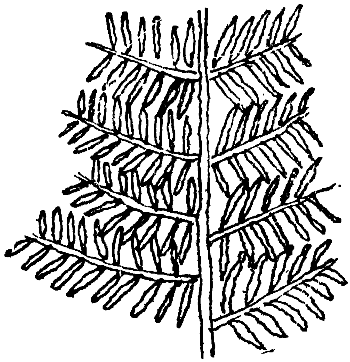
লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কন্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে

রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নইলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম।—আচ্ছা, বেশ. কাল না হয় আড়াই সের চালই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুলমাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি বলে যাও। তুমি বলে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে. আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি ?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিন্ড থেকে অবার রক্ত উঠে এলো। বললে তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি. দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হোলো, অঙ্গারের আগুণ যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাগ্রাস্ত বাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে !



নমুনা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়



কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগেও কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা-কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্ব্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্ব্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার একদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বারস্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাস্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে যোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়বার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরণের কুইনিন—খুবই এফেক্টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সেজন্য কেশবের মনে কোন আফশোষ নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে। সেও বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্ট। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়। অনেক তফাতে, ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে এখন মেয়ের সংখ্যা শতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধাহাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে সহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়া কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্ত্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফশোষ করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুকু

চুক্। আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়!'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দুটি একটু ছল ছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্ত্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

সহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাদ আসা যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্ব্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কাণেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়ীতে রাখবে? শৈলিকে বাড়ীতে রাখবে তোমার?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের

ভীতি বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায় কে জানে। ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্য্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশও তার পরিবারে ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শূদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত? বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কাণে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলো-মেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী, চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলর বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য আলগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়ঃ তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই! কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্য্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্ত্তমানে সদয়কে শানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে

নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ী এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনিভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ী রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চোখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চক্কোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলর মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বদ্যি ওদের নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জেবলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন সাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে নিয়ে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে এ বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো সে তোমার ধম্মো। আমার ধম্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যাথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যাথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন!' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুলপাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জ্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ' বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হাল্কা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভূত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামায়? আর কি মেয়ে নেই পিথিবীতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল! মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলোকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল?'

'দুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেককাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিস। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথা ব্যথা, আদর যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

কেন?

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও অন্যের বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।"

দুজনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল। বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল।

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি

খুন করে ফেলবে।

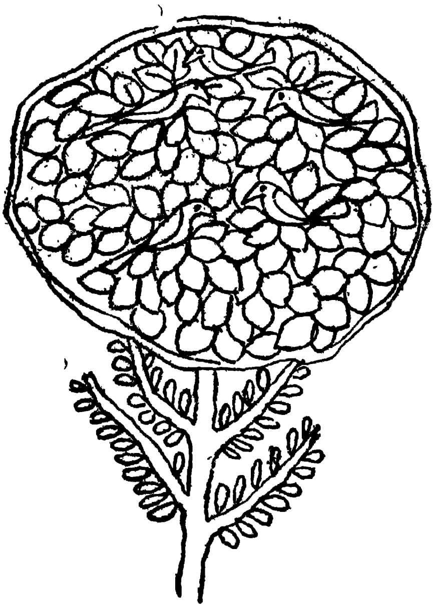
'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ করার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখেয় নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ে কুমারী খুঁজছিল।'





চোর! চোর!

বুদ্ধদেব বসু

অন্ধকারে চোখ মেলে ললিতা প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না। তবে, একটু আগে, ঘুমের মধ্যে একটা শব্দ সে শুনেছে, তা ঠিক। ঠিক তো? তার ঘুম খুব পাৎলা, একটুতেই ভেঙে যায়। আগেকার দিনে—ছেলেবেলায়—সে ভীষণ ঘুমুত। এমন ঘুমুত যে ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে পড়লেও তার ঘুম ভাঙত না। একবার—সতেরো বছর বয়সে—সে তখন সবে নাম লিখিয়েছে—একটি ছেলে এলো তার কাছে, ভারি সুন্দর দেখতে। কত মিষ্টি কথা যে বললে তার হিসেব নেই। ছেলেমানুষ সে, মিষ্টি কথায় ভুলেছিল। ছেলেটিকে থাকতে দিয়েছিল রাত্রে। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙল, ছেলেটি নেই। ললিতার দু'হাত ভরা চুড়ি ছিল, তাও নেই। কানে দুল ছিল, তাও অদৃশ্য হয়েছে। পাশের ঘরের মালতী বলেছিল—এখনো ললিতার সে-কথা মনে পড়ে—'এখন আর কাঁদাকাটি করে কী হবে, বল। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি হবে তো! বলি, রাত্তিরে কখনো কোন বাবুকে ঘরে রাখতে আছে! ফুর্তি করে টাকা গুনে দিয়ে চলে যাও—এর বেশি আবার কার সঙ্গে কী সম্পর্ক! যেমন গিছলি পিরিত করতে, পেলি তো ফল! প্রাণে যে মেরে যায়নি, এই তোর সাত পুরুষের ভাগ্যি। পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বেস করে, পোড়ারমুখি! আর কী রাক্ষুসে ঘুমই বা তোর—কান থেকে দুল খসিয়ে নিলে, কিচ্ছু টের পেলিনে। আফিং-টাফিং খাইয়েছিল নাকি?...

পুরুষমানুষকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে! না—তার পর থেকে, সে অন্তত কখনো করেনি। সর্বদা সজাগ, সর্বদা সতর্ক। অতিথির মনোরঞ্জন করতে তাকে হেসে কথা কইতে হয়, গান গাইতে হয়; অলস কটাক্ষ-বিলাসে, উদ্দীপক দেহভঙ্গিতে

মোহ-বিস্তার করতে হয়, কিন্তু তার মনের এক কোণে কড়া পাহারা বসে থাকে সব সময়। মদের নেশাতেও তা ঝিমিয়ে পড়ে না, ঘুমের মধ্যেও তা ঘুমোয় না। সর্বদা সন্ত্রস্ত, সর্বদা সজাগ। কোথায় খুট করে একটু শব্দ হল, অমনি সে জেগে উঠল। তার ঘরেই শব্দ একটা হয়েছে—ঠিক তো? ললিতা চোখ খুলে রেখে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ধ্রাম।—উঃ! সঙ্গে-সঙ্গে ললিতা হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচ টিপল।

মশারি তুলে বিছানার বাইরে আসতে-আসতেই তার চোখ পড়ল উল্টো দিকের দেয়ালের বড় আয়নায়। সেখানে দেখল, ঘরের মাঝখানকার গোল টেবিলের পাশে একটা চেয়ার উল্টে গেছে, আর একটা মনুষ্য-মূর্তি চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাতেই লোকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। ঠিক চোখোচোখি—তার বেশি নয়। কারণ লোকটির মুখ কালো একটা মুখোশে ঢাকা; নাকের দু'পাশে দুটো গর্তের ভিতর দিয়ে কালো একজোড়া চোখ ঝকঝক করছে। লোকটির পরনে—ললিতা একদৃষ্টিতে দেখে নিলে—জিনের একটা হাফপ্যাণ্ট, অত্যন্ত নোংরা। গায়ে বেখাপ্পা রকম ফর্সা একটা হাত-কাটা শার্ট। খালি পা। মাথার চুল যেন আঠা দিয়ে লেপটে উপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিজের অজান্তে ললিতার বুক থেকে একটা চীৎকার উঠে আসছিল, সচেতন চেষ্টায় সে সেটা রোধ করলে। পুরুষ চরিয়ে যাকে খেতে হয়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে তার চলে না। নিতান্ত নিঃসহায় তার জীবন' সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ঘোর বিপদেও রক্ষা করবার কেউ নেই; অনিষ্ট যে-কেউ করতে পারে। বছরের পর বছর অনেক বিপদে, অনেক দুঃখে, অনেক ক্ষতিতে নিজেকে নিজেই সামলাতে হয়েছে; স্বাধীন আত্ম-রক্ষায় সে অভ্যস্ত। তাই নিস্তব্ধ রাত্রিশেষে একা বন্ধ ঘরে এই আকস্মিক মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল না। ভয়ে তার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছিল; কিন্তু সে জানত, বাইরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ না রাখতে পারলে এ অবস্থায় উপায় নেই।

একটু সময় উভয় পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চল; তারপর হঠাৎ যেন মোহ থেকে জেগে উঠে ললিতা পিছন দিকে এক পা বাড়াল।

লোকটি শাঁ করে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট কালো একটা জিনিস বের করে ললিতার দিকে উঁচু করে ধরলে।—'কোন দিকে এক পা নড়েছ কি মরেছ।' গম্ভীর, ভীষণ কণ্ঠস্বর নয়; বরং কাঁপছে যেন। ললিতা একটু অবাকই হলো। পিস্তলের নলটা একটা হিংস্র নিষ্পলক চোখের মতো তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, লোকটার তর্জনী একটু যদি নড়ে ওঠে—একটু টান—ভীষণ শব্দ, অনেক ধোঁয়া, খানিকটা আগুন তার বুকের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে গেল। ললিতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। খুব আস্তে বললে, 'কী চাও তুমি?'

'কী চাই?' মুখোশ ভেদ করে খানিকটা বিকৃত হাসির শব্দ বেরিয়ে এলো, 'সবাই যা চায়—টাকা।'

'কিন্তু ঘরে তো কিছু নেই।

কালো মুখোশের ফাঁকে এক জোড়া কালো চোখ হেসে উঠল যেন।—'বেশ, খুঁজে দেখা যাক, কিছু আছে কি নেই। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করতে হচ্ছে—কিছু মনে করো না। তুমি কি একটু কষ্ট করে চাবিগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আসবে?' পিস্তলের ঘোড়ার উপর সে যেন আদরে একবার আঙুল বুলোল।

ললিতা মনে-মনে হিসেব করে দেখল যে চীৎকার করে কেন ফল হবার আশা নেই। চীৎকার করে গলা ভেঙে ফেললেও নিচে ভাঙের ঘুমে অচেতন দরোয়ানজীর কানে তা পেঁছবে না। দোতলার রাসমণি হয়তো ছুটো আসতে পারে, কিন্তু তার আগেই লোকটা হয়তো তর্জনী একটু নাড়বে, আর সঙ্গে-সঙ্গে··· । লোকজন ডেকে জড়ো করবার অপেক্ষায় সে থাকবে না, তা ঠিক। ললিতা এক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ; খুলতে যে সময় নেবে, তা পোষাবে না। রাস্তার দিকে ছোটো একটা বারান্দায় যাবার দরজা—সে প্রায়ই সেটা খুলে শোয়, আজ কী মনে করে যেন বন্ধ করেছিল। ও বারান্দায় পেঁছতে পারলেও একরকম হত; এ-রাস্তায় গভীর রাতেও দুটো-একটা লোক থাকেই, আর উল্টো দিকের পানের দোকানটা তো প্রায় সারা রাতই খোলা। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ হত? সেই নিষ্পলক, হিংস্র দৃষ্টি—তাকে সে কী করে এড়াবে?

'শিগগির, শিগগির—বেশি সময় নেই। ভূতের সঙ্গে আমার মিল এই যে ভোর হবার আগেই আমাকে অদৃশ্য হতে হবে।—আর খানিকটা মিল সম্প্রতি চেহারায়—কি বলো?' আবার অস্পষ্ট হাসি শোনা গেল।

'কিন্তু সত্যি বলছি—কিছু নেই। হয়তো রোজকার খরচের দু'দশ টাকা—তাতে তোমার খাটুনিও পোষাবে না।'

'কেন—পুরুষমানুষকে ছাগল বানিয়ে যে মুঠো-মুঠো টাকা বার করে নাও, সে-সব কী হল?'

'এটা বোধ হয় জান যে আজকালকার দিনে সবাই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখে?

'হুঁ।' একটু পরে: 'যাক—যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। দু'দশ টাকাও মন্দ নয়। তাছাড়া, গয়না-টয়নাগুলো—তাও কি ব্যাঙ্কে জমা রেখেছ?'

ললিতার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। তার আলমারির দেরাজে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার অলংকার রয়েছে—সোনা-হিরে-মুক্তোয় গা-ঘেঁষাঘেঁষি, আলোর এক রাজ্য। তার সমস্ত জীবনের উপার্জন, তার জীবনের আলো। ও-গুলো যদি নিয়ে যায়—।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বার কর চাবি।

উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। ললিতা নড়তে চাইল, কিন্তু তার পা দুটো অসম্ভব ভারি হয়ে উঠেছে।

'আঃ, সময় নষ্ট করো না, বলছি! লক্ষ্মী মেয়ের মতো চাবির গোছাটা আমার হাতে তুলে দেবে, না সেটাও আমাকেই কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে?'

উপায় নেই, উপায় নেই। ললিতা চেষ্টা করল নড়তে—কিন্তু তার শরীর পাথরের মতো স্থির। শুধু তার চোখ মশারির হালকা আবরণ ভেদ করে পড়ল গিয়ে তার বিছানায়, প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে, তারপর স্পষ্ট হয়ে বালিশের উপর। কালো মুখোশের নিচে দুই চোখ তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করল।

'আঃ—thank you', বালিশ তুলতেই তার নিচে চাবির গোছা পাওয়া গেল। Thank you', চাবিগুলোকে লোকটা আঙুল দিয়ে একটু আদর করল—'এবার তাহলে একটু খুঁজে দেখা যাক—কী বলো ?' যেন ললিতারই অনুমতির জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

এতক্ষণে ললিতা তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল। 'তুমি কত টাকা চাও বলো আমি দিচ্ছি।'

'বা বাঃ, এখন যে একেবারে দয়ার অবতার, রানি ; কী দেবে ? বাজার খরচের দু'দশ টাকা ?'

'যা তুমি চাও। এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি।'

'চেক ?...বাঃ, আমি ভাঙাতে যাই; আর এদিকে তুমি ব্যাংকে খবর দিয়ে রাখবে—ঠেলবে হাজতে ! না, তোমার এ দয়া নিতে পারলুম না, দুঃখিত।'

'না—সত্যি। আমি মোটেও খবর দেব না ব্যাঙ্কে। সত্যি তোমাকে দিয়ে দেব —ধর এক হাজার ? কাল ঠিক দশটার সময় তুমি কড়কড়ে হাজার টাকা পেয়ে যাবে।

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করছে। অমনি ললিতা বললে, 'আচ্ছা, দেড় হাজার ! হবে ওতে ?'

লোকটা মনে-মনে কী-যেন একটু হিসেব করল, তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'নাঃ—বেশ্যার কথায় যে বিশ্বাস করে নরকেও তার জায়গা হয়না।

'তাহলে আমার কথাটা তুমি রাখলে না ?'

'বেশি কথা বোল না—যা বলছি তা-ই কর।'

'কী করতে হবে, বল।' এতক্ষণে ললিতা তার স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছিল।

'এই নাও চাবি—ঐ আলমারিটা খোল তো।'

'দাও।' ললিতা হাত পাতল। চাবি দিতে গিয়ে লোকটার আঙুল তার হাতে লেগে গেল।

'বাঃ, বেশ নরম তো তোমার আঙুল।'

'ও-সব প্যাঁচ আমার উপর চলবে না, সুন্দরী। যাও—খোল আলমারি।'

'যদি না খুলি ?'

আমাকেই খুলতে হবে তাহলে।

'যদি বাধা দিই ?'

'তাহলে এই যে—' উঁচোনো পিস্তলটায় (এতক্ষণের মধ্যে সে একবারও সেটা নামায়নি) সে একবার ঝাঁকুনি দিলে।

'তাহলে আমাকে সত্যি মেরে ফেলবে ?'

'না, মেরে ফেলব কেন ? ঠ্যাংটা শুধু একটু খোঁড়া করে দেব, যাতে আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারি।'

'তারপর বাকি জন্ম আমি খোঁড়া হয়ে থাকব ?'

'বোধহয়।'

'না, না, খোঁড়া হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। সে বড় বিশ্রী। তার চেয়ে বরং আমায় মেরে ফেল।'

তা ঠিক জায়গায় লাগলে মরেও যেতে পার।'

'আচ্ছা—তুমি যে আমাকে মেরে ফেলবে, একটু কষ্ট হবে না তোমার ?'

'কষ্ট কিসের ? তোমার মতো জঘন্য জীবন যত শিগগির শেষ হয়, ততই ভালো।'

'তা হোক, তবু—আচ্ছা, আমার মতো সুন্দর মানুষ কখনো দেখেছ ?'

কালো মুখোশের নিচে কালো দুই চোখ মুহূর্তের জন্য ললিতার মুখের উপর নিবন্ধ হয়েই আনত হল !—'তোমার সঙ্গে রসালাপ করতে আমি এখানে আসিনি। যা বলছি করো।'

আস্তে-আস্তে ললিতা আলমারির কাছে গেল, লোকটা তার পিছনে। আলমারির দরজাও প্রকাণ্ড, ঝকঝকে আয়না সেখানে ললিতা নিজের ছায়া দেখে একটু স্তব্ধ না-হয়ে পারল না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিচার করলেও মানতে হয় যে সে সুন্দরী। অপরিপূর্ণ ঘুমে ঈষৎ ফোলা-ফোলা তার চোখ—সন্ধ্যাবেলা সে যে সুর্মা মেখেছিল তার কালো আভা এখনো দুঃখের চিহ্নের মতো চোখের কোলে লেগে আছে ; একরাশ এলো চুল পিঠে ছড়ানো—কালো, এখনো কালো। কিন্তু আর কদিন ? দিনে দিনে বয়েস বেড়ে চলে—বয়েস তো কারো কথা শোনে না। তার এমন যে নিটোল মজবুত শরীর—তাও একদিন ভেঙে পড়বে। সময় আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু···অদৃশ্য অপরাজেয়। তার হাত এড়াতে কেউ পারেনি ; ললিতা, তুমিও পারবে না। তবু—যে কদিন হয়। এখনো হয়তো বছর দশেক মেয়াদ আছে। তার ভাগ্য ভালো ; অনেক বাঙালি মেয়ের চাইতেই তার যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হল। জ্বালিয়ে যাও, ললিতা, আর যে-কদিন পার, জ্বেলে যাও, জ্বালিয়ে যাও। আয়নায় ছায়ার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটলো।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

ললিতা মুখ ফিরিয়ে সেই কালো মুখোশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নিজের চেহারা দেখছিলাম। সুন্দর—কি বলো ?'

খোল !' লোকটির স্বর অধীর আগ্রহে কাঁপছে, 'খোল !'

'খুলছি।' চাবি লাগিয়ে ললিতা হঠাৎ আবদারের সুরে বলে উঠল, 'তোমার পিস্তলটা নামাও—আমার বড় ভয় করছে।'

'আমার কথা-মতো চলো—কিছু ভয় নেই তোমার।'

ললিতা চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলল। উপরের তাকগুলো সব শাড়িতে ঠাসা। সেখানে হাত রেখে ললিতা বললে, 'তোমার বৌ আছে?'

লোকটি হুমকি দিয়ে উঠল, 'ফাজলেমি!'

ললিতা হতাশভাবে একটু ঘাড় নেড়ে বললে, 'কী মুশকিল! ভালো কথা কইলেও যে চটে যায়—'

'থাক, তোমাকে এখন ভালো কথা কইতে হবে না। কী আছে বের করো দিকি।'

আছে তো এক বোঝা শাড়ি—মরলে পরে সব চিতেয় যাবে আর কি। মেয়েটাও মরে গেল—নইলে অ্যাদ্দিনে কি আর ওর শাড়ি পরবার বয়েস না হত। বলছিলাম কী—ভালো দেখে একখানা বেছে বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাও—বৌ খুশী হবে। তা তুমি তো চটেই উঠলে। চাও তো আমিই বের করে দিচ্ছি। এই যে, এখানা—' ললিতা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উপরের তাকের তলা থেকে আগুনের রঙের একটা শাড়ি টেনে বের করলে—'পছন্দ হয়? খাঁটি বেনারসি সিল্ক—হাজার টাকা এর দাম।'

'হাজার টাকা?'

'ছিলেন এক জমিদারবাবু—মৈমনসিং জেলায় বাড়ি। বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে। তিনি দিয়েছিলেন এখানা। ভদ্দরলোকের দিলটা খুব খোলা ছিল—তা এমন কপাল, অকালে মরে গেলেন। লিভার নাকি পচে গিয়েছিল।' ললিতা শাড়ির ভাঁজ খুলল, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল খানিকটা—'ভালো জিনিস—একশো বছরেও কিছু হয় না। নিয়ে যাও না এখানা বৌয়ের জন্য।'

লোকটা হাত দিয়ে শাড়িখানা একটু নেড়ে-চেড়ে বললে, 'হুঁ। ভালো জিনিস—না? হাজার টাকা দাম। হাজার টাকা দামের আরো শাড়ি আছে তোমার?'

'ক—ত! আরো চাই দু'একখানা?'

'ছাই! বৌ-ফৌ আছে নাকি যে নিয়ে যাব!'

'ও—তুমি বুঝি বিয়ে করোনি? আহা—কেন গো?

'তোমার সঙ্গে এখন ঘরোয়া আলাপ করবার সময় আমার নেই। দেরাজগুলো খোল। গয়না কী আছে দেখি।'

হ্যাঁ, গয়না। —দেখছি।' আগুনের রঙের শাড়িটা এলোমেলো হোয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। ললিতা নিচু হয়ে উপরের দেরাজে চাবি লাগিয়ে বললে, 'পিস্তলটা নামাও না ভাই। বড্ড ভয় করছে আমার।'

'কী ছেলেমানুষের মতো কেবল ভয় করছে! ভয় করছে! আর—দ্যাখো, আমাকে ভাই-টাই বলবে না।'

'ওমা, কেন? একজনকে ভাই বললে কী দোষ?'

'আছে দোষ।'

'কী বল তাহলে?' ললিতা মুখ ফিরিয়ে চপল হাসি-ভরা চোখ তুলে তাকাল, 'প্রভু?' সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত থিয়েটারি মুখ-ভঙ্গি করে—'নাথ? প্রাণেশ্বর?'

'ফাজলেমি—না ?' লোকটা রাগে যেন গর্জাচ্ছে।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ কিন্তু।' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'দ্যাখো, বাড়াবাড়ি করবে তো মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। খোল শিগগির দেরাজ।'

ললিতা এক টানে দেরাজ খুলে ফেলল। লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ বাক্সটা দেখি।' তার নির্দেশমতো ললিতা কুমিরের চামড়ার বেশ বড় একটা অ্যাটাশে কেশ বার করে পাশের একটা টিপয়ের উপর রাখল। তারপর লোকটা কিছু বলবার আগেই সেটা খুলে ফেলে বললে, 'দেখবে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা ঝুঁকে তাকাল। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। ললিতা তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ সুন্দর না ?'

'বেশ।' লোকটার গলা দিয়ে স্বর যেন ফুটছে না।

'বেশ! শুধু বেশ! এত সুন্দর জড়োয়া গয়না তুমি দেখেছ কখনো ?' লোকটা কোন কথা বললে না। 'এই সব—' হঠাৎ ললিতার স্বর অত্যন্ত কোমল হয়ে এলো, 'স—ব তুমি নিয়ে যাবে ?

'আপত্তি আছে তোমার ?'

'আমাকে একেবারে বিধবা করে রেখে যাবে ? উঃ, পুরুষের প্রাণ কী নিষ্ঠুর !'

এতক্ষণে লোকটার চোখ অ্যাটাশে কেশ থেকে ললিতার দিকে ফিরল।—'থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না।'

'ন্যাকামো! একে তুমি ন্যাকামো বলো!' ললিতার স্বর আবেগে ভারি হয়ে উঠল, 'বলবেই তো i তুমি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় নেই; তুমি কী করে বুঝবে এই গয়নাগুলোকে আমি কত ভালোবাসি।'

'ইশ—এত মোহ! এ-কথা কখনো ভাবো, তুমি মরে গেলে এ গয়নাগুলোর কী হবে ?'

'মরে গেলে কী হবে ? যা খুশি তাই হবে। সে-কথা ভেবে কী লাভ ? মেয়েটা যদি থাকত তাহলে কি আর কোন ভাবনা ছিল ? কী সুন্দর ছিল দেখতে—মনের সাধ মিটিয়ে ওকে আমি সাজাতে পারতাম। গয়নাগুলোর দিকে যখনই তাকাই, ওর কথাই আমার মনে পড়ে।'

'তোমার মেয়ের কপাল ভালো—তাই সে মরেছে।' লোকটা এক হাতে অ্যাটাশে কেশটা বন্ধ করলে।

'ও কী ? ওটা বন্ধ করছ কেন ? সত্যিই কি সব নেবে তুমি ?'

'কত দাম হবে এগুলোর বল তো ? হাজার খানেক—?'

'ওমা, বলে কী!' ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'উঃ, হেসে আর বাঁচিনে!

'চুপ!' লোকটা হিংস্র স্বরে বলে উঠল। 'বলো—এখানে কত টাকার গয়না আছে ?'

ললিতা শান্তভাবে বললে, 'তিরিশ হাজারের একটি পয়সা কম না।'

'কত ?'

'তিরিশ হাজার।'

'তি-রি-শ হা-জা-র!' পরক্ষণেই স্বর বদলেঃ 'ও—তিরিশ হাজার বে—শ। আচ্ছা, এবার তোমার দেরাজের অন্যান্য বাক্সগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক।'

'দেখাচ্ছি। কিন্তু—' করুণ সুরে ললিতা বললে, 'কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে ?'

'না, রাখব না।'

বেশি কিছু নয়—সামান্য একটা হিরের আংটি ; অত জিনিসের মধ্যে টেরও পাবে না তুমি। একজন আমাকে দিয়েছিল।'

'এ-সবই তো তোমাকে কেউ-না-কেউ দিয়েছিল ?'

'সেইজন্যেই তো ওগুলোর উপর আমার এত মায়া। সমস্ত জীবন ভরে কত লোকের ভালোবাসা কুড়িয়ে এত-সব জিনিস উপহার পেলাম—আর তুমি হঠাৎ এসে এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ! আর সব নাও—কিন্তু ঐ আংটিটা কি দিয়ে যেতে পার না ? ওটা যে দিয়েছিল, তাকে আমি ভারি ভালোবাসতাম।'

'ভালোবাসতাম!' লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। 'ভালোবাসার কথা তোমার মুখেই মানায়!'

'যেন তোমার মুখেই মানায়! কী জানো তুমি ভালোবাসার ? কখনো ভালোবেসেছ কাউকে ?'

'হয়েছে, এখন থামো।'

'না, কক্ষনো বাসোনি। তাহলে আমার এ-কথাটা তুমি রাখতেই। ওগো—এত করে বললাম—'

'ওগো-টোগো বোলো না, বলছি।'

'থুড়ি—ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এত জিনিসের মধ্যে সামান্য একটা আংটি রেখে গেলে এমন কী ক্ষতি হয় তোমার!'

'নাও—এবার ঐ বাক্সটা খোলো তো।'

'কোনটা ? ঐটে ? ওটা খুলে কী হবে—ওটাতে কিছু নেই।'

'কিছু-নয়টাই দেখা যাক।'

'বেশ।' চন্দনকাঠের একটা বাক্স—চাবিও ছিল না। টানতেই ডালা উঠে এলো। 'এটার ভিতর সব চিঠিপত্র! প্রেম-পত্র। এগুলো কি তোমার কোন কাজে লাগবে ?' ললিতা বাক্সটা তুলে এনে টিপয়ের উপর রাখল। 'আঃ—' ভিতরের চিঠিগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে—'এগুলো দেখে কত কথাই যে মনে পড়ে! কত বাবু এলেন—আর গেলেন।'

'সবাই তোমাকে চিঠি লিখত ?

'ঝুড়ি-ঝুড়ি। সব কি আর রাখা যায় ? যাদের সঙ্গে খুব বেশি প্রণয় ছিল, তাদের চিঠিগুলো সব আছে।'

'কেন রেখেছ ?'

'এমনি—মাঝে-মাঝে দেখতে বেশ মজা লাগে।' ললিতা বাক্স থেকে একটা খাম বা'র করল। 'এটা কার ?…ও—' চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরল ললিতা। লোকটা ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল।

'ওগো তুমি অত কাছে এসো না। আমার বড্ড ভয় করে।'

'ছি ছি। বলে লোকটা সরে গেল।

'ছি ছি কেন ?'

'কী-সব লিখেছে !'

'এ আর কী ! আরো কত সব আছে। ভারি রসিক ছিল ছেলেটা বড়লোকের ছেলে, কলেজে পড়ত। দেদার টাকা উড়িয়েছে এখানে। গুণ-যোগ্যতাও ছিল কিছু। গান গাইতে পারত—পদ্য লিখত, কাগজে ছাপা হত সে-সব, আমাকে দেখাত এনে। একবার আমার নামে মুখে-মুখে ছড়া কেটেছিল, এখনো মনে আছে—

ওগো ললিতা—
প্রাণের প্রদীপে মোর
তুমি সলিতা।

তুমি সলিতা—ভারি মজার, না ?' ললিতা হেসে উঠল।

'হুঁ, এই হচ্ছে কলেজে-পড়া বড়লোকের ছেলে।'

'এখন ডিপটি হয়েছে শুনলাম। ওরই আবার এক বন্ধু এসেছিল, কথায় কথা উঠল—বিয়েও করেছে। বি এ. পাশ বৌ। ভারি মজা লাগে ভাবতে—কত ছেলে যে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল—' মুহূর্তের জন্য ললিতা যেন অনেক দূরে চলে গেল। 'তা দ্যাখো', উপস্থিত সময়ে ফিরে এসে ললিতা বলতে লাগল, 'এই চিঠি-গুলোও তুমি কাজে লাগাতে পার।'

'কী করে ?'

'তা-ও বুঝতে পারছ না ? ধরো এই চিঠিগুলো যদি তোমাকে দিয়ে দিই—ডেপুটি-সাহেব নতুন বিয়ে করেছেন, ব্যাপারটা জানাজানি হোক তিনি তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। আর তার জন্য অমন দু-পাঁচশো টাকা কি তোমায় দিয়ে দেবেন !'

'ছি ছি—আমি বুঝি তা-ই করতে যাব ! এ তো blackmailing।'

'তা ইংরিজিতে ওকে যা-ই বলুক, এ করে তুমি পয়সা কিন্তু পেতে পার—যদি পয়সাই চাও !'

'যদি চাই ! কে না চায় ?'

তাহলে তোমাকে যখন টাকা দিতে চাইলাম—নিলে না কেন ? আমি ভাবলাম তোমার বুঝি গয়নাগুলো দিয়েই বিশেষ কোন দরকার, তাই তুমি ওগুলো নিচ্ছ।'

'দরকার আর কি ! ওগুলো ভাঙিয়ে তিরিশ হাজার টাকা করে নিতে কতক্ষণ !

'ওমা তুমি ওগুলো বেচতে যাবে নাকি ? বলিহারি বুদ্ধি তোমার !'

'দ্যাখো—মুখ সামলে কথা বোলো।'

'তুমি কি মনে করছ ওগুলো কোথাও নিয়ে বেচতে পারবে? তুমি কি মনে করেছ আমি পুলিসে খবর দেব না? তুমি কি মনে করেছ যে ও-রকম গয়না সবারই থাকে যে তোমার হাতে তা দেখামাত্র যে-কেউ সন্দেহ করবে না?'

'তুমি কি মনে করেছ তোমার লেকচার শুনতে আমি এখানে এসেছি?'

'শুনলেও ক্ষতি নেই। আমার কাছে তোমার অনেক শেখার আছে। তোমারই ভালোর জন্য বলছি—তুমি যদি ওর একটি গয়নাও বেচতে যাও, অমনি হাতে-হাতে ধরা পড়বে, আর পত্রপাঠ জেল।'

একটু চুপ করে থেকে লোকটা বললে, 'তা-ই বা মন্দ কী? তবু তো জেলে গেলে খেতে পাব।'

'কেন, এমনিতে তুমি কি খেতে পাও না?'

'ও-সব কথা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'থাক, থাক,' ললিতা অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'তোমার ইচ্ছা না-হলে কিছু বোলো না। আহা—যে দিন-কাল পড়েছে—দেশে এমন টানাটানি আর কখনো হয়নি।

'থাক, তোমাকে আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না। অভাবের তুমি কী জানো? কত জমেছে, তোমার ব্যাঙ্কে? লাখ-খানেক?'

'পাগল! অত কী করে হবে? তবে অল্প-স্বল্প কিছু যে নেই, তাও নয়।'

'তুমি যে দিব্যি পাপের পয়সা জমিয়ে যাচ্ছ—এদিকে কত লোক যে ভালো করে দু'বেলা, খেতে পাচ্ছে না, সে খোঁজ রাখ? বলতে পার, কী অধিকার আছে তোমার এত টাকা ভোগ করবার? মরে গেলে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোকও তো তোমার নেই। কী হবে তখন তোমার এত টাকা দিয়ে?'

সে-কথা যে আমিও না ভেবেছি, তা নয়! একটা ছেলেকে পুষ্যি রাখব ভাবছি, এমন-একটা ছেলে, সংসারে যার কেউ নেই টেই? সে-রকম কারো খোঁজ দিতে পার?' একটু পরে ললিতাই আবার বলল, 'খোঁজবার আর দরকার কী। এই তো তুমিই আছ। তুমি—হবে আমার ছেলে?'

'যাওঃ!'

'যাওঃ কেন? হও না।'

'রসিকতা, না?'

ললিতা হেসে উঠল!—'ওঃ, ছেলেমানুষ! একেবারে ছেলেমানুষ!'

'দ্যাখো, ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ কোরো না বলে দিচ্ছি। তোমার বয়স কত শুনি?'

'ওগো ছেলেমানুষ, এ-ও কি জানো না যে মেয়েমানুষকে কখনো তার বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই?'

'যাও—যাও—তোমার বয়সের বা অন্য-কোন বৃত্তান্ত জানবার কৌতূহল আমার নেই। আমার যে-বিষয়ে কৌতূহল আছে, তা হচ্ছে তোমার টাকা। শোনো—'(খুব গম্ভীরভাবে)—'তুমি তখন যা বলেছিলে, সত্যি?'

'কী বলেছিলাম ?'

'সেই চেক লিখে দেবার কথা ! সত্যি আমাকে দিয়ে দেবে টাকাটা ! খবর দেবে না পুলিসে ?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিনবার বললাম ! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' ললিতা লোকটার হাতের উপর হাত রাখল।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে লোকটা বললে, 'তাহলে লেখ শিগগির। পাঁচ হাজার টাকা।'

'পাঁ চ হা জা র ?—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। শিগগির। তোমার গয়না-টয়না সব রইল—ও আমি চাইনে। আমার দরকার টাকার। তোমার পাপের বোঝা খানিকটা হালকা করে দিয়ে যাচ্ছি—ভালোই হল তোমার।

'আমি করব পাপ, আর তুমি তার পুণ্যফল ভোগ করবে। মন্দ নয় ব্যবস্থা।'

'তোমার হাতে টাকাগুলো মিছিমিছি পড়ে আছে, 'আমার হলে সেগুলো কাজে লাগবে। সুতরাং আসলে ও-টাকা আমারই। কোথায় তোমার চেক-বই বার করো !

'ঐ ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে চেক-বই আর কলম আছে—নিয়ে এসো না।'

'তুমি যেতে পার না, না ?'

'বড্ড ভয় করছে যে—তোমার পিস্তলটা—'

'কিছু ভয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব, কিন্তু তোমাকে ছোঁবও না।'

'ছোঁবেও না ! একেবারে ভীষ্ম—'

'ফের ফাজলেমি !

'আর করব না—অভ্যাসের দোষ। কিন্তু তোমার পিস্তলটা একটু নামাও না—যদি ধর কোনরকমে ছুটে গেল—'

'কী ঘ্যানর-ঘ্যানর করছ ! এটা সত্যিকারের পিস্তল কিনা যে ছুটে গিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে !'

খানিকক্ষণ ওলোট-পালোট, অস্ফুট দু'একটা চীৎকার। তারপর ললিতা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটা মেঝেতেই বসে আছে: সেই আগুনের রঙের শাড়িটা দিয়ে তার দু'হাত পিঠ-মোড়া করে বাঁধা। একটু দূরে তার পিস্তল আর মুখোশ পড়ে আছে। ভারি কাঁচা মুখ—আঠারোর বেশি বয়স মনে হয় না। ভালো করে যেন দাড়িগোঁফও ওঠেনি। কালো-কালো চোখ। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে পড়েছে। আশঙ্কায়, হতাশায় বিমর্ষ গম্ভীর মুখ ! স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে সে তাকিয়ে।

ঘরের এক কোণে একটা টেলিফোন ছিল; ললিতা আস্তে-আস্তে সেখানে গিয়ে মৃদুস্বরে জিগেস করলে, 'এইবার ডাকি তাহলে পুলিশ ?'

লোকটা তার কালো-কালো চোখ তুলে একবার ললিতার দিকে তাকালো; কোন কথা বললে না।

'যদি কিছু মনে না করো—' ললিতা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো।

'না, না' সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা চীৎকার করে উঠল, 'না, না।' দু' পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে টলতে-টলতে সে উঠে দাঁড়াল—তার পিঠ একটু বেঁকে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—মুহূর্তের মধ্যে সে ললিতার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে মস্ত লম্বা শাড়িটা লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা লেজের মতো গড়াচ্ছে।

ললিতার তীব্র-চোখ লোকটাকে বিদ্ধ করল।—'বারণ করছ পুলিস ডাকতে?'

লোকটি মাথা নিচু করে চুপ।

'নিজেই তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব তাহলে? কী হবে তোমার শাস্তি?' ললিতা ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল।

'তোমার যা খুশি তা-ই করো,' নিষ্প্রাণ স্বরে লোকটি বললে, 'বোকা আমার মতো বোকা আর হয় না।'

'সে-কথা মনে করবার কোন কারণ নেই, ভাই,' মিষ্টি হেসে ললিতা বললে, পুরুষ মানুষ যদি মাঝে মাঝে বোকাই না-বনবে, তাহলে আমাদের চলবে কী করে, বলো!'

লোকটি কথা না-বলে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। 'দুঃখের বিষয়', তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ললিতা বললে, 'তোমার পক্ষে এখন পালানো শক্ত। জোর যদি করতে যাও, কিছু লাভ হবে না, বরং চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো বসে থাকো। লাফালাফি করতে গেলে হয়তো হাত-পা ভাঙবে। আচ্ছা,' লোকটিকে চুপ দেখে ললিতা জিগ্যেস করলে, 'তুমি কী করে ঢুকলে এ-ঘরে?'

'পাইপ বেয়ে।'

'পাইপ বেয়ে! মাগো—ভয় করল না তোমার! যদি পড়ে যেতে!'

'যেতাম তো যেতাম। অত ভাবলে কি আর চলে।'

'তাই বলে পাইপ বেয়ে এই তেতলার ঘরে—তোমার এত সাহস, অথচ পুলিসকে তোমার ভয়!

'সাহস! সাহসই বটে। অমন দায়ে-পড়া সাহস অনেকেরই হয়।'

'দায়ে পড়া কেন?'

আমি আর কথা বলতে পারছি না, তুমি যা করবার করো—এই আমি বসলাম।' লোকটি কোনরকম করে একটা চেয়ারে বসল।

'তোমার বসে খুব আরাম হচ্ছে না বোধহয়', ললিতা বললে, 'তা একটু না-হয় কষ্টই হল। এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।'

লোকটি হঠাৎ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠল, 'আমার হাত খোলা থাকলে এ-জন্য তোমাকে চড় বসিয়ে দিতে পারতাম।'

'আর সে-জন্যই তোমার হাত দুটো খোলা রাখলাম না।'

লোকটির উত্তেজনা যেন আর এক ডিগ্রি চড়ে গেল, 'ও-কথা এত শুনেছি যে কাউকে এখন বলতে শুনলেই মারতে ইচ্ছে করে।'

ললিতা খাটের এক প্রান্তে আলগোছে পা ঝুলিয়ে বসে জিগেস করলে,

'কোন কথা ?'

'এই কষ্ট সইবার কথা। চাকরির খোঁজ করে-করে হয়রান—কোথাও কিছু হয় না। বাড়ি-গাড়ি নিয়ে যারা গ্যাঁট হয়ে বসেছে, তাদের কাছে গেলে এই উপদেশ শুনেছি—'কষ্ট করতে শেখ, ছোকরা, এ-ই তো কষ্ট করবার বয়স।' কষ্ট! কতই যেন জানেন ও'র কষ্টের! ইচ্ছে করে—লোকটি হঠাৎ থেমে গেল।

'থামলে কেন? বলো না, কী ইচ্ছে করে তোমার।'

লোকটি যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি ফশ করে নিবে গেল। হতাশভাবে মাথা নেড়ে শুধু বললে, 'না, না।' স্বাচ্ছন্দভাবে একটু নড়তে গিয়ে তার হাতে চোট লাগল।

—'উঃ!

'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, না? হঠাৎ যেন গরমও হচ্ছে।' ললিতা উঠে গিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিলে। হাওয়ায় লোকটার দু-একটা চুল উড়ে-উড়ে তার কপালের উপর এসে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ললিতা বললে, 'কী সুন্দর তোমার চুলগুলো! কিন্তু অমন বিশ্রী করে লেপটে উল্টে রেখেছিলে কেন?'

'দ্যাখো, তুমি যদি—' লোকটি খুব চড়া গলায় আরম্ভ করেই থেমে গেল।

'নাঃ, তুমি যেন কেমন! কোন কথা বলি কি ফোঁশ করে জ্বলে ওঠো। মিষ্টি কথা তোমার যেন মুখেই আসে না!'

'তোমার দু-হাত কষে বেঁধে রাখলে দেখতাম, তোমার মুখ দিয়েই কেমন মধু ঝরে!'

'ও, সে-কথা! তা তুমি যখন আমাকে পিস্তল নিয়ে শাসাচ্ছিলে, আমি বলিনি মিষ্টি কথা?'

'বলেছিলে বইকি। মিষ্টি কথা বলেই তো আমাকে পথে বসালে।—উঃ, কী ভীষণ বোকা আমি!'

'যদি বলো তোমার হাত খুলে দিই।'

লোকটি সন্দেহ-ভরা চোখে ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'বিশ্বাস! লজ্জা করে না তোমার ও-কথাটা উচ্চারণ করতে!'

একটু হেসে ললিতা বললে, 'লজ্জা-টজ্জা থাকলে কি আর আমাদের চলে ভাই!'

সত্যি নেইও।' তীব্র মুখভঙ্গি করে লোকটি বললে।

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে কিন্তু মন্দ লাগে না, কিন্তু এমন বিশ্রী তোমার মেজাজ!'

'আর বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে।' একটা হাই তুলে লোকটি বললে, 'পুলিশ ডাকতে হয় ডাক—আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'পুলিশ এসেই তোমার ঘুমের চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে নাকি?'

'বসে-বসে আর বকর-বকর করতে হবে না তো।'

'কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে যখন দেবে মার—'

'ইস, মারবে কেন? ভদ্রলোককে কখনো মারে?'

'চোর আবার কখনো ভদ্দরলোক হয়?'

'দ্যাখো, চোর-চোর বলো না, বলছি।'

'নিশ্চয়ই বলব। চোরকে চোর বলব না! চোর! চোর!

'আমি চোর নই! আমি চোর নই! (চীৎকার করে)

'নাঃ, চোর হবে কেন? রাত চারটের সময় পাইপ বেয়ে এমনি একটু শখ করে আমার ঘরে উঠে এসেছিলে। তবু যদি পিস্তলটা সত্যিকারের হত!'

খোঁচা খেয়ে লোকটা এক লাফে উঠে দাঁড়াল। নানারকম মুখবিকৃতি সহকারে হাত দুটো খোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বলতে লাগল, 'তুমি! 'তুমি চোর! তুমি যা করো তা ও তো চুরি! স্রেফ চুরি!'

ললিতা একটু লাজুক-লাজুক ভাবে বলল, 'আমি মন চুরি করি, আর কিছু না।'

'উঃ, অসহ্য! অসহ্য!'

'ও-রকম ধেই-ধেই করে লাফাচ্ছ কেন? নিচে রাসমণি শোয়—সে হয়তো জেগে উঠবে।'

ললিতার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা পড়ল। ভীত মেয়েলি গলায় শোনা গেল—দিদিমণি, ও দিদিমণি।' মুহূর্তের মধ্যেই ললিতার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। ত্রস্তভাবে সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর চট করে উঠে এসে লোকটার হাত খুলে দিতে-দিতে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'যাও—শিগগির খাটের নিচে ঢোকো গে।'

লোকটা হাত ছাড়া পেয়ে পরম আরামে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেল, 'দিদিমণি, ও দিদিমণি।'

'যাও', ললিতা লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে তীব্রস্বরে বললে, 'শিগগির যাও!'

লোকটা কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচের অন্ধকারে অদৃশ্য হল। স্তূপাকৃত লাল শাড়িটা লাথি মেরে মেরে ললিতা তার পিছনে পাঠিয়ে দিলো, তারপর একবার মুখের উপর হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে জিগেস করলে, 'কী হয়েছে, বিন্দি? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

'কী হয়েছে, দিদিমণি?

'কী হয়েছে?' ললিতা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'আমিও তো তোকে সে-কথাই জিগেস করছি। তোর হয়েছে কী?'

বিন্দি ঘরের ভিতরে একবার তাকিয়ে বললে, 'তুমি চোর-চোর বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে না গো?

'চোর! মাথা-খারাপ হয়েছে নাকি তোর? কী যে বকছিস!'

'ওমা, আমি যে স্বকর্ণে শুনলুম গো। শুনে উঠে এনু। তুমি চ্যাঁচাচ্ছ – চোর চোর—আর একজন মোটা গলায় বললে, আমি চোর নই, চোর নই—এ যে পষ্ট শুনলুম।'

'তোর মাথা! ছাইভস্ম কী স্বপ্ন দেখেছিস তার ঠিক নেই, এখন মাঝ-রাত্তিরে উঠে জ্বালাতন করছিস আমাকে।'

বিন্দি একটু দ্বিধার স্বরে বললে, 'না দিদিমণি, স্বপন নয়। আমার বুকটা যে এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে গো।'

'যা যা, আর বকিসনি—শুয়ে থাক গে। ঘুমটা ভাঙালি তো আমার।

'আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে যাব কেন গো? ভালো মনে করে উঠে এনু। দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে—'

'নে, হয়েছে, কাল সব শুনব। এখন ঘুমোতে দে?'

বিন্দি তবু একটু অপেক্ষা করল।—'তুমি কিছু শোননি, দিদিমণি? কিচ্ছু না?'

'কই, না তো। তারপর অনাবশ্যকভাবে বললে, 'আমি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম।

'যাক – ভাগ্যিস কিছু নয়, দিদিমণি। একবার ভাবো দিকি—'

'হ্যাঁ, ভেবেছি; তুই এখন যা তো,'

দরজাটা আবার বন্ধ করে ললিতা খাটের কাছে গিয়ে ডাকল, 'বেরিয়ে এসো।'

শুড়শুড় করে বেরিয়ে এলো লোকটি।—দেখলে তো কাণ্ডটা! ললিতা বললে, 'খুব চ্যাঁচাও আরো—পাড়াসুদ্ধ সব ছুটে আসুক।'

'আমার দোষ হল?' খুব ক্ষীণস্বরে যেন ভয়ে-ভয়ে লোকটি জবাব দিলে, 'চোর-চোর বলে চ্যাঁচালে তো তুমিই।

ললিতা হেসে উঠল।—'তোমাকে চটাতে এমন মজা লাগে!' তারপর লোকটির দিকে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে; 'কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে। ঠিক যেন সঙ।' ললিতা হেসে উঠল আবার।

লোকটি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। ললিতা জিগ্যেস করলে, 'কেন পরেছিলে তুমি ওসব? পাইপ বেয়ে উঠতে সুবিধে হবে বলে?'

লোকটি চুপ করে রইল।

'বেশ, যেমন এসেছিলে তেমনি এবার পাইপ বেয়ে নেমে যাও। কতক্ষণ আর তোমাকে নিয়ে রাত জেগে বসে থাকব?'

'না, না। পাইপ বেয়ে আমি কিছুতেই নামতে পারব না।'

'পারবে না? উঠতে পেরেছিলে কী করে?

'কী করে পেরেছিলাম? তাই তো। নিজেই এখন সে কথা ভাবছি।

'সে কথা বললে চলবে কেন? উঠতে যখন পেরেছিলে, নামতেও পারবে। নামতেই হবে তোমাকে।'

'না, না', লোকটির স্বর এবার ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, 'পারব না। কিছুতেই

পারব না। আমি ঠিক পড়ে মরে যাব। দয়া করে আমাকে সিঁড়ির পথটা একটু দেখিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

'বা রে আবদার! এখন আমি হাঁকডাক করে দারোয়ানকে জাগাতে যাই আর কি। দারোয়ান যদি মনে করে, তোমার মতো পোষাক নিয়ে কোন লোক আমার কাছে আসে, তাহলে কি আর আমার মান থাকবে।'

লোকটির মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল।—'তাই তো—'

'তাই তো তাই তো করে লাভ কী? পাইপ বেয়েই নামতে হবে তোমাকে!'

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লানমুখে বললে, নামতে যদি হয়ই তো নামব। এক্ষুনি।'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি।'

'আচ্ছা! লোকটা অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করল। 'এক গ্লাস জল দিতে পার আমাকে?'

'তা আর পারিনে। জল খাবে?'

'জল খাব।'

'না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু আবার কী?'

'এই যেমন, হুইস্কি—'

'না, না, ও-সব কিছু না।'

'না কেন? হুইস্কি খেয়েছ কখনো?'

'না।'

'তাহলে দ্যাখো না একটু খেয়ে।'

'না, জল।'

ললিতা ঘরের কোণের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে দিলে।

লোকটা ঢকঢক করে সবটা জল খেয়ে বললে, 'আঃ।' তারপর আস্তে-আস্তে—যে-জানলা দিয়ে সে ঢুকেছিল, তার দিকে পা বাড়াল!

'ও কী, চললে?'

'হ্যাঁ।' একটু পরে: 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

হঠাৎ ললিতা বলে উঠল, 'এই—'

লোকটা ফিরে তাকাল।

'—তোমার জিনিস যে ফেলে যাচ্ছ।'

'কী জিনিস?'

'তোমার পিস্তল—আর মুখোশ।'

'ও থাক গে।' বলে লোকটি আবার পা বাড়াল। 'কী হবে আর নিয়ে?'

'আমারই বা কী হবে রেখে? কেউ দেখলে যদি জিগেস করে, তখন বলবই বা কী?'

'ফেলে দিও।'

'ফেলবই বা কোথায়? না, তুমি নিয়েই যাও।' ললিতা জিনিস দুটো কুড়িয়ে আনল।

'আচ্ছা দাও, নিয়েই যাচ্ছি।' লোকটি ফিরে ললিতার কাছে এসে সেগুলো নিতে যাবে এমন সময় প্রকাণ্ড হাড়-ভাঙা হাই এসে তাকে বাধা দিল।—'আঃ কী যে ঘুম পাচ্ছে।' কথাগুলো জড়িয়ে গেল তার।

ললিতা তার ঘুমে-ঘোলা চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিগেস করলে, 'আচ্ছা, কেন করলে তুমি?'

'কী করলাম?'

'এই যে—'

'কেন? বুঝতে পার না কেন?'

'টাকার জন্য?'

লোকটি কথা না বলে ললিতার হাত থেকে তার পিস্তল আর মুখোশ নিতে গেল; কিন্তু সে-দুটো তার হাত ফসকে পড়ল মেঝের উপর।

'বা—বাঃ এতই ঘুম পেয়েছে তোমার! এই ঘুম নিয়ে তুমি আবার যাচ্ছিলে পাইপ বেয়ে নামতে।—থাক, ও-দুটো আর কুড়োতে হবে না এখন—না-হয় একটু বসেই যাও। বস না—এখানেই বস।'

লোকটি ভয়ে-ভয়ে আলগোছে খাটের উপর বসল।

মশারিটা চাঁদা করে তুলে ললিতা বসল তার কাছে।—'এইবার বলো।'

'কী?' (অস্পষ্টস্বরে)

'আচ্ছা, তোমার এমন-কী টাকার দরকার হল?'

'টাকার দরকার সবারই হয়।'

'সবাই কিছু পায়ও। কী করো তুমি?'

লোকটি বাঁ হাতের আঙ্গুষ্ঠ তুলে মৃদুভাবে একটু সঞ্চালন করল।

'থাক কোথায়?'

'মেসে।'

'কী করে চলে?'

'চলে না। সেইজন্যেই—'

'ও! তোমার বাবা—?'

বাঁ হাত একবার শূন্যে ঘোরাল সে।

'মা—'

'আছেন এক মা।'

'ভাই-বোন?'

লোকটি আঙুল দিয়ে শূন্যে ঢালু রেখো আঁকলো।

'অনেক বুঝি?'

'অনেক।'

'কোথায় থাকে তারা ?'

'দেশে।'

'সেখানে—'

'এই, কোনরকমে।'

'তুমিই বড় '

লোকটি মাথা ঝাঁকাল।

'আর কেউ নাই তোমাদের ?'

লোকটি মাথা নাড়াল।

'হুঁ।' একটু চুপ করে থেকেঃ 'বলো না।'

'কী ?'

'সব বলো।'

'সবই তো বললাম।'

'ঐ যাঃ—আসল কথাটাই তো এতক্ষণ জিগেস করা হয়নি। তোমার নামটি কী ?'

'কমল।'

'বাঃ, বেশ নাম, কমল। কমল, কমল।' ললিতা দু'একবার নামটা নিজের মনে পুনরাবৃত্তি করলে।

'ডাকছ কেন ?'

ললিতা ছেলেটির এলোমেলো চুলগুলিতে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে বললে, 'কমল।'

'উঃ, কী শক্ত করেই বেঁধেছিলে হাত ; এখনো টনটন করছে।'

'খুব লেগেছিল, না ? দাও, আমি রগড়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।—না, না, এমনি সুবিধে হবে না। তুমি শোও তো।'

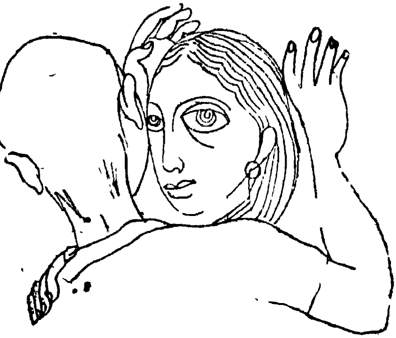
কমল দ্বিরুক্তি না-করে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। ললিতা তার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে কব্জি থেকে আরম্ভ করে আস্তে-আস্তে রগড়ে দিতে লাগল।

'আঃ', গভীর আরামে কমল চোখ বুজল। তার মুখ সদ্য-মৃত লোকের মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ! সেই মুখের দিকে ললিতা তাকিয়ে রইল—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে হল বিছানায় যেন সে শুয়ে আছে নিজে, আর পাশে বসে আছে তার মা—সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে—'মাগো আর পারিনে, মরে গেলাম ; উঃ, মা, মা-গো।' তারপর ভোরের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে, মার হাত তার কপালে মুখে, চুলে···সেই তাদের পাড়াগাঁর বাড়ি, খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা, মাঘের শীতে রাত থাকতে নাইতে যাওয়া, মাঘমণ্ডলের গান, 'ওঠো ওঠো সূয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে'—মা-গো। ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল, তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

ঘুমের মধ্যে কমল পাশ ফিরল।

বারবধূ

সুবোধ ঘোষ



বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায়, তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুশী আলাপের কলরব। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

—শুনছেন। বাইরে থেকে এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর চমকে উঠলো প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মত তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়লো প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললো—যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হলো লতা। শিগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—আমাকে মিছে ভোগাও কেন? আমি ওসবের কি ধার ধারি?

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে তেমনি নিবিষ্টমনে সিগারেট খেতে থাকে লতা। পাশে টেবিলের ওপর একটা বীয়ারের বোতল আর চাবি, তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমী শাড়ী এলোমেলোভাবে লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোতে সবেমাত্র বৈঠক তখন বসেছে।

—অন্যায় করছো লতা। ওঠ লক্ষ্মীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটু ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে দোষ কি? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর, অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠলো। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বীয়ারের বোতলটা আলমারিতে তুলে বন্ধ করলো। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড় বড় ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলো। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো প্রসাদ, কোথাও কোন অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যদি বা লুকিয়ে থাকে। হাঁ, ঐ পর্দাটা—জরির কাজ-করা এক জোড়া বিলিতী নগ্নিকা বাতাসের

দোলায় কুৎসিতভাবে ঢলাঢলি করছিল তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ—এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি…।

লতা—নাঃ, আর পারি না। তোমার ভদ্দোরপনার ভড়ং রাখতে গিয়ে বার বার বাইরের লোকের কাছে ঢঙ দেখাতে পারবো না। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর-বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হতো।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়হীনতায় শ্লথ হয়ে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখের চেহারাটা যেন বলছে—জোর করছি না। দয়া করে উদ্ধার কর।

ফিক করে হেসে ফেলে লতা। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে—ভুডু খাবে খোকা? ভদ্দোরলোকের ভয়ে বুক দুর দুর করে, মেয়েমানুষ রাখার শখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি—দুই-ই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর শাড়ি আলনা থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বন্ধ নিঃশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক ছ'সাতটি প্রৌঢ়া ও তরুণী আর গোটা দশেক ছোট ছোট মেয়ে মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতো আর স্যাণ্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ হুটোপুটি, শাড়ি আর আঁচলের খস্‌খস ফিস্‌ফাস্‌ শব্দ, চুড়ির নিক্কণ, পাউডার ও এসেন্সের একটা সুবাসিত ঝড়, তার সঙ্গে বৃদ্ধ প্রৌঢ়দের চুরুটের ধোঁয়া আর হাতছড়ির ঠুকঠাক—বাইরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সজ্জনতার উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়লো। প্রসাদ হাসি মুখে নমস্কার জানায়—আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কেতাদুরস্তী ভদ্রয়ানার বালাই নেই। অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখালবাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে প্রসাদের খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামত চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা র‍্যাকেট থেকে একটা গোটানো সুতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নেয়, মেঝের ওপর পাতে এবং বসে পড়ে।

এক যুবক আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে এক বৃদ্ধ-আগন্তুক বললেন।—এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও, রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে - সত্যি মশাই, আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতই এখানে চেঞ্জে এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা, এ ছাড়া আর কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কি করে দল ভারি করি, আর আপনি বেমালুম আড়ালে লুকিয়ে আছেন?

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার করে নিল—হ্যাঁ, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বললো আভা, রণজিতের বোন।

—বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারি করে ফেললে। আমরা কি করি? ভেতর থেকে তো কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে বলে।—একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আসছেন।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো লতা।

চাওড়া-পাড় একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে লতা। ঘরে ঢুকে সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় লতা, মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে সামনে নামিয়ে দেয়। লতার সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণের ভীরুতা ও কাতরতার খিন্ন ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্তায় সহজ স্ফূর্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

রণজিতের বোন আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার ওপর বসাবার জন্য একবার টানলো। লতা বললো—ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অবধি গল্প তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চললো অনেকক্ষণ। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধালো। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করলো আরও বেশি। আজ দেড় মাসের মধ্যে বরাকর কলোনির একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়িটার কোন সন্ধ্যা আজকের মত এত হর্ষমুখর হয়ে ওঠে নি।

অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করার জন্য লতা খাবার তৈরী করবার উদ্যোগ করে। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে—শুধু চা হলেই হবে, খাবার টাবার করবেন না, খবরদার!

লতা বলে—কিন্তু ছেলেরা কি খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা রাগ করেই বলে—দেখছেন তো' ওদিকে মশাই কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকের কাজের জন্য কোন হুঁশ নেই, একটু খোঁজ-খবরও নেই।

মেয়েরা হেসে উঠলো সবাই—তা বেশ করেছেন, আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বলে—বৌদি রাগ করছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি এখানে গল্পে ডুবে আছেন?

প্রসাদ—কেন কি ব্যাপার?

আভা—স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্‌ফিস্ করে লতা বলে—চা না হয় হলো, কিন্তু ছেলেপিলেদের কি দেব? তুমি একবার বাজারে ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি টিষ্টি···।

আভা এবং আরও দু'টি তরুণী ঐ মৃদু ফিস্‌ফিসের ভাবার্থ বুঝতে পেরেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে—বৌদি বড় বাড়াবাড়ি করছেন !

প্রসাদ বলে—বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না ? নইলে বাজার যেতে হয়।

লতা বলে—তাইতো, মনে ছিল না। যাক, ওতেই হবে।

বিস্কুটের টিন শূন্য করে দিল ছেলের দল। মেলামেশার পালা ক্ষান্ত হলো রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হলো গান, ঘরের কোণে শালুর খোলে ঢাকা এসরাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিল।

রাখালবাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখালবাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসীমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। তাঁর ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারকবাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা আবার ঠুকলেন। আভা ছাড়া সঙ্গের আর তিনটি মেয়েই হলো তাঁর ভাগ্নী, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন হলো রাখালবাবুর নাতি, বাকী সবকটি হরিশবাবুর। হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত। তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখালবাবু বললেন।—তা হলে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদবাবু। রাত হলো অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপবার্তার কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠলো। প্রসাদ ফটক পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মত।

চলে গেল আগন্তুকের দল।

—আঃ বাঁচা গেল ! বীয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামালো প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার, তাই বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্তি চড়ে উঠেছে—একি ? উঠে বসো লতা, এ সময়ে বে-রসিকতা করো না মাইরি !

লতা কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকে। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে এবং রুক্ষস্বরে বলে—যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ—বেশ বেশ, করবো না। যাও, এবার চটপট এই আলতো ফালতো সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক জুত করে।

লতা—এ রকম ক্যাংলাপনা করছো কেন ? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের শাড়ি ছাড়লো, আলতা সিঁদুর মুছে ফেললো। আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলো।

প্রসাদ খুশীতে আটখানা হয়ে গেল—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না ; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিটমিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। নিকটেই একটা নামহীন ফুলের গাছের তলা থেকে স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়, আস্তে আস্তে ছাড়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক ভাঙলো। দ্বিতীয় বীয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়। তারপর বিড়বিড় করে বলে, স্বর জড়িয়ে যায়—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরেতে বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়। এতগুলি ভদ্র নরনারীকে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিশ দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু ······কিন্তু তুমি আমাকে এইমাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে ।

টেবিলটা একট ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘষে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লতা শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ়স্বরে বলে—হঠাৎ এত মেজাজ জেগে উঠলো কেন? বসো বলছি!

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করেই এ-রাগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়, অথবা দুটো খেউড় গেয়ে ওঠে, তবে ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উঠতে কতক্ষণ।

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে বড় বড় চোখ করে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গি নিয়ে বলে—যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা—বলছি তো তাই থাকবো।

প্রসাদ—তবে এত পোজ করছো কেন? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা—তা তো জানিই।

প্রসাদ—তুমি আমার চাকরানি হবার যোগ্য নও।

হঠাৎ যেন আগুনের ঝাপটা লেগে লতা ছটফট করে উঠলো। এতক্ষণ প্রসাদের বকাবকিকে নেশাড়ে মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করে ছিল লতা। কিন্তু এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে যেন একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়াল মাত্র। ছোবল আর পড়লো না।

—তোমার কাছে বাঁধা থাকতে কোন গরজ নেই আমার। আমি কালই চলে যাব তারকেশ্বরে। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে দরজার খিল এঁটে দিল।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠলো আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভালমানুষী ভীরুতা যেন আবার সতর্ক হয়ে উঠেছে। লতাকে সে ভাল করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি করে চলে। বাইরের আঙিনা যেখানে আত্মীয়তার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মত দুর্বোধ্য। তার মর্যাদা দেবার কোন দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান মর্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনির প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে!

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বলে—লতা, বল তুমি রাগ কর নি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল, তা না হলে এখান থেকে নড়বো না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে থাকে, ঘরের ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব আসে—না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

চাচিজী!

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লতাকে ডাকছে বিক্রম, সুবেদারবাবুর ছোট ছেলেটা। মেজের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে খর্‌ খর্‌ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রসাদ বুঝলো ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যুষে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাঁউরুটি খায়। তারপর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটি দিয়ে একটা কেল্লা তৈরী করে, পেঁপে ডাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যায়।

ভাঙা স্বপ্নের মত গত রাত্রি'র ঘটনার ছবিগুলি যেন জাগ্রত চেতনায় আবার জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রসাদের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পেরেছে—পাশের ঘরে, লতা জেগে উঠেছে, কাপড় চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা! বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায়, লতা বলছে—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বলে—কিত্‌না নিঁদ যাতি হো চাচিজী।

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তার পর? তার পর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তার পর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মত সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে ঘি-ময়দা বের করছে। তার পর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে সমস্ত দিন ধরে এই নিষ্ঠাশীল ও নিয়মিত কর্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন

নিজের দমেই চলে। প্রসাদের মনও যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মত এই খাপছাড়া মুহূর্তগুলির চাকার ওপর দিয়ে ধৈর্য্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, গন্তব্য এসে পেঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ির হাওয়া থেকে যেন উবে যায়।

বিক্রম চলে যায়, এবং যেতে না যেতে হয়তো লালাবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্বসংসারের কাহিনী নিয়ে বসেন। লালাবুর জামাইটির চাকরি নেই, মেয়েটা দুঃখে আছে। কাহিনী শুনে লতার মুখ ম্লান হয়ে যায়। দেখে মনে হয়, দুঃখটা যেন লতার মনে বড় বেশি বেজেছে।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন যেন গর্হিত মনে হয়। এত বড় একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে, আলো-অন্ধকারের তফাতটুকুও যে মিথ্যে হয়ে যায়।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল—প্রসাদবাবু, লতাকে আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেসোমশাই।

চিঠি পড়ে অগ্রসর হয় প্রসাদ। দুশ্চিন্তার জাল আরও জটিল হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয়ও করে। এবং কি করবে ভেবে পায় না। ঘরের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দেখতে পায়, বারান্দায় বসে মশলা বাছছে লতা।

আজকের সকালে লতার মনটাও কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয়ও করছে। কিসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না! এ রকম কোন দিন হয়নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে এমন কোন জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে লতা আশ্চর্য হয়, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে একটা ঝগড়া বিতণ্ডা করার মত উৎসাহও যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরী হয় না—এটা ভয় নয়, দুর্বলতা। কিন্তু দুর্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে? দিক না, তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেনিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে যেন আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবি করার দুঃসাহস না হয়।

—লতা

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তবু আশঙ্কায় ছমছম করে উঠলো। প্রসাদ এগিয়ে আসতেই লতা মাথা নীচু করে মশলা বেছে চললো কোন উত্তর দিল না।

—রাখালবাবুর বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন! যাবে?

চোখ তুলে তাকাল লতা। আশঙ্কার ঝাপসা পর্দাটা সরে গেল। উত্তর দেয় —যাব।

—যাও, কিন্তু কোন রকম বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সীন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ। যেমন অদ্ভুত তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহু মানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসাদের সন্ধ্যাগুলি বেশির ভাগ আভাদের বাড়িতেই কেটে যায়। লতা যায় রাখালবাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ি। তা'ছাড়া সুবেদার ও লালাজীর বাড়িও আছে। শুধু আজ পর্যন্ত আভাদের বাড়ি লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে। কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুশী হয়ে বলে—সত্যিই তোমার বাহাদুরি বলতে হবে। যেখানে যাই, সবাবই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না। কি চালই চেলেছ লতা!

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—দেখো, বেশি বাড়িয়ে তুলো না যেন!

লতা—বাড়িয়ে তুললে তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেলে—সত্যিই কি যে কাণ্ড হচ্ছে! এক এক সময় যা ভয় করে আমার! যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কি ব্যাপার হবে বল তো?

লতা—আমার আর কি ছাই হবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাব।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কি যেন ভাবে, তারপর অন্যমনস্কের মতই বলতে বলতে চলে যায়—হাঁ, তোমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু···

আভা আরও দু'তিন দিন প্রসাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। আভা কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ হৃদ্যতা তার মধ্যে আর ছিল না। পরিচয় যত পুরনো হয়েছে, ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজ ভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতাও, কিন্তু তাল কেটে গেছে বার বার। লতা চা এনে আভার সামনে ধরেছে, আভা আপত্তি করেছে, কিন্তু সাধাসাধি করতে পারে নি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেড়িয়ে এসে দেখে প্রসাদ তখনও ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে—লতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়িতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক-একবার ওঠে। মাসীমা বলেন—মেয়েটা বড় শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা, নিভা প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবৌদি

বেচারা সত্যি ভালমানুষ। আভা মিছিমিছি ওর নিন্দা করে।

মাসীমা গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করেন—আভা কি বলেছে?

মমতা—লতাবৌদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো, গাঁয়ের মেয়ে।

মাসীমা চটে উঠলেন—আভা নিজেকে কি মনে করে? ভয়ঙ্কর বিদুষী? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস, বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না!

নিভা প্রভা হেসে ওঠে। আভার ওপর মাসীমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে, মাসীমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজীর স্ত্রী এসেছেন। লতা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে! বাইরের ঘরে গল্প করে প্রসাদ, আভার সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বলে—অপনার কোন ভয়ডর নেই, প্রসাদবাবু!

একটু পরেই দেখা যায়, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজীর স্ত্রী বোকার মত লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন—ও ছোক্‌রি কে লতা? ওর চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও, লতা।

লতা বলে—আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে, আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজীর স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন—তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত বেজে ওঠে? হেসে ফেলে লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারকবাবুর বাড়ি তাই আজ লতা ও প্রসাদের নেমন্তন্ন ছিল। সব মেয়েদের মত লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান গল্প ও টাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসলো। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখতে পায়, প্রভারস্বামী লতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়লো।

পথে আসতে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বলে—সত্যি বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দেয় না।

প্রসাদ বলে—এই পাপ আমার লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুশী হতে পারতো লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড় করে তুলুক, লতা তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের ভেতরটাও শিউরে উঠেছিল সংশয়ে।

প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড় ফাঁকি দেওয়া পাপ বৈকি। সে

পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য?

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশি করে হাসি পায়, প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়লো। কথার খাপছাড়া ভঙ্গিতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই!

প্রসাদ বলে—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও তুমি বড় শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমাকে কেউ দেখতে আসে না। তবে এখানেও ক'নে বউটি সেজে থাক কেন?

লতা—কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ—আমি না ডাকলে তোমার তাতে কি আসে যায়? দরকার থাকলেই ডাকবো। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। তোমার এত কষ্ট করার দরকার নেই।

লতা—তোমাকেও কোন উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকবে।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করলো ঠিকই, কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোন মুক্ত আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটা যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার একটা মেকী আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক, তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব বাধা ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন, যাক না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কি? লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠছিল। চোরাবালির ওপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বের হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার মত আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে, শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতাও সবেমাত্র বেড়িয়ে ফিরেছে।

প্রসাদ ঘরের ভেতর চিন্তিতভাবে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একটা কৌতুক যেন বিভীষিকা হয়ে চারদিক থেকে তাকে চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পরে প্রসাদ আজ আবার কথা বললো—তুমি বড় বেশি বাড়াবাড়ি

করছো, লতা। আভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায় ?

লতা—নিন্দে ? আমি আভার নামে কোথাও তো কিছু বলি নি।

প্রসাদ - সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হলো।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। মেজাজও আগের মত দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মত অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ম ও শান্ত।

লতা—বল, কি করবো ?

প্রসাদ—না তোমাকে দিয়ে আর বেশি নাটুকে খেলা করতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভাল ভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ, চিরকালই তো এমনি ভাবে চলতে পারে না, তাতে তোমারই বা লাভ কি ?

চুপ করে শুনতে থাকে লতা।

প্রসাদ যেন আরও একটু শক্ত হয়ে উঠলো—তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় তুমি কি বস্তু ? তাহলে আমি কোথায় থাকি ? তুমি আমার মানমর্যাদার চাবি কাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে, তোমার মেজাজ মরজির জন্য সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, এ হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে, কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মত যুক্তি তার নেই, তার সে শিক্ষা দীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও হয় নি।

প্রসাদ বলে—তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি, আরও কিছু দেব।

লতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু, তারপর আমার চলবে কি করে ?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারালো—সেটা কি আমার ভাবনা ? ভুলে গিয়েছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কি কাণ্ড করেছিলে ? বাক্সপেটরা নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে ? তোমার মত একটা…।

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোন অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনী নয়, ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়—তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচিও আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছো।

প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল—সত্যিই, আমি এভাবে টিকতে পারছি না, লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত, নিঃসহায়ের আবেদনের মত শোনায় কথাগুলি।

লতা বলে—সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে ?

প্রসাদ—হ্যাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি একাই যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিও কিছু, মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

প্রসাদের সম্মুখ থেকে লতা সবেগে ছুটে অন্য ঘরে যায়।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে। তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে, বিক্রম আসবার আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে।

ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে মেজের ওপর নিঝুম হয়ে বসেছিল লতা। উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজছে। আচারের বয়ম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি। আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেলে। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে। যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসীমা বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? তাহ লে ভদ্রলোকের জমকালো সম্মান কোথায় থাকে?

কিন্তু সে যে অসম্ভব! ওভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে লতার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজাতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু, মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক। মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসীমার বেরিবেরি সেরে যাক।

বুঝতে পারে এবং স্পষ্টভাবে কল্পনা করে নিতে পারে লতা, ভদ্রলোকের ছেলে প্রসাদের ভদ্র প্রেমের আবেগ কোন পথে মুক্তি খুঁজছে। এক বছর দু'বছর পরে এ বাড়ির ভবিষ্যতে এই রকমই একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন লোকে শুধু জানবে, লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নূতন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে, এই বাড়ির ঘরে ঘরে আভার সংসারপনার চুড়ি শাঁখা বাজবে ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।

উনি কি করছেন? ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন।

বোধ হয় মতিগতি ফিরে গেছে। কিন্তু একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের উপর চড়ে বসি, চরিত্তিওয়ালার মুরোদটা দেখি একবার। কিন্তু ছিঃ!

তা করতে পারলেও যে ভাল ছিল। কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না, কারণ লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে আজ। জীবনে কোন লুচ্চাকে ছোঁবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। তবে, কড়া এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু মদ? গেরস্তের বাড়িতে মদ? মনে হতেই লতার বুকটা দুরদুর করে ওঠে।

সব সামর্থ যেন খসে পড়ে গেছে, যেন সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে লতা, শুধু একটু ছদ্মনামের গৌরবের লোভে। ঘোমটা আর সিঁদুর, শাঁখা আর নোয়া দিয়ে সাজানো তার নিজেরই ছদ্ম মূর্তিটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে। ভাঙতে পারে না এই মূর্তিকে, ভাঙবার চেষ্টাও করতে পারে না, বোধ হয় চেষ্টা করতেই ইচ্ছা করে না! কোন উপায় নেই।

চোখ দুটো একবার আঁচল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালার রাণী-গুলো বনবাসে যাবার আগে বোধহয় এই রকম কাঁদে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। কিন্তু ঐ লোকটার ওপর যে প্রতিশোধ না নিয়ে যাওয়া যায় না। নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটি প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপতে থাকে লতা।

না উঁচুদরের প্রেমের ঐ অহংকারের ওপর পণ্ডীবিবির ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে, চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিয়ে। ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে; লোকের কানের ভয়ে জোর গলা করে একটা কথাও বলতে পারবে না। বেশ হবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না কোনদিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরনের একটা শঙ্কায় ভরে উঠলো। রাগানো উচিত নয়, বেশ খুশী করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট দেরাজ থেকে বের করে প্রসাদ লতার কাছে একটা আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—এই নাও। আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি।

লতা হাত পেতে নোটগুলি নেয়। চুপ করে বসে থাকে।

প্রসাদ আবার বলে—কি চুপ করে রইলে যে?

মুখ তুলে তাকায় লতা। প্রসাদের হাতের লণ্ঠনের আলো লতার চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রখর হয়ে জ্বলছে তার চোখের তারা; যেন বিবরের অন্ধকার থেকে ফণা তুলে এক বিষধরী তার জীবনশত্রু একটা জীবের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয় পেয়ে কম্পিতস্বরে প্রসাদ ডাকে—লতা!

বোধ হয় আলোর ধাঁধাঁনি থেকে দৃষ্টি আড়াল করার জন্যই হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে নিল লতা। আর, কী আশ্চর্য, সত্যিই যেন এক লাঞ্ছিতা গৃহবধূ; ভীরু অভিমানের এক করুণ মূর্তি; আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়ে লতা বলে না তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।

ট্যাক্সিওয়ালা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী



বিধবা কি সধবা কি করে বুঝব বলুন!

সরু পাড় কি নিপাড় শাদা শাড়ি এখন অনেকেই পরেন। ওটা ষ্টাইল।

আর চুড়ি না রাখা।

সিঁদুর না পরা।

কি এমনভাবে সিঁদুরের টিপ চুলের অরণ্যে লুকিয়ে রাখবে যে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকলে যদি আপনায় মালুম হয় আলপিনের ডগার আঁচড়টি। অনেক সময়ই হয় না।

তাছাড়া মুখখানা প্রায় সব সময়ই বাঁ দিকের পার্টিশত তাক করে ধরে ছিল বলে মেয়েটির সিঁথি নজরেই পড়ছিল না।

চুড়ির বদলে বাঁ কব্জিতে ছোট ছেলেদের মোজার গার্ডারের মত কালো সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। ওর তলে রাখা হাতের সাদা ঈষৎ চ্যাপ্টা সরু কব্জির মাথায় তেঁতুল বিচির মত ঘড়িটা দেখতে দেখতে কেন জানি আমি মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করে ফেললাম। ত্রিশ বত্রিশ? আটাশও হতে পারে।

কি আর একটু কম।

চব্বিশ। বাইশ?

বাইশ হলে খুব কম করে ধরা হত। বস্তুত একদিকে বর্ষার কচি মুলোর মত মসৃণ কোমল কব্জি, আবার অন্য দিকে ওর উপর মাংসল ভারি পা দুটো বয়েস সম্পর্কে মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই হয়। অনেক সময় কোনো মেয়ের চিবুক ও চোয়াল আপনাকে যে বয়সের ইঙ্গিত দেবে, গলা বা ঘাড়ের দিকে চোখ রাখা মাত্র আপনার সেই অনুমান মিথ্যা মনে হবে। চিবুকে যদি চব্বিশ বছর

বয়স লেখা থাকে ঘাড়ের দিকে তাকান মাত্র আপনার মনে হবে—না আরো বেশী, বত্রিশ।

এই ক্ষেত্রে আমি সে ধরনের একটা গোলমালে পড়েছিলাম। চেয়ারের তল দিয়ে মেয়েটির চটি খোলা পায়ের যেখানটায় শাদা লেস পরানো সায়াটা উড়ু উড়ু করছিল (বস্তুত এত জোরে ও ফ্যান্ চালিয়ে দিয়েছিল যে হাওয়ায় তার কামরার ভিতর ঝড় বইছিল) দুবার আমি সে জায়গাটা বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা। অথচ সেই তুলনায় তার হাতটা অনেক বেশী শুভ্র কোমল কচি মনে হচ্ছিল।

সুতরাং হাত যে বয়স বলছিল, পা বলছিল তার উল্টোটা। কিন্তু তাহলেও আমি পায়ের বয়সটা বাতিল করে দিলাম। কেননা ঝড়ো হাওয়ায় মুহুর্মুহু খোঁপা থেকে আঁচলটা যখন খসে খসে পড়ছিল ওর গলা ও ঘাড়ের সুন্দর কোমল বাঁক ও রেখাগুলি দেখে চব্বিশ পঁচিশের বেশী বয়স হবে না নিশ্চিন্ত হতে পারলাম !

আমার এতটা দেখার সুবিধা হত না।

আমি অনেকক্ষণ আগেই চা শেষ করে চুপচাপ বসে ছিলাম। একজন কেউ ভিতরে পর্দা খাটানো কামরায় বসে খাচ্ছে হোটেলে (হোটেল রেস্টুরেন্ট) পা দিয়েই অনুমান করতে পেরেছিলাম। পর্দার ওপারে একজন আছে কি দুজন আছে প্রথমটায় অবশ্য ঠিক করতে পারিনি। এবং ধরতে না পারাটা কাজের কথা না—কোন বুদ্ধিমান যুবকই মেয়েটি একলা এসেছেন না সঙ্গে অন্য লোক আছে, না জানা পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকেন না !

আমি চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে চোখ রেখে এপারে বসে আর একটা কিছুর অর্ডার দিতে তৈরি হতে লাগলাম।

পুরুষ খদ্দেরের গলার শব্দ শুনে কিনা ঈশ্বর জানেন, ও-ঘরের পাখা হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠল। তারপর তো পর্দা কতবার উঠল, কতবার নড়ল, কতবার দরজা থেকে তা সরে সরে গেল। ভিতরের হুকুম পেলেন কিনা বোঝা গেল না যে ছেলেটা আর একবার ভাত নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল পর্দাটা দলা পাকিয়ে পার্টিশনের মাথায় তুলে দিলে !

ভাতের পর দেখলাম আবার ডালের বাটি গেল এক দলা আলু সিদ্ধ।

ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা দো-পেঁয়াজি ইলিশ-ভাতের গন্ধে চারদিক ম-ম করছিল। চপ কাটলেট গ্রীল মোগলাই পরটার অর্ডার পড়ছে অন্য দিকে। বেশ বড় রেস্টুরেন্ট।

কিন্তু সেই ডিশে ও কামরায় ডাল আর আলু ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করল না লক্ষ্য করে সচকিত হয়ে উঠলাম।

এটা অবশ্য কাজের কথা নয়।

অবস্থা ও রুচিভেদে এক একজন এক একরকমে খাওয়া পছন্দ করে। একটা আস্ত সিগারেট শেষ করে আমি একটা চিংড়ি কাটলেট-এর অর্ডার দিলাম। সামনের কামরায় একটি মেয়ে খাচ্ছে আর সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে একটা চেয়ার দখল

করে এমনি বসে থাকাটা অশোভন। কাজেই অতিরিক্ত খরচে নামা গেল।

ছেলেটাকে ডাকলাম।

যে উদ্দেশ্যে গলা বড় করে আমি ছেলেটাকে ডাকছিলাম তাও চরিতার্থ হল। পর পর দুবার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এদিকে তাকায় ও আমাকে দেখে।

একটি মেয়ে সম্পর্কে আমি এতটা উৎসুক কেন, আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভাবছেন লোকটা অভদ্র ইতর।

আসলে কিন্তু আমি তা না। আমি ট্যাক্সি চালাই। যারা ট্যাক্সি চালায় তারা সব সময়ই চোখ কান সজাগ রাখে। কে কখন ডাকে, কার কখন হঠাৎ ট্যাক্সির দরকার হয় তার ঠিক আছে কিছু।

হ্যাঁ, আমার প্রথমেই মনে হল যেন খাওয়া সেরেই মেয়েটি নিশ্চয় গাড়ি ঘোড়া কিছু একটা ডাকবে।

আপনারা ঠোঁট টিপে হাসছেন!

কিন্তু এটা তো সত্য, যে নিত্য যাত্রী পারাপার করে, কার কখন গাড়ির দরকার হবে রাস্তায় ঘাটে লোকের চোখ মুখ দেখলে আপনাদের চেয়ে সে একটু আগে বুঝতে পারে।

হ্যাঁ, আট বছর আমি কলকাতা শহরে ট্যাক্সি চালাই। আমার নিজের গাড়ি।

গাড়ি কিনে আমি এই ব্যবসা করছি ঠিক তা না কিন্তু।

বরং গাড়ি চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাবে এই মতলবে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হাম্বার। এক নম্বরের গাড়ি এটা মশাই আমার।

হ্যাঁ, ওতে চড়ে হাওয়া খাওয়ার মতলবটা আমার চেয়ে আমার বাবার বেশি ছিল।

কিন্তু কেনার এক বছর পরে বাবা মারা যান।

তার পরের বছর আমাদের দেশ ভাগ হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের ছোটখাট জমিদারিটা গেল।

ফতুর, আমি তখন ফতুর। জমানো টাকা কিছুই প্রায় ছিল না। জমিদারিতে ক'বছর ধরেই ঘুণ ধরেছিল।

আর কি, গাড়িখানা সম্বল করে আমার স্ত্রী রমার হাত ধরে হিন্দুস্থান, মানে কলকাতায় বড়মামার বাসায় এসে উঠলাম।

হুঁ, একডালিয়া রোডে।

গাড়িটা এবং বলতে সঙ্কোচ নেই, রমাও প্রায় নতুনই ছিল। গাড়ি কেনার ছ'মাস আগে তো আমি বিয়ে করেছিলাম।

যাক্‌গে, এখন জমিদার-নন্দন চাকুরে মামার ঘাড়ে চেপে তার অন্নধ্বংস করবে তা ও একলা না সস্ত্রীক, অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুঝলাম।

তাছাড়া মামা পারতেনও না।

বুদ্ধি করে বৌকে মামাশ্বশুরের জিম্মায় রেখে আমি গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম।

হ্ঁ, ট্যাক্সির লাইসেন্স নিয়ে (অবশ্য সরকারী চাকুরে আমার মামাই তদ্বির-টদ্বির করিয়ে চট্ করে লাইসেন্সটা বার করতে সাহায্য করলেন)। বেশ দু'পয়সা কামাতে লাগলাম।

চাকরি, বিশেষ করে অফিসের লেখা-পড়ার কাজের বিদ্যা মশাই, আমার ছিল না বলে রাখছি—জমিদারের বাচ্চা, দুধের সর আর মাছের পেট খেয়ে প্রজাদের চোখ রাঙিয়ে জমিদারি চালাব এই স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছিলাম। তা সে সুখ তো কপালে রইল না।

হ্ঁ, আমি ও আমার গাড়ি যখন দিবারাত্র কলকাতা শহর চষতে লাগলাম আর একজন কিছু দূরে একডালিয়া রোডে চুপ করে বসে রইল না। রমা।

পাকিস্তান থেকে সে-ও নতুন এসেছে তাজ্জব শহরে। গাড়িটা যদি একডালিয়া রোডের বাসায় এমনি পড়ে থাকত তো আমার মামা বিকাশ রায়ের বড় মেয়ে টুনি (ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন) ওটাকে ব্যবহার করত। সে কি এক আধ বার। দিনের মধ্যে বিশ বার। সে-বাড়ি উঠেই দু-এক দিনের মধ্যে আমি টের পেয়েছিলাম। নতুন কলেজী হাওয়া গায়ে লেগেছে টুনির। তার ওপর চেহারাখানাও মিষ্টি মতন। তায় আবার সবে লাগছিল ষোলটা বসন্তের হাওয়া। মশাই, ও কি আর ওর মধ্যে ছিল। টুনি বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা আর শেষ করে উঠতে পারছিল না।

অবশ্য বিকাশবাবু চেষ্টা করেছিলেন অনেকদিন থেকেই গাড়ি কিনতে। তা সে কি আর চাকুরে লোকের পক্ষে চট করে হয় মশাই, তা-ও এই গ্রেডে থেকে।

কাজেই বুঝতে পারছেন টুনি গাড়িটা একবার বাড়ির মধ্যে পেয়ে প্রাণখুলে বেড়াতে শুরু করেছিল। ওটাকে আমার সঙ্গে না নিয়ে এলে কী অবস্থাটা হত ?

গাড়ি রেহাই পেল, কিন্তু রমা রেহাই পায়নি। মফঃস্বল থেকে নতুন মেয়ে এসেছে। তা ও একডালিয়া রোডের মত ফ্যাশানেবল পাড়ায়। তার ওপর রমার চেহারা ওপাড়ার অনেক মেয়ের চেয়েই ভাল—আর এই তো সবে বিয়ে হয়েছে, এখনো ইয়ে—

'বৌদি বৌদি।'

হ্যাঁ, বিকাশ রায়ের বড় ছেলে বেণু রায়। কী পাজি মশাই, যদি দেখতেন। এমনি মুখ দেখলে মনে হবে সাত চড়ে রা বেরোয় না। ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখেনি। আর এদিকে তলে তলে হাড়বদমায়েস।

'বৌদি বৌদি।'

ঐ যে বললাম। টুনি করত আমার গাড়িটার সদ্ব্যবহার, আর বেণু হারামজাদা করতে লাগল আমার স্ত্রী রমাকে ব্যবহার। হ্যাঁ, ঐ যথার্থ শব্দ। বৌদি না হলে চা-খাওয়া হয় না, বাবুর বিছানা ঠিক থাকে না, বৌদি টেবিলের বই গুছিয়ে না রাখলে গোছান হয় না, ধোবার কাপড় এলে সেগুলো সুটকেসে তুলতে ও দরকার মত একটা একটা করে বার করে দিতে বৌদি। ভাত খেয়ে উঠে বৌদির হাতের মুখশুদ্ধি মশলা মিষ্টি। বাথরুমে যেতে তোয়ালে সাবানের জন্যে বৌদির ডাক।

কেন হবে না মশাই !

রাতদিন দেখছিল সমর্থ সব মেয়ে।

সমর্থ মেয়েরা বেছে বেছে সমর্থ পুরুষকে পাকড়াও করছে। একত্র বেড়ানো, একসঙ্গে সিনেমা দেখা।

আমি তো আগেও কলকাতায় এসেছি। কিন্তু হালে, পাকিস্তান ছেড়ে এসে এবার রকম সকম দেখে বুদ্ধি লোপ। আর একডালিয়া রোডের মত বাবুপাড়া। অবাধ মেলামেশার যেন বান ডাকছিল।

কিন্তু আমাদের সোনার চাঁদ বেণু সুবিধে করতে পারছিল না। বাপের অবস্থা তো আর দশটি ছেলের বাপের মতন না। বুঝতে পারছেন। রাজা জমিদারের মত অবস্থার ঘরের ছেলের সংখ্যা সেখানে অনেক।

আর লুটছিল সব তারাই।

গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, হাতে দুটো তিনটে করে হীরে চুনীর আংটি সব ছেলের।

মশাই, কায়দা করে বাবা বনেদী পাড়ায় বড়মানুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকছিল বটে।

কিন্তু চারদিকের অবস্থা যে অন্যরকম। ছেলে মেয়ে দুটোরই উপোসে কাটছিল। টুনি পাচ্ছিল না একটা গাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আহা কী সব বন্ধু। হাতিবাগান না সিমলা স্ট্রীট থেকে একদিন একটা ছেলে গিয়েছিল ওবাড়ি। ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, গায়ে কাঁধছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবী। শুনলাম ঐ নাকি টুনির লেটেস্ট। তা যেমন অবস্থার ঘরের মেয়ে এর চেয়ে ভাল ছেলে ও যোগাড় করতে পারত কি ?

আর এদিকে ভুগছিলেন বেণুবাবু।

নতুন গোঁফ কামাচ্ছেন। কলেজে একটা পাস দিয়েছেন। আদ্দি মলমলটা যে গায়ে না উঠছে তা নয়, পায়ে হরিণ চামড়ার চটি, বোতামের গর্তে একটা দুটো গোলপ ফুলও মাঝে মাঝে গোঁজা হয় এবং মাথায় একটু আধটু গন্ধ তেল। কিন্তু ঐ। এর বেশি না। পকেটে। পার্সে আর ক'টাকা নিয়ে চলাফেরা করতেন সাব-ডেপুটির ছেলে ? এই বিত্ত নিয়ে ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা ! আমার তো মনে হয় কারো চুলের ডগাটি ও ছুঁতে পারেনি ওপাড়ার।

তার শোধ তুলল সে রমার ওপর। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আত্মীয়াও বটে, নারী তো বটেই। আঠারো বছর বয়েসে সবে পা দিয়েছিল রমা। আর, বেণু ওকে পেলে কোথায়—রাস্তায় ঘাটে না, বাড়িতে, ঘরে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

'বৌদি বৌদি।'

মানে উপোসী বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ পেল। কি, আমি খুব বেশি দোষ দিই না রমার। কি আর তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে ওই বয়সে, পাড়াগাঁয়ে থাকে লেখাপড়া শিখে চোখমুখ ফুটবে তারও খুব একটা সুযোগ পায়নি। আদুরে বাপের মেয়ে মাঘমণ্ডল ব্রতকরে আর দেয়ালির রাতে হাজার বাতি ও রংমশাল জ্বালিয়ে বড় হতে না হতে টুপ

করে একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

তাছাড়াও একটা শয়তান যদি একটি মেয়ের মুখের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাস ফেলতে থাকে—

একডালিয়া রোডের বাড়ির শোবার ঘরে, বাথরুমে, বাগানে, ছাদে আধখানা মাথা নষ্ট হয়েছিল রমার। বাকি আধখানা হল বাইরে রেষ্টুরেণ্টে, হোটেলে এবং আর কোথায় কোথায় বেণু ওকে নিয়েগিয়েছিল জানি না। এদিকে আমাকে থাকতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে গাড়ি নিয়ে রোজগারের ধান্দায়। টের পায়নি। কিন্তু যখন টের পেলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। না, একটা সান্ত্বনা থাকত যদি বেণু ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও ঘর-সংসার পাতত—কিন্তু তা সে করেনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। হয়তো এসব রেওয়াজ এই শহরে আজকাল উঠে গেছে। একডালিয়া রোডের বাসায় যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। রমাও সেখানে ছিল না জানতাম। নারকেলডাঙ্গার কাছাকাছি একটা টিনের শেড ভাড়া করে আমি আমার ট্যাক্সি নিয়ে থাকি। তখনই একদিন খবর পেয়েছিলাম রমা নাকি ধর্মতলার কোন একটা বার-এ মদ খেয়ে এক রাত্রে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। রেণু রায়? না, সঙ্গিনী নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে ফুর্তি করার পয়সা তার ছিল না। হাত বদল হয়ে হয়েই রমা সেদিন কার কাছে গিয়ে পড়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন আর আমার স্ত্রী সম্পর্কে কেউ কোন সংবাদ দেয়নি।

তারপর বছর তিন বাদে সংবাদ পেলাম দেরাদুন না কোথাকার হাসপাতালে আড়াই মাস একটা ঘা নিয়ে শুয়ে থেকে তারপর রমা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

শুনে আমিও শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর, তারপর আমি নারকেলডাঙ্গা থেকে উঠে এসে সার্কুলার রোড ও শেয়ালদার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টালির শেড ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে আছি, হুঁ তেমনি ট্যাক্সিড্রাইভার। তবে রোজগার এখন বেড়েছে। বেড়েছে মানে বেশ বেড়েছে।

না, পূর্ব পরিচয় দিলাম এই জন্যে যে আমার ওপর দিয়ে, হ্যাঁ ভাগ্যের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

আপনারা শুনলে হাসবেন।

হাসবেন এবং দুঃখও করবেন।

এবং এটা খুবই সত্য যে লোকে বলে যে, ঈশ্বর একদিকে কেড়ে নিলে আর একদিক দিয়ে দেয়।

স্ত্রী, জমিদারী গেছে। দেশ গেছে। কিন্তু যেমন দিনকাল। খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে যে আজ এই শহরে আমাকে থাকতে না হত তার বিশ্বাস ছিল কি? হ্যাঁ, আমি টাকা পয়সার কথাই বলছি। দিব্যি আছি। সুখই বলা যায়। আমি, দেখুন ইচ্ছে করলে, রোজ এক বোতল বিয়ার খেতে পারি। দুপুরবেলা আস্তানায় ফিরে গিয়ে সসপ্যানে করে আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করে খাওয়া ছেড়ে

দিয়েছি। শেয়ালদা কি ধর্মতলার কোন হোটেলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে এখন মাংস ভাত চালাই। তবে একটু রয়ে-সয়ে খাওয়া দাওয়া করি আর মদটদও পারতপক্ষে অভ্যাসে আনতে চাই না। আমার পেটের ধাত ছোটবেলা থেকেই একটু আধটু খারাপ। লিভারের জোর কম।

তার সুবিধা হল এই যে, অপব্যয় না করার ফলে দু' চার হাজার টাকা আমি যখন তখন বার করে দিতে পারি। একটা একাউণ্ট খুলেছি ব্যাঙ্কে। খাই-খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা বাঁচে ওখানেই ফেলে রাখি।

এতক্ষণ পর নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন আমি অত লোলুপ দৃষ্টিতে কেন বারবার মেয়েটিকে দেখছি। খাওয়া দেখছিলাম।

হ্যাঁ, কখন খাওয়া শেষ হবে আর বেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠবে। আরও ক'টা টাকা পাব। ড্রাইভাররা, বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি চালায়, তাদের চিন্তাটা সাধারণত এখাতেই বয়। অন্তত প্রথমে বইতে শুরু করে।—আর তা ছাড়াও আমি গোপন করব না, মেয়েটিকে যখন দেখছিলাম তখন তার হাত, পা, পিঠ, কাঁধ, চুল, গায়ের রং এমন কি কোমরে কতটা মাংস নেই আর বুকে কতটা মাংস বেশি আছে দু চোখ দিয়ে জরীপ করলাম, দূর থেকে যতটা সম্ভব।

হাওয়ার দাপটে যখন খোঁপা থেকে আঁচলটা পিঠে নামল ও পরে পিঠ থেকে সরে গিয়ে আর একটা কাঁধের কাছে উড়ু উড়ু করে তখন আমি তার এ-কাঁধটা দেখতে পাই, বুকের এপাশের সুগোল মসৃণতা। তারপরেই অবশ্য ধীরে সুস্থে একটা কাট্‌লেটের অর্ডার দিই। না হলে আর এই গরমে আমার কাট্‌লেট খাওয়ার ইচ্ছা—

কেননা এ কাঁধের কাপড় সামলাতে এদিকে ও ঘার ফেরাতে আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখ বেঁধে গেল। ঐ এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারলাম গাড়ির দরকার হবে।

কাটলেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব একটা লোভ হচ্ছিল বৌটিকে দেখে, তা না।

তাছাড়া, নিজের স্ত্রী, রমার কাছে কামড় খাওয়ার পর স্ত্রীলোকদের আমি এড়িয়েই চলি। বেশ আছি একলা আমার টিনের শেডে। খাই-দাই ফুর্তি করি। তা না, জমিদারের ছেলে, দেশের অনেক বড়লোক বন্ধু পেয়ে গেছি এখন এই শহরে। হয়তো অনেকে আগে বড়লোক ছিল না, এখন হয়েছে, নিজেদের চেষ্টা, বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে। ব্যবসাকেন্দ্রে আমার আনাগোনা একটু বেশি! তাঁদের আমাকে একটু সহানুভূতি করাও বটে। তাঁরা ডাকছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা ডাকছেন, আত্মীয় এবং বন্ধুর দরকার হলেই আমার গাড়ি ভাড়া করেন। বালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে গড়পাড়, গড়পাড় থেকে নতুন বাবুপাড়া লিন্‌টন স্ট্রীট, সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রীট এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ডালহৌসী, কি চৌরঙ্গী কি ধরমতলা। পুরুষ—আমি আপনাদের কাছে যখন কিছুই গোপন করব না তখন বলে রাখি, পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আমাকে বেশি ডাকে। তাই বলছিলাম, ভগবান

আমার একদিক নিয়েছেন আর একদিক পূরণ করেছেন। এক এক সময় ভাবি, এক কালে জমিদার ছিলাম, আমার চেহারায়, চলায় বলায় তার পরিচয় এখনো একটু আধটু লেগে আছে বলে কি তারা আমার ট্যাক্সিতে চাপতে পছন্দ করেন! আমিও আমার চেহারা এবং পোশাক যতটা সম্ভব সুন্দর সুদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করি এবং ফি মাসে গাড়িটার রং ফিরিয়ে ওটাকে তকতকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। কেন তা করব না বলুন, আর দশটা ট্যাক্সিও যদি পর পর দাঁড়িয়ে থাকে, বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি, কি যেন নাম—উমা সেন, হাত তুলে ঠিক আমাকেই ডাকবে। লিনটন স্ট্রীটের সেই রূপসী বৌ, রুবি রায়—যদি কষ্ট করে একটু হেঁটে এসেও আমার গাড়ি ধরতে হয় তো তা করতে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাস্তায় আর পাঁচটা ট্যাক্সিওয়ালা বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে শুধু দেখে। গড়পাড়ের অসীমা চ্যাটার্জী, পদ্মপুকুরের তৃপ্তি চৌধুরী, মোহনবাগান স্ট্রীটের মালা রায়, পার্কসার্কাসের চামেলী, শোভাবাজারের সুমিতা এবং আরও একশটি মেয়ের বাড়ির নম্বর আমার মুখস্থ। বাড়ির নম্বর এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে (যদি কেউ অফিসে কাজ করে তো সেই অফিস এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেখানে যায়) যেখানে যাবে সেই ঠিকানা আমি জানি! মাফ করবেন, আপনি যদি স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে লটবহর নিয়ে হঠাৎ শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে কি কাঁকুড়গাছি কোন আত্মীয়ের বাড়ি পেঁছে দিতে আমায় ডাকেন, আমি দু হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব? সময় নেই। আজ শনিবারের দুপুর সোওয়া বারোটা বাজে ঠিক একটায় ব্যাংকশাল স্ট্রীটের লাল অফিস-বাড়িটার সামনে আমাকে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই অফিসের রেবা সোমকে আমার শেয়ালদার একটা হোটেলে পেঁছে দিতে হবে। আজ রোববার, উঁহু তিনটে বেজে গেছে, এখনই আমাকে ছুটে যেতে হবে সাদার্ণ এভিনু্য। ঝাউ গাছের আড়াল করা সেই আকাশী রঙের বাড়ির সপ্তমী বোসকে পেঁছে দিতে হবে সৈয়দ আমীর আলী এভিনু্যর একটা সুন্দর ফ্লাট বাড়িতে। সোমবারের সকাল, সময় নেই, মধু বোস লেনের মায়া গাঙ্গুলী আমার ট্যাক্সিতে চেপে টালিগঞ্জের একটা বাড়িতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটায় সেই মায়াকে ধর্মতলায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে। সময়, স্থান, লোক ও পথের দূরত্ব। ঘড়ির কাঁটা ধরে ধরে আমার সে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে হয়।

তাই বলছিলাম, হরিদ্বার কুম্ভমেলায়, যাবেন মনে মনে ঠিক করে যদি কখনও আপনার বুড়ি দিদিমা একদিন হাওড়ার মেল ধরতে চাকর পাঠিয়ে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করতে চান তো তিনি নিরাশ হবেন!

অবশ্য মিষ্টি বাক্য বলেই আমি আপনাদের চাকরকে ফিরিয়ে দেব আর আপনার দিদিমার জন্য মনে মনে কষ্টও করব, কিন্তু আপনারা শুনে হাসবেন আজ অবধি কোন বর্ষীয়সীই আমার গাড়িতে চাপল না। তখন, তখন হয়তো আমি আমার সাদা কালো হাম্বার নিয়ে লিনটন স্ট্রীটে যেতে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে তৈরী হতে আপনাদের পাড়ার রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা থামিয়েছি। আর আপনার চাকরটাকে

ফিরিয়ে দিয়ে দোকানে বসে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে আমি একটি তরুণীকে দেখছি। বনানীকে। তার ফর্সা সুগঠিত বাহু, শক্ত মজবুত খোঁপা এবং ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ন উদ্ধত নাক। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হলে সেই নাকের ঘায়ে ও আমাকে কচুকাটা করে দিতে চাইবে। ছবিটা ভাবছিলাম। গোলাপী রং করা গোল প্যাটার্নের বাড়ির অসামান্যা সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। বনানী সেন।

এবং বনানীর মত সবাই দেখতে ভাল। হ্যাঁ, যারা আমার গাড়িতে চাপে। সব মেয়ে, সব বৌ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমি যখন পাশে চুপ করে দাঁড়াই তখন তাদের চুল দেখি চোখের পলক দেখি ঘাড়ের বাঁক দেখি পিঠ দেখি কোমর। গাড়িতে উঠতে কি নামতে যদি কোন মেয়ের শায়া বা শাড়ি একটু বেশী সরে বা উঠে যায় তো আমি পায়ের রং মাংসল ডিম এমন কি রোমকূপগুলি পর্যন্ত সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে চট করে দেখে নিই। প্রশ্ন করবেন, কেন? অভ্যাস। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওপর ওপর দেখা। নখ চুল আঙুল পালক মাংস চামড়া ছাড়া আর কিছু দেখা আমার ইচ্ছাও নেই সময়ও হয় না।

মন?

তাই বলছিলাম ওদের ওদিকটা আমি মাড়াই না। যতদূর সম্ভব চোখ বুজে থাকি, এড়িয়ে যাই। না হলে বনানী কেন আমার ট্যাক্সি যথাসময়ে ওর দরজায় হাজির না থাকলে রাগ করে, বালিগঞ্জের বৌটি মূর্ছা যায়, টালিগঞ্জের মেয়েটি চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয় তার কিছু কিছুটা আমি জানি। কিন্তু জেনে করব কি। আমি যে আগেই একজনের কাছে ছোবল খেয়ে আছি।

চুপ থাকি। চোখ বুজে যাই। মিটার মিলিয়ে পয়সা আদায় করে আর এক সেকেন্ড কোথাও দাঁড়াই না। আর এক পাড়ায় ক্ষেপ দিতে শহরের রৌদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বরং মন-টন না দেখে আর দশজন ট্যাক্সিওয়ালার মত নিস্পৃহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করি। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র ট্যাক্সি ওয়ালারাই এত কাছে এসে এত নিরাসক্ত চোখে নারীর রূপ দেখে। তাই তাদের হাঁ করে তাকিয়ে দেখাটাও বাড়ির 'জেনানারা' কোনদিন আপত্তি করে না!

আমরা ট্যাক্সিওয়ালারাও সিগারেট মুখে গুঁজে সেই অগাধ রূপের ওঠানামা দেখার মেশায় বুঁদ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যাই। এর বেশি কিছু আমাদের দরকার হয় না।

আর, তা ছাড়াও, আমি, ধরুন এখন যেমন অভদ্রভাবে টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বার বার খাবার প্লেট থেকে খুঁতনিটা তুলে বৌটির খাওয়া দেখছিলাম, এমন করার সুযোগ আপনার সেখানে পেতেন না।

রেষ্টুরেন্টওয়ালাই আপত্তি তুলে বলত, মশাই বেরিয়ে যান। এঠা ভদ্রলোকের জায়গা। এমন ভাবে তাকানো—

সেই স্বাধীনতা আমার ছিল।

সেই সুখ। আর আপনাদের এখন বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না, রোজ অন্তত দেড় ডজন মেয়ের রঙিন শাড়ি শায়া ব্লাউজ অবিশ্বাস্য রকমের সব সুন্দর খোঁপা বেণী, চোখ, চোখের রং ও হাসি কান্না দেখে আমি নিজের স্ত্রী-বিচ্ছেদের কথা একেবারে ভুলতে পেরে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন কায়মনে আঁকড়ে ধরে আছি। বেশ আছি।

হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছি—খুঁটিয়ে বৌটিকে দেখছি। নিশ্চন্ত মনে। তা ছাড়া এইমাত্র হঠাৎ একটা ভিড় হয়ে রেষ্টুরেণ্ট আবার পাতলা ফাঁকা হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের হোটেল রেস্টুরেণ্টের দস্তুর যা। কোথা থেকে সব লোক ছুটে আসে আবার একসঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায়। একটিও থাকে না।

আমি দৃশ্যটা তাই উপভোগে কয়র বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসি। খাওয়া দেখি। ছোট ছোট হা। শাদা মুখ শাদা ব্লাউজ। শাদা পাড় ছাড়া কাপড়। একটা শ্বেতপাথরের পুতুলের মত লাগছিল। পুতুল খাচ্ছে।

তা ছাড়া ওর উল্টো দিকের দেয়ালের রংটা পাকা সবুজ। তার ওপর এই দিনেরবেলায়ও মাথার ওপর বাল্বিশটা বাল্ব জ্বলছে। শরীরের একটা শাদা ছায়া পড়েছিল সামনে টেবিলের কাচে। শরীরটা ছোট। নুয়ে খাওয়ার সময় ছায়াটা আরো ছোট হয়ে টেবিলে পোর্সেলিনের শাদা ডিশটার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল এক একবার।

এবার পায়ের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম শাড়ির আঁচলটা সরে গিয়ে শায়ার খানিকটা বেরিয়ে আছে। ঘোর লাল রং। এখন বুঝলাম হাতের মত পা দুটোও খুব ফর্সা। শায়ার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংস বাদামি রং ধরে আছে। বয়সের রং না ওটা।

মানে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম, হাত পা আঙুল গলা নাক ভুরু চুল চোখ সব নতুন। একেবারে টাটকা, তাজা। যেন এইমাত্র বাক্স থেকে (বা ঘর থেকে যা-ই বলুন) বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। একটা রেষ্টুরেণ্টে বসে খাচ্ছে।

এক গ্লাস জল দিতে ডাকলাম ছেলেটাকে।

জল খেয়ে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম।

মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। জল খাচ্ছে। ওপরের দিকে ওর থুঁতনি। আঁচলাটা আর খোঁপা বা ঘাড়ে লেগে নেই, সরে গিয়ে বাঁ বগলের তলায় উড়ু উড়ু করছিল, ফলে সবটা পিঠ এখন দেখা যাচ্ছিল। আহা, কী পিঠ! যেন ঈশ্বর নিজের হাতে বাটালি চালিয়ে খোদাই করে সেই পিঠ তৈরী করেছে, তারপর ওতে রাঁদা চালিয়েছে।

মেয়েরা খুব পাতলা ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় বডিজের ফিতে দুটো কড়া হয়ে চোখে পড়ে। যেন ওটা দেখানোর জন্যই ওপরের জামাটা। কিন্তু এখানে তার ব্যাতিক্রম দেখে খুশী হলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, টালা, গড়পার, এণ্টালি, পার্ক সার্কাস-এর এত মেয়েকে আমি রোজ বয়ে বেড়াই! এমন রেখে-ঢেকে জামা পরতে

আর কাউকে দেখিনি। অথচ এতে যে তার পিঠের লাবণ্য মাংসের ছোট নরম ঢেউগুলো বোঝা যাচ্ছিল না তা-ও-না। শাদা স্ট্রাপ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন দেখলেই মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি অপারেশন হয়েছে। ওটা ব্যান্ডেজ। বাদুড়বাগানের শ্যামলী, সাদার্ন এভিন্যুর রেখা, লিন্‌টন স্ট্রীটের বনানী, সুরাবর্দী এভিন্যুর শোভা সোম সব, সব এক। আমি, যদি কোন সময় কাপড় সরেও যায়, ওদের পিঠের দিকে তাকাই না। চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু, গোপন করে লাভ নেই, আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল এখন এখানে এই মেয়েটির পিঠটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

অবশ্য আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার জীবনে তার সুযোগ কম। পিঠ ধরব কি ভাল করে ওদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না। 'রোক্‌কে', 'জোর্‌সে চালাও', 'আ গিয়া' আর তারপর 'কত উঠল মিটারে ?' ইত্যাদি একটা দুটো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া ছাড়া জেনানাদের সঙ্গে ক'টা আর কথা হয়।

আর তারা এত ব্যস্ত থাকেন এক একজন।

আমরা ঠিকানায় পেঁছে দিয়েই খালাস। কেবল রাস্তার ক'মিনিটের সম্পর্ক।

কেবল সেদিন, আমার এখানে এই সাত বছরের জীবনে বকুলবাগান স্ট্রীটের একটি বৌয়ের হাত ধরেছিলাম। ভারি নরম হাত। বৌটি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ফুট-বোর্ড থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

আর কোনদিন দেখিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠতে। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করছিল।

এখন বৌটি স্বামীর বাড়ি থেকে ভরদুপুরে পালিয়ে হাজরার মোড়ের একটা বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে যে প্রেম করছিল আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, হর্ন শুনে যেভাবে ছেলেটিও একটা ঘরের পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরতে এসেছিল। পড়ে যেত বলে তার আগেই আমি যদিও ওর হাতটা ধরে ফেলে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলাম।

না, বলছি এইজন্য যে, আমি সেখানে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ছেলেটি বৌটির গলায় হাত রেখে যেসব কথা বলছিল।

কিন্তু তা শুনে তা বুঝে করব কি। আমি করবার কে। চোখ মুছে ফের মেয়েটি গাড়িতে উঠে যেখান থেকে এসেছিল সেখানি ফিরিয়ে নিতে বলেছিল। ডবল টিপ। দুটো বেশি পয়সা রোজগার হয়েছিল। ঐ পর্যন্ত।

আর দেখিনি ওকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমি আঙুলের কড়ে গুণে আপনাদের শোনাতে চাই না। শোনাই না। আমরা সব দেখে বুঝে চুপ থেকে সিগারেট ধরিয়ে ফটক ছেড়ে চলে আসি। কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, হাত ধরেছিলাম।

কিন্তু আমার হাত ধরায় কী এসে যায়। আমার দিকে আর কবার ও তাকিয়েছিল ? যে হাত ধরেছিল ফেরার পথে তার মুখ ভেবেই সারা রাস্তা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বৌটি গাড়ির কোণায় মাথা রেখে নিঝুম পড়েছিল। কাজেই আমদের ট্যাক্সিওয়ালাদের হৃদয় মন হাসি-কান্নার মধ্যে উঁকি না দিয়ে থাকাই লাভ।

কী, সেদিন, আমি যতক্ষণ না রিচি রোডের উমা চ্যাটার্জীকে তুলে চৌরঙ্গীর হোটেলের একটা কামরায় পেঁছে দিতে পারছিলাম ততক্ষণ, সারাটা বিকেল, উনিশ বছরের (কি কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে বৌটির) একটি মেয়ের শরীরের তাপ, খাঁ খাঁ যৌবন, মাংসের মসৃণতার স্বাদ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছি, চিন্তায় বুঁদ হয়ে শিস দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মন খারাপ করব কেন।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালা তার ওপর রমার সেই ঘটনায় হৃদয় নামক জিনিসটাকে গাড়ির চাকার তলায় থেঁতলে থেঁতলে এই শহরের পিচের রাস্তায় আমি যে সাত বছরে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

আর এক মেয়ে উমা।

কী চেহারা মশাই। আগুন।

এখনো কলেজে পড়ছে! এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুরি করে রোজ হোটেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে কেন যায় আমি কি জানি না, জানি, জেনে চুপ থাকি।

চুপ থাকার কারণ কাল আবার ট্যাক্সিটা যখন উমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধীরে ধীরে চালিয়ে যাব ও হাত তুলে ডাকবে!

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় লাগিয়ে একটা নীল কি গোলাপী সিল্কে শরীর মুড়ে চোখে কাজলের পুরু প্রলেপ বুলিয়ে ও আমার ট্যাক্সিতে চাপবে। হুঁ সিনেমায় যাচ্ছে। আজ তিন মাস। সেই হোটেল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার কামরা। অথচ আর সব ঘরে আলো।

ফুলের মত মেয়ে উমা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি, ন্যায় অন্যায়ের চর্চায় মাথা ঘামালে আমার চলছিল কি। হোটেলে পেঁছে দেওয়া মাত্র একটা দশটাকার নোট। মিটার খরচ পাঁচ, আমার বখশিশ পাঁচ।

টাকাটা পকেটে পুরে লম্বা সেলাম জানিয়ে আর একবার উমার লম্বা ঘাড় মৌচাকের মত মস্ত খোপা ও সোনার বর্শার মত সুন্দর লম্বা হাত দুটো দেখে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। ওই দেখাটুকুনই আমার লাভ।

উপরি পাওনা।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, এখনো যে আমার ওই মেয়েটির পিট ছুঁয়ে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সেটা নিতান্তই শাদা ইচ্ছা। হাইএর সঙ্গে ওঠে নামে। এই ইচ্ছাকে আমি কোনদিনই কাজে পরিণত করব না; কোন ট্যাক্সিওয়ালাই করে না। লোকের মার পুলিসের হ্যাঙ্গামা মামলা মোকদ্দমা যাহোক একটা কিছুর কথা ভেবে তারা ভীষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সিগারেট টানে আর ঘড়ি দেখে। কখন সময় হবে। সে এসে গাড়ি আলো করে বসবে আর বলবে, 'চালাও।'

আমিও তার অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়ার পর আরো একটা সিগারেট শেষ হয়েছে। পুরো পঁচিশ মিনিট এখানে খেয়ে বসে বিশ্রাম করে কাটানো গেছে হিসাব করলাম।

‘ওটা তোমার ট্যাক্সি ?’

ঘাড় নাড়লাম।

আর অবাক হলাম বৌটিকে দেখে। হ্যাঁ, সুন্দর বলতে সুন্দর। সিঁদুরের রেখাটা অমন সরু করে না দিলে অত সরু চুলের সঙ্গে মানাত না। আর এমন সুন্দর চোখ। লম্বা সরু পালক ঘেরা দুটো দীঘি। জল টলটল করছে, জীবন। ব্লাউজের হাতায় আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসা কচি সবুজ সোনালী আঙুরগুচ্ছ। শাড়ির পাড় আছে। সূক্ষ্ম জড়ির কাজ। দূর থেকে বোঝা যায় না।

‘বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভাল লাগে।’ মেয়েটি বলল।

আমি চুপ করে হাসি।

লম্বা স্বর্ণচাঁপার মত দুটো আঙুল গলিয়ে বৌ বিলের টাকাটা কাউন্টারের ওধারে পাঠায় আর এক হাত দিয়ে মনি-ব্যাগটা বুকের মধ্যে ব্লাউজের ভিতর রাখে।

আমি ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিই। কেননা সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।

‘ভারি সুন্দর গাড়ি তো!’

গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলল। মনে মনে বললাম, তোমার মত সুন্দরী মেয়েরাই তো আমার গাড়ির সওয়ার। ওরা রোজ বেরোয়, বেড়ায়। তুমি, তোমায় তো আর কোনদিন দেখিনি!

‘এই ট্যাক্সিওয়ালা!’

ঘাড়টা ফেরাই।

‘কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করছ না তো ?’

আহা, কী দাঁত।

আমার তো মনে হয় ঐ দাঁত দিয়ে যদি সে কামড়াতে চায় তো রাস্তার সব পুরুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, হাত বাড়িয়ে দেবে, গলা কি আঙুল। কেটে আলগা করে দিক।

আমি দেখছিলাম ওর গাল।

হ্যারিসন রোডের দিক থেকে রোদের লম্বা রেখা ওর গালে গলায় পড়ছিল। ওর পাতলা চামড়ার তলার রঙের লাল আভা দেখছিলাম। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল তখন। সামনে রেড সিগন্যাল। এগোবার উপায় নেই। তাই দুজনের কথা বলার সুযোগ হল।

‘লোয়ার সার্কুলার রোড বললেন না ? ওই তো দক্ষিণ দিক।’

‘হ্যাঁ, তরেপর বাঁয়ে। মিডল রোড।’

‘ও দশ মিনিটে নিয়ে যাব।’

‘আবার সেখান থেকে আমাকে এই গাড়িতে ফিরতে হবে। চারটের মধ্যে মাণিকতলায় ফেরা চাই। হরিতকী বাগান লেন।’

‘তা হবে, খুব হবে; বিশ মিনিট লাগবে বড় জোড় নর্থে ফিরতে।

ঘাড়টা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আবার সুন্দর চোখজোড়া দেখলাম। দেখলাম আর দরকার হলে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা যে কত ভদ্র মার্জিত গলায় জেনানাদের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করতে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'শেয়ালদার রিফিউজি হোটেলটায় খেতে বসে আপনি হঠাৎ যেভাবে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন তখনই বুঝে গেলাম আপনি গাড়ি খুঁজছেন। ট্যাক্সি চাই।'

একটু হাসলাম।

ওর একটু নিশ্বাস এসে আমার গলায় ও ঘাড়ে লাগল। ভাল লাগল। অবশ্য এগুলো আমাদের উপরি-পাওনা। গাড়ি একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেই মেয়েদের গায়ের গন্ধ এসে আমাদের গায়ে পিঠে লাগে। রাস্তা পরিষ্কার দেখে চট্ করে আমি তখন স্টার্ট নিয়েছি।

'চারটের মধ্যে ফিরতে পারলেই হল। ওখানে আমার বেশি দেরি হবে না। যাচ্ছি তো একটা কথা বলতে।

'কার সঙ্গে ?'

'মার সঙ্গে।'

'ওখানে বুঝি আপনার মা থাকেন। মিডল রোড কত নম্বর ?'

পাঁচ-এর পি কি সি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তা না পারলেও কার কাছে যাচ্ছে একবার একটা প্রশ্নের ঢিল মেরেই যে জেনে নিতে পারলাম জেনে সুখী হলাম। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে আগেই জেনে গেলে একটু বেশী খুশী মেজাজে গাড়ি চালাই তো।

'আর ওখানে বুঝি আপনার শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর ঘর, হরিতকী বাগান লেন ?'

কথা না কয়ে থুঁতনি নেড়ে বৌ হাসল। রামধনুর মত বাঁকা ভুরু টান করে ফিসফিস গলায় বলল, ওটা আমার স্বামীর ঠিকানা। তোমরা ট্যাক্সিওয়ালারা চট্ করে বুঝে ফেল।

'তা কেন পারব না, আমরা কি এ-লাইনে নতুন নাকি। আপনাদের কে কোথায় থাকেন আসা যাওয়া দিয়ে আমাদের বুঝতে হয়। অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যাবার পরও আন্দাজের ওপর আমরা গাড়ি চালাই।'

'হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকেই ট্যাক্সি ধরব ঠিক করেছিলাম। ভীষণ খিদে পেল ট্রেন থেকে নেমে। দুটো খেয়ে নিলাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ইস্, কী রান্না !'

'বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি ?'

'হুঁ, কাঁচড়াপাড়া। আমার ছোট ভাই আছে ওখানে। টি. বি.।'

'আজকাল টি. বি-র জ্বালার প্রাণ ঝালাপালা। চারদিকে কেবল ওই।'

উত্তরে কি বলল ও বোঝা গেল না। কেননা একটু ফাঁকা পেয়ে গাড়ি জোরে চালিয়েছিলাম। তা ছাড়া এলোমেলো হাওয়া ছিল।

আর একটু পর একটা বাঁক ঘুরতে সামনে প্রকাণ্ড ভেড়ার পাল পড়ে গেল। রং

করা ওদের গায়ের পশম। হাতে সময় আছে, তাড়াতাড়ি ছুটব বলে পথ পেতে খামকা কতগুলো হর্ন দিয়ে স্টার হাউসের যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করতে বাধল! বরং যতটা পারা যায় আস্তে, বেশ আস্তে গাড়ি চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই।

'তোমার কি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ট্যাক্সিওয়ালা। তাহলে গাড়ি থামিয়ে এইবেলা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পার।' বৌ তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'হাতে সময় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ি। স্টিয়ারিং ছেড়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। রাস্তায় চলতে এ ধরনের সহানুভূতিগুলি আমরা খুব পছন্দ করি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজ রাতটা তা হলে মার কাছেই থাকবেন ও বাড়ি?'

'ও মা, কি বলছি, তোমায় ট্যাক্সিওয়ালা? এই গাড়িতেই যে আমাকে মাণিকতলা ফিরে যেতে হবে। চারটের সময় আমাকে হরিতকী-বাগান লেনে নামিয়ে দিতেই হবে।'

কথাটা মনে ছিল না তাই লজ্জায় হাসলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমার স্বামী খুব কড়া লোক। কোথাও একলা বেরোতে দেয় না। আজ ও একটু অফিসের কাজে বাইরে গেছে। বিকেলে ফেরার কথা। ওই ফাঁকে ওদের দেখে নিচ্ছি। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'অঃ বাবা, আপনি তা হলে ভীষণ লোকের পাল্লায় পড়েছেন। সারাক্ষণ বাড়িতে।'

'সারাক্ষণ।'

চোখ জোড়া ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি যে কী সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি তা যদি তোমরা বাইরের লোক একটু জানতে ট্যাক্সিওয়ালা, আমি কী ভীষণ লোকের ঘর করছি।'

নতুন করে স্টার্ট দেওয়াতে আমার গাড়ির ইঞ্জিন ধুকধুক করছিল। আমিও সেরকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভিতরে।

এই গাড়িতে চড়ে আমার এই ট্যাক্সির হাওয়া লাগিয়ে লাগিয়ে শহরের কত অসংখ্য মেয়ে আমোদ-ফূর্তি লুটছে তা যদি তুমি জানতে বৌ,রোজ—অবশ্য তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক ঢের বুদ্ধিমতী।

কথাটা বললাম না।

কেননা আমাদের ট্যাক্সিওয়াদের এসব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সেই নরম বুক কতটা ওঠে নামে আড়চোখে সেটুকুন দেখে নিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিই, জোরে দুই হতে স্টিয়ারিং চেপে ধরি। ভেড়ার দল সরে গেছে। ফাঁকা রাস্তা।

'আপনি যখন জানা হয়ে রইলেন তখন মাঝে মধ্যে দুপুরে আধ ঘণ্টা আমার ট্যাক্সিতে করে বেড়াতে বেরোতে পারেন। আপনার স্বামী অফিসে বসে মোটেই টের পাবেন না। কোন্ ফাঁকে কখন আপনাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার কলে জল আসবার আগে হরিতকীবাগান লেনে রেখে এসেছি। মিডল রোড যান ইচ্ছা পার্ক সার্কাস

যান, সময় মত নিয়ে যাব, আবার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

'আচ্ছা দেখা যাবে, সে দেখা যাবে।' বৌ বলল আর আমি আড়চোখে ওর লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বুকটা কতটা কাঁপে তা চুরি করে লক্ষ্য করি।

কেননা কাল হয়তো ওকে আর দেখতেই পাব না, কোনদিনই না।

'এবাড়ি ?'

'না, আর একটু চলো।'

আমি বললাম, 'যদি মন খুব খারাপ লাগে তো আজ রাতটা মার বাড়ি থেকে যান। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল। মার অসুখ।'

তোমরা যত সহজ মনে করো ট্যাক্সিওয়ালা তত সহজ না। ঘরের বৌয়ের বাইরে মানে স্বামীর ঘর ছাড়া আর কোথাও রাত কাটাতে হলে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে নামতে হয়, যে-লোক সাত জন্মে শ্বশুর বাড়ি যায় না, সে ছুটে তক্ষুণি এসে দেখে যাবে কতটা অসুখ, কী রকম অসুখ শাশুড়ীর।'

'বুঝতে পেরেছি,' আমি অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর কাছে একটা মদ বিশেষ, দামী নেশার মত। কিছুতেই আপনি না থাকলে ভাল লাগে না।'

অল্প হেসে বললাম আর দু'বার ঘন ঘন, ও দেখে ঠিক সে ভাবেই ওর গলার নরম পেশীর ওঠানামা দেখলাম।

সত্যি দামী শরীর বলে আমার এতটা লোভ হচ্ছিল মেয়েটির ওপর, কিন্তু কি করি উপায় কি, কতটা আর করতে পারে একটি যুবতী মেয়েকে একলা গাড়িতে নিয়ে যখন শহরেয় ট্যাক্সিওয়ালারা চলে! একটা বাড়ির নম্বর দেখে জোরে আর একটা মোচড় দিয়ে এগোই। 'এ বাড়ি ?'

বেঁধে।

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে ও নামল। 'তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি কথা সেরে আসছি।'

আমি গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারীর কথা মনে পড়ে গেল।

মুখটা ফেরানো ছিল। চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোয় কথা মনে পড়ল! আর টুসটুসে আঙুর!'

আহা পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম।

কিন্তু ভেবে কি আর আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলাম। শতকরা নিরানব্বই জন ট্যাক্সিওয়ালার মত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করে একটু ঘুরিয়ে একটা ছায়ায় নিয়ে রাখলাম উল্টো দিকে মুখ করে।

হ্যাঁ ওর শরীরের ওপর বেশি লোভ করেছিলাম বলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দাঁড়াল! দেখুন কী সব ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে! আমি তো ভাবছিলাম

মার সঙ্গেই দেখা করে ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। চোখে জল। নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে!

কিন্তু তা না। শাদা কাঠের গেট-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করছিল। হ্যাট্ পরা! সাহেব মানুষ। যেন এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছে কি এখন বাইরে যাবে।

তা অত সব চিন্তা করার সময় ছিল না।

আমি কথা শুনছিলাম দুজনার।

ট্যাক্সিওয়ালাদের দাঁড় করিয়ে আপনারা যেমন কথাবার্তা বলেন।

'বাড়িতে আর কোনদিন তোমাকে দেখলে আমি ঠিক গুলী করব, চিত্রা।'

'আমার গ্রাসাচ্ছাদনের যতদিন না সুব্যবস্থা হয় ততদিন আমাকে আসতে হবে!'

'না চরিত্রহীন স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিতে আমি বাধ্য নই।'

'বেশ তাহলে আমি কোর্টে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই যাও আমি তাই চাই। একটা প্রস্টিটিউট এসে মোকদ্দমা করে মহীতোষ রায়ের কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করবে। বেশ তো, তাই একবার চেষ্টা কর।'

বলে মহীতোষ রায়, সেই হ্যাটকোট পরা ভদ্রলোক সযত্নে কাঠের গেট্‌টায় একটা তালা পরিয়ে দিয়ে গট্ গট্ করে ভিতরে চলে গেলেন।

চিত্রা ঘুরে এসে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল। 'চালাও।'

এ সময়টা আমারা বিশেষ কথাবার্তা বলি না। কিন্তু তবু স্টার্ট দেওয়ার পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল রুমাল দিয়ে চোখটা এখনো টিপে আছে কি না।

'এই ট্যাক্সিওয়ালা।'

খানিকটা অগ্রসর হবার পর, ও আমায় আস্তে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই : রুমাল সরে গেছে। চোখের কোণ শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে আছে।

'তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে কাছে, কথাগুলো শুনলে?'

কথা বললাম না। সামনে এবার একপাল মোষ। রাস্তাটা কালো হয়ে গেছে।

'ও আমাকে গুলী করে মারবে।'

যেন কিছুই হয়নি, এসব কথার কোন দাম নেই, এরকম একটা ভান সময় সময় আমাদের করতে হয়। গাড়িটা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অল্প হাসলাম : 'ও কিছু না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু'দিনেই মিটে যাবে।'

বললাম, বলতে হয় আমাদের এসব।

কিন্তু দেখলাম সে কথায় বৌটির কান নেই। এক দৃষ্টে রাস্তার ধারের একটা বাদাম গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছে। জায়গাটাও নির্জন।

মোষেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

'না মিটবে না, এ ঝগড়া মিটবার নয় তা সে-ও জানে আমিও জানি।' তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট ধরা গলায় ও যেন নিজের মনে কথাগুলো বলল, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখটা ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ট্যাক্সিওয়ালা!'

'কি, বলুন।'

'ও আমায় ঘৃণা করে। কিন্তুআমিও যে ওকে ঘৃণা করি তা কি সে বোঝে না?'

আমি হাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়েটির গলার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ হতে শুনলাম যে চমকে উঠলাম।

'গুলী করবে, সামান্য ক'টা টাকা চাইতে গেছি বলে তোমার সামনে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার সামনে আমাকে অপমান করল, উঃ, কিন্তু, কিন্তু—সে কি মনে করে—'

আমি হতভম্ব হয়ে ওর কাণ্ড দেখলাম।

'কোথায় গুলী করবে, এখানে এই বুকে, এখানে এই বুকের মাংস ঝাঁজরা করে দেবে মহীতোষ!' উপেক্ষার হাসি হেসে দ্রুত ব্যস্ত আঙুলে ব্লাউজের সব ক'টা হুক ও খুলে ফেলল। 'হ্যাঁ, তোমায় দেখাচ্ছি, তোমার সামনে অপমান করল কি না, তুমি দেখে রাখ, আমার এই বুক লক্ষ টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা রাখে কি না—সামান্য ক'টা টাকা, সামান্য ক'টা—উঃ, এত অপমান!'

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও বিমূঢ় বা বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে শরীরটাকে শক্ত কঠিন করে আমি ইঞ্জিনের দিকে ঘুরে বসার উপক্রম করতে ও আমার হাত চেপে ধরল। এবার বিব্রত হয়ে পড়লাম। ব্লাউজের মুখটা হা করে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে দুটো পেশী শক্ত হয়ে উঠে আবার জেলীর মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

এতৎ সত্ত্বেও হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ততক্ষণে ও আমার হাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। গরম জল টের পেলাম। কান্নার ঠমকে সেই সুন্দর র‍্যাঁদা করা পিঠ অনেকবার উঠল নামল।

কিন্তু তা দেখবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার ছিল না। তিক্ত গলায় বললাম, 'তা অত ঘৃণা যখন, ওখানে গিয়েই বা কাজ ছিল কি—' বলছিলাম, কিন্তু এমন অস্পষ্টভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরোল যে ও শুনল বলে মনে হল না।

হেঁচ্‌কা টান মেরে হাতটা এবার ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় বললাম, 'ভাল কথা, এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলছেন না তো, সেই হরিতকী বাগান লেনের ঠিকানায় কি ট্যাক্সি—'

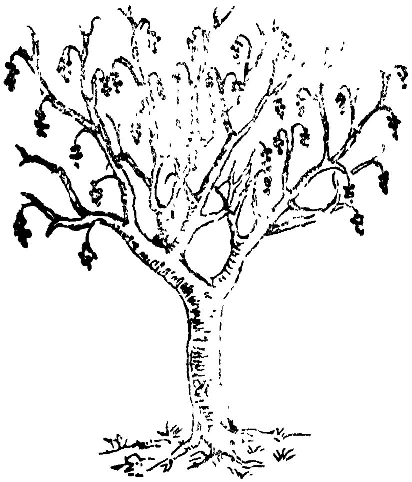
আমার কথা শেষ হবার আগে ও চোখে রুমাল গুঁজে মাথা নাড়ল। তারপর রুমাল সরিয়ে নিয়ে অল্প হেসে বলল, 'বেশ্যার আবার ঠিকানা কি, ট্যাক্সিওয়ালা!'

আপনারা ভাবছেন সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তিরু তিরু

করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারবে?'

'না।'

'তবে এক্ষুণি নেমে পড়।' কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই। আর আমার মুখের দিকে তাকায়নি, ঘাড় নিচু করে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোরে গাড়ি চালিয়ে সার্কুলার রোডে উঠে এলাম। তেল না, জল, তাই ট্রাউজারে হাতটা ঘষে তা মুছে ফেলতে অসুবিধা হল না।



জামাই

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



গভর্নমেন্ট প্রেসের বড় অফিস বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না বাজতেই পানের পুঁটলি নিয়ে এসে বসল প্রমদা। এত সকালে বাবুরা পান খায় না। অন্য কেউ এসে যে তার জায়গা দখল করে বসবে তেমন আশাঙ্কাও নেই। তবু প্রমদা সকাল-সকালই আসে। বিক্রী তেমন হোক আর না হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক হবে। কিন্তু চেহারায় আরো বেশি বুড়ি বলে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। রোগা লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বেশ-বাসের ওপর কোনরকম লক্ষ্য নেই। চুলপেড়ে শাদা একখানা আধময়লা ধুতি পরনে। গায়ে কোথাও কোন গয়না নেই। অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো সুন্দর দেখায় প্রমদার, লক্ষ্য করলে চোখে-মুখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা আভাস মেলে।

ভাগ্য ভাল। অফিসে ঢুকবার আগে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দুজন যুবক আজ সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

'তাহলে দাও দুটো।'

সঙ্গীটি বলল, 'আঃ, আবার আমার জন্যে নিচ্ছ কেন সুকুমার? আমি পান খাব না।'

সুকুমার বলল, 'আহা, খাও না শুভেন্দু, বেশ ভাল পান।'

শুভেন্দু বলল, 'তাহলে দাও। কিন্তু জর্দা-টর্দা দিওনা যেন।'

প্রমদা পান সাজতে-সাজতে যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'জর্দা না খেলে দেব কেন বাবা।'

সুকুমার বলল, 'আমারটায় দাও। ওরটায় দিয়ো না। খাওয়া তো ভাল, জর্দার নাম শুনলেই আমাদের শুভেন্দুর মাথা ঘোরে।'

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ, কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুকুমার একটু সরে এসে সিগারেট ধরাল।

শুভেন্দু বলল, 'পানওয়ালীদের মুখে অমন বাবা শুনতে আমার বড় খারাপ লাগে।'

সুকুমার একটু হেসে বলল, 'কি করবে বলো, ওর বাবু ডাকবার বয়স তো আর নেই।'

শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। কিন্তু বয়স না থাকলেও তাকাবার ভঙ্গিটি প্রায় তেমনি আছে। পান সাজতে-সাজতে আমাদের মুখের দিকে কি রকম করে বার-বার চাইছিল দেখলে তো?'

সুকুমার বলল, 'দেখেছি। শুধু তোমার মুখের দিকে নয়, তোমার আমার বয়সী সকলের মুখের দিকেই ও অমনি করে তাকায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রমদা ওর জামাইকে খোঁজে।'

হাসতে গিয়ে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামাই মানে?'

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর। সুকুমার তার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে হে আস্তে। শুনতে পাবে। চল, এবার ভিতরে চল।'

রাস্তা পার হয়ে দুই বন্ধু অফিসে ঢুকল। একদল মেয়ে ঢুকল তারপর। তাদের পিছনে-পিছনে আর-একদল ছেলে। প্রমদা পান-সাজা থামিয়ে তাদের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর ফের নিজের কাজে মন দিল। শুনতে সে পেয়েছে। চোখের মত কানও আজকাল তীক্ষ্ন হয়ে গেছে প্রমদার। কে কি বলে না-বলে সব সে বুঝতে পারে। প্রমদা সব দ্যাখে, সব শোনে, সব টের পায়। লোকে ভাবে আগের মত এখনো বুঝি তার মাথা খারাপই আছে। ওদের ভুল। প্রমদার মাথা অনেক দিন হল ফের ঠিক হয়ে গেছে। আজকাল তার সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই কৃপানাথ দে-র গলি। দোরের সামনে রাতের পর রাত সেই আগন্তুকের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়ান। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা-বাদল নেই, পথে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাস-মাস ভাড়া না পেলে বাড়িওয়ালী ছাড়ে না। পোড়া পেটের তাগিদেও কি কম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত না প্রমদাকে। মানদা-মোক্ষদাদের তুলনায় ওর ঘরে লোকজন ঘন-ঘনই আসত। রূপ স্বাস্থ্য বয়স বুদ্ধি দলের মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিত্য নতুন ধরণের সাজসজ্জা করত প্রমদা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর লেপে শাঁখা চুড়ি পরে কোনদিন কুলবধূ হত, কোনদিন বা

কুমারীর বেণী পিঠে লুটিয়ে পড়ত।

মানদা মুখ ঘুরিয়ে বলত, 'ঢং। তুই থিয়েটারে গেলেই পারিস। এখানে পড়ে মরছিস কেন।'

মালতী বলত, 'সোনাগাছিতে চলে যা। ছ বছর বাদে বড় রাস্তার ওপর বাড়ি তুলতে পারবি। এই এঁদো গলিতে পড়ে মরছিস কেন।'

প্রমদা হেসে জবাব দিত, 'তোদের জ্বলে মরা দেখব বলে।'

তারপর তেইশ বছর বয়সে বকুল কোলে এল প্রমদার। বাড়িওয়ালী বলল, 'এতদিনে তোর দুঃখ ঘুচলো পেরমো। পেট থেকে পড়তে না-পড়তেই যা চোখ-মুখ বেরিয়েছে, তোর চেয়ে লাখো গুণে রূপসী হবে। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে খেতে পারবি।'

মোক্ষদা বলল, 'একেই বলে ভাগ্যি। আমাদের ঘরে ব্যাটাছেলে পাঠিয়ে ভগমান ওকেই মেয়ে দিলে। দেবে না? সে-ও তো একচোখো পুরুষের জাত। সুন্দর মুখ দেখলে সে-ও ভোলে।'

কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হল না। বকুলের বছর সাতেক বয়স হতে না-হতেই তাকে নিয়ে কৃপানাথ দে র গলি ছেড়ে চলে এল প্রমদা। সোনাগাছিতে রূপাগাছিতে নয়, বেলগাছিয়ার বস্তিবাড়িতে এসে বাসা বাঁধল।

নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে। দু দুবার যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে প্রমদার। একবার হতাশ প্রেমিকের ছোরার মুখ থেকে বেঁচেছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে প্রমদার। এ-পথ আর নয়। পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সী বউটির স্বামী-শাশুড়ী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকান্না দেখতে-দেখতে প্রমদা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেচে—তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতই একটি সোনার সংসার বকুলকে সে গড়ে দেবে।

বেলগাছিয়াতে এসে সধবার বেশ ছেড়ে ফেলল প্রমদা। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে অনেক কৈফিয়তের তলায় পড়তে হয়। তার চেয়ে শাদা থান আর শাদা সিঁথিতে আপদ কম। একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা। এই বয়সেই সব সোহাগ, আহ্লাদ, সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলতে প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হল। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমদা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওর সিঁথিতে সত্যিকারের সিঁদুর তুলে দেওয়ার জন্যে নিজের লোক দেখানো সিঁদুরের দাগ না-হয় মুছেই ফেলল প্রমদা। তাতে দুঃখ কিসের।

বস্তিতে সবাই গৃহস্থ নয়। আধা-গৃহস্থও কয়েক ঘর আছে। দিনদুপুরে, রাত-দুপুরে ভুল করে কেউ-কেউ প্রমদার দোরে এসেও হানা দিতে লাগল। কিন্তু ফের কোন ফাঁদে পা দেওয়ার মত মেয়ে নয় প্রমদা। জীবনে তার শিক্ষা কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই পাইকপাড়া। সেখানে ডাক্তার বাবুদের বাড়িতে ঠিকে-ঝির কাজ নিল প্রমদা। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদলে কোলে তুলে নেয়। আর মনে-মনে স্বপ্ন দ্যাখে, নিজে ঝি-গিরি করলেও বকুলকে সে

এমনি একটি বড়লোকের বাড়ির বউ করে পাঠাবে।

শুধু ঝি-গিরির পয়সায় সংসার চলে না। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটুলি নিয়ে প্রমদা অফিস-আদালতের সামনে গিয়ে বসে। বিক্রি মোটামুটি মন্দ হয় না। অফিসের বাবুরা অনেকেই এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, চুনের বোঁটা হাতে নিয়ে গল্প করে।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মেয়ে তো বেশ চালাক চতুর দেখছি। লেখাপড়া শিখল কোথায়? ওকে স্কুলে দিয়েছ নাকি?'

প্রমদা লজ্জিত হয়ে বলল, না বাবু। বস্তির সামনে নিমাই মুদির দোকান আছে। বই-খাতা নিয়ে সেখানে যায়। পড়াশুনো পেলে বকুল আর কিছু চায় না। দিনরাত বই নিয়ে থাকে। রামায়ণ মহাভারত ওর মুখস্থ।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুধু রামায়ণ-মহাভারত কেন। ও আরো অনেক বই পড়েছে! ওকে এবার ভাল একটা ইস্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি করে দাও প্রমদা। মুদির দোকানে ফেলে রেখ না। তোমার মেয়ে দেখতে তো অমনিতেই সুন্দরী। লেখাপড়াটা যদি ভাল করে শেখে ওর বিয়ের জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যে দেখবে সে-ই ওকে পছন্দ করবে!'

প্রমদা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'সে আপনাদের আশীর্বাদ, কর্তা!'

শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে-স্কুল আছে। সেখানে আধা-মাইনেতে বকুলকে ভর্তি করে দিল প্রমদা। স্কুলে পুরো নাম জিগ্যেস করায় বলল, বকুলমালা দাসী।'

পরদিন বকুল এসে বলল, 'আজকাল আর মেয়েরা দাসী লেখে না মা। আমাদের ক্লাসের দিদিমণি রেজিস্টার খাতায় আমার নাম বকুলমালা দাস লিখে নিয়েছেন।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'রেজিস্টার। সে আবার কি রে।'

বকুল হেসে বললে, 'বাঃ রে। রোজ যে নাম ডাকা হয় ক্লাসে। স্কুলে গেলাম কি গেলাম না তার হিসেব রাখার জন্যে নামের খাতা আছে প্রত্যেক ক্লাসে।'

প্রমদা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও।'

ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলল বকুল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। স্কুল ছেড়ে কলেজ।

বস্তির সবাই বলল, 'আর কেন, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

প্রমদা বলল, 'আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি। কিন্তু মেয়ে যে কথা শোনে না।

কত সম্বন্ধ এলো, কত সম্বন্ধ হাত-ছাড়া হল, কিন্তু বকুল কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে সায় দিল না।

প্রমদা একদিন মেয়েকে ডেকে বলল, 'তুই কি ভাবলি বল দেখি। বিয়ে-থা ঘর-গেরস্থালি করবি নে?'

বকুল বলল, 'না মা, এই বেশ আছি।'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বেশ আছি ! তুই দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকবি আর আমি জীবন-ভর পরের বাড়িতে দাসীগিরি করব, রাস্তায় বসে পান বেচব, এই বুঝি তোর ইচ্ছে ?'

বকুল কালো ব্যথাভরা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি মা, ও-সব কাজ ছেড়ে দাও।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কেবল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দিলে চলবে কি করে শুনি ? দু-বেলা অন্ন জুটবে কি করে ?'

বকুল বলল, 'আমি ট্যুইশন করব মা, চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু তোমাকে ও-সব কাজ করতে দেব না।'

তারপর সত্যিই যখন বকুল একটা স্কুলের মাস্টারির খবর আনল, প্রমদা বাধা দিয়ে বলল, 'উঁ, তা হবে না। তার চেয়ে তুমি যা করছিলে তাই কর বাপু। পাস-পরীক্ষা শেষ কর। ভাতের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বকুল বলল, 'কিন্তু রাস্তায় বসে পান বিক্রি করতে তোমাকে আর আমি দেব না মা ! কলেজে তো আমার মাইনে লাগে না। প্রিন্সিপাল যে ট্যুইশনটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাতে সংসারের অনেক খরচ আমাদের চলে যাবে। তারপর বি এ-টা পাস করে কোন অফিস টফিসে ঢুকতে পারলে যা আনব, এক্টেস্‌টে আমাদের দুজনের তাতেই চলবে। তোমাকে আর আমি কষ্ট করতে দেব না।'

মেয়ের মুখের দিকে মমতাভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রমদা বলল, 'দূর পাগলী। আমার আবার কষ্ট কিসের। তোকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছি।

বি. এ পাশ করবার কিছুদিন বাদেই চাকরি জুটিয়ে নিল বকুল। আগে থেকেই চেষ্টা চরিত্র করছিল। কলেজের এক প্রফেসরের স্বামী সরকারী অফিসে ভাল চাকরি করেন। সেখানেই কাজ জুটল বকুলের।

পান বিক্রি আগেই বন্ধ হয়েছিল, চাকরি পাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঝি-গিরিও আর মাকে করতে দিল না বকুল।

প্রমদা বলল, 'কেন, পেটের জন্য তুই খাটবি আর আমি খাটতে পারব না ? আমার কি গতর গেছে ?'

বকুল বলল, 'ও-কথা কেন বলছ, মা। এতকাল তো তুমি আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ। এবার তুমি বিশ্রাম কর। নিজের ঘর-সংসার দ্যাখ।'

প্রমদা বলল, 'ঘর-সংসার না ছাই। তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে ; কোল ভরে ছেলেমেয়ে আসবে—তবে তো আমার সংসার। তার আগে আমার সংসার কিসের রে ?' বলে মেয়ের দিকে তাকাল প্রমদা। একুশ-বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু বিয়ের কথায় ওর মুখে রং লাগল না। চোখের পাতা লজ্জায় আনন্দে নেমে এলো না।

বকুল আর কোন কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিল। একটু বাদে সে উঠে চলে যাচ্ছিল, প্রমদা তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু

তাতে তো তোর কোন দোষ নেই ; তুই যে আমার পাকের পদ্ম, বকুল। সেই দুঃখে তুই কেন বিয়ে করবি নে ?'

বকুল বলল, 'আমার কোন দুঃখ নেই, মা। আমার জন্যে তুমি ভেবনা, আমি বেশ আছি।'

এবার বকুল উঠে গিয়ে কালো মলাটের একখানা ইংরেজী মোটা বই খুলে বসল। দুঃখে বুক ভেঙে যেতে লাগল প্রমদার। মেয়েরা হৈ-চৈ করে, কত আনন্দ আহ্লাদ করে, কিন্তু বকুল সেই এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই ভারি গম্ভীর, ভারি বিষন্ন। বকুল প্রথম-প্রথম তার বাপের খোঁজ করেছে, কাকা, মামা, দাদাদের খোঁজ করেছে। প্রমদা মেয়েকে বুঝিয়েছে, তারা কেউ বেঁচে নেই। বকুল তবু অবুঝের মত জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কি অসুখে মরল বাবা ? শীলা-লীলাদের মত আমার কি জ্যাঠামণি ছিল ? তাঁর কি নাম ছিল মা ?'

ধৈর্যের সীমা আছে সকলেরই। প্রমদাকেও একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতে হয়েছে, 'রাতদিন অত আমি বকতে পারি নে বাপু, যা বলেছি বলেছি। আর আমি কিচ্ছু জানি নে।'

কিন্তু প্রমদা না জানালে কি হবে, বকুল ক্রমে ক্রমে সবই জেনেছে। বস্তিতে কুট-কচালো লোকের তো অভাব নেই। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, ইশারা ইঙ্গিতে সবই বুঝতে পেরেছে বকুল। ঝগড়ার সময় প্রতিবেশিনীদের ভাষা আরও স্পষ্ট, আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বকুলের খেলার সঙ্গীরা পর্যন্ত খোঁটা দিয়েছে, 'বেশ্যার মেয়ে, তোর বাপের ঠিক নেই ! তুই কেন খেলতে আসিস আমাদের সঙ্গে ?'

প্রমদা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে গিয়েছে তাদের মারতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় তাদের বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। বকুল ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি মাকে হাত ধরে ঘরে টেনে এনেছে। 'মা, চুপ কর, চুপ কর।'

কিন্তু ক'বছর পরে সেই দুঃখের দিনগুলিও গেছে। নিজের কুল-পরিচয়ের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা বকুল মাকে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার সঙ্গে বস্তির কারো আর ঝগড়া হয় না। কারো সঙ্গে বড়-একটা মিশতে যায় না বকুল। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে ফিরে আবার বই নিয়ে বসে।

প্রমদা মাঝেমাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বই তুই কোত্থেকে পাস, বকুল ?'

বকুল জবাব দেয়, 'শহরে বইয়ের কি অভাব আছে, মা ? স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে আনি, দিদিমণিদের কাছ থেকে আনি।'

প্রমদা বলে, 'বই ছাড়া তুই কি দুনিয়ায় আর কিছু চোখে দেখতে পাস নে ? লীলারা কেমন সুন্দর তাদের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে, তোর সঙ্গে বুঝি কারো ভাব নেই ?'

আছে।'

'তবে আনিস নে কেন তাদের ?'

বকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ভয় করে মা। যদি তারা আমাদের

ঘেন্না করে।

প্রমদা হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পায় না।

স্কুল থেকে ভালভাবে পাস করে কলেজে ভর্তি হল বকুল। কিন্তু মেয়ের স্বভাব বদলাল না। সেই বইয়ের রাশ, ঘরের কোণ আর নিজের মন নিয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ার আর কিছুতে ওর কোন আসক্তি নেই।

ওর সমবয়সী শীলা লীলা দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে একজন ছেলে কোলে নিয়ে আর একজন পেটে নিয়ে বাপের বাড়ী এলো বেড়াতে। প্রমদার সাজা পান খেয়ে তারা ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করল। শেষে লীলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসীমা, ওই গোমরামুখীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন। ওর যা ভাবভঙ্গি দেখছি, কবে যে ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে ঠিক নেই।'

সন্ন্যাসিনী হতে বাকিই বা কি। বকুল গয়নাগাটি কিছু পরে না, অত বড় চুলের গোছ মাথায়, কিন্তু ভাল করে যত্ন নেয় না। মেয়ে তো নয়, এ এক অনাসৃষ্টি।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বকুল, লীলাকে দেখে তোর কি হিংসে হয় না?'

'হিংসে কেন হবে মা?'

'তুই কি চাস বল তো?'

বই থেকে মুখ তুলে বকুল মৃদু হাসে। 'সেই তো সমস্যা। কী চাইব বল তো?'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলে, 'হাসিস নে বাপু, তোর হাসিতে আমার গা জ্বলে। কী চাইবি, তা-ও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? সোয়ামী, সংসার, গা-ভরা গয়না, কোলভরা ছেলে। মেয়েমানুষে দুনিয়ায় আর কী চায়।'

বকুল বইয়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলে, 'ও-সব আমি কিচ্ছু চাই নে।

প্রমদা গালাগাল দিয়ে ওঠে, তা, চাইবি কেন, পোড়াকপালী, হতচ্ছাড়ী। এ যে রক্তের দোষ, ঘর সংসারে তোর মন চাইবে কেন? কিন্তু তুই চাস নে, আমি চাই। যেমন করে পারি জামাই আমি আনবই।'

বকুল বই নিয়ে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে।

রাগে জ্বলে যায় প্রমদা। ইচ্ছে করে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি ওই বইয়ের রাশ। বই তো নয়, শত্রু। ওই বইপড়া বিদ্যার জন্যেই মেয়ে তার এমন করে পর হয়ে গেছে। ও কী ভাবে, কি চিন্তা করে, তা প্রমদা বুঝতে পারে না! এমন কি ওর মুখের ভাষা পর্যন্ত যেন আলাদা। অথচ এই মেয়েকে বুকে করেই এই মেয়ের সুখের জন্যই প্রমদা অকালে নিজের সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে। এক এক সময় তার মনে হয়, এর চেয়ে বকুলকে নিয়ে তার সেই কৃপানাথ দে লেনেই পড়ে থাকা ভাল ছিল। বাড়িওয়ালী মাসীর মেয়ে আলতার মত বকুলেরও সেখানে দর থাকত, আদর থাকত। আর বকুলের খাতিরে খাতির বাড়ত প্রমদার। সব আটঘাট, ফিকির-ফন্দী বকুলকে সে শিখিয়ে দিত। যেমন বাড়ীওয়ালী মাসী শেখায় তার মেয়েকে। হয়তো তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে চুলোচুলি খুনোখুনি হত, যেমন আলতা আর তার মা বিনী মাসীর

মধ্যে প্রমদা হতে দেখেছে। কিন্তু ঝগড়া মিটে গেলে আবার সুখ-দুঃখে কথাও হত দুজনের মধ্যে, একজন আর একজনের যত্ন করত, মাতাল হয়ে পড়ে থাকলে বিছানায় তুলে দিত, খারাপ অসুখ বিসুখ হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করত, মা মেয়ে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোত না। কেউ কাউকে ঘৃণা করত না। নিজের রক্তমাংসের মেয়েকে একেবারে নিজের করে পেত প্রমদা। বকুল তখন মা র কাছ থেকে এমন দূরে-দূরে থাকতে পারত না, মনে মনে এমন করে ঘৃণা করতে পারত না। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে ভারি আহাম্মকিই করেছে প্রমদা।

কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে অফিসে ঢুকে একমাস বাদে যখন মাইনের টাকাগুলি তার হাতে এনে দিল বকুল, প্রমদার মন অন্যরকম হয়ে গেল। সে যা ভেবেছিল তা নয়। মেয়েটার মনে তাহলে সত্যিই মায়া মমতা আছে।

'এই কি সব টাকা, বকুল ?'

'হ্যাঁ মা, সব।'

'হ্যাঁ রে, সব দিলি ? তোর নিজের কাছে কিছুই রাখলি নে ?'

'না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

এতখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে করত না। নিজের রোজগারের পুরো টাকা তো ভাল অর্ধেক টাকা, সিকি টাকাও সে মাকে প্রাণ ধরে দিত না কোনদিন। তার চেয়ে প্রমদার বকুল হাজার গুণ ভাল, লক্ষ গুণ ভাল।

প্রমদা এগিয়ে সস্নেহে মেয়ের চিবুক তুলে ধরল, 'হ্যাঁ রে বকুল, আমি কি তোর কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা চেয়েছি।'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসারে টাকারও তো দরকার আছে, মা।'

প্রমদা বলল, 'না কোন দরকার নেই। টাকা আমি যেমন করে পারি আনব। ঝি গিরি করব, পান বিক্রি করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাছে আমি টাকা চাই নে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কি চাও ?'

'কি চাই ? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলি নে ? আমি আমার জামাই চাই, ঘর-ভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা বাড়ির বউয়ের মত আমি তোকে ভরা-সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল।'

প্রমদার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

বকুল কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর থেতে বসে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড অফিস। ঠিক যে-তেতলা বাড়িটার সামনে বসে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের মত আরো কত মেয়ে আছে সেখানে। শুধু মেয়ে ? না, শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হয়ে বলে, 'বলিস কি ? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি ?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো যেও একদিন।

কিন্তু ওই কথাই। সত্যি-সত্যি প্রমদাও যায় না, বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচ-ছয় চাকরি করতে না-করতেই মেয়ের বেশে-বাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রমদা। বকুল আগে পরত আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙিন তাঁতের শাড়ি পরেই বের হয়। সে রং কখনো সবুজ, কখনো গোলাপী, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রং গৌর। ওকে সব রংই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখির বাসা; এখন বকুল নিজেই বিনুনি করে। সে-বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচে যায়। কোনদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো-পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন এক একটি করে সে-সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের করে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পরেনি।

এবার বলল, 'ওই-সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে মনে হাসল—ভিতরে-ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।

বকুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হাসছ যে।'

প্রমদা বলল, 'হাসলাম আবার কই। বেশ তো, ও-সব ডিজাইন পুরনো হয়ে গিয়ে থাকে, হালের নতুন ডিজাইন গড়িয়ে নে। দুবার বলার পর নিমরাজী, তিনবারের পর পুরোপুরি রাজী হয়ে গেল বকুল।

তারপর ক্রমে মেয়ের চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে আরো অনেক কথা টের পেল প্রমদা। এ কেবল শাড়ি বদল নয়, মেয়ের ঘর-বদলের দিনও এসেছে। বকুল আজকাল আর শুধু মনে-মনে বই পড়ে না, সুর করে ছড়া আওড়ায়। ছড়া বললে বকুল ভারি রাগ করে। ও বলে, কবিতা। বেশ, না হয় কবিতাই হল। তুই যা বলে খুশী হোস তাই বল। এতদিন বইয়ের শুকনো পাতা ছাড়া কোন দিকে মেয়ের লক্ষ্য ছিল না। এখন গোছায়-গোছায় নিয়ে আসে রজনী গন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল, বকুলের খোঁপায় লাল গোলাপ ফুল গোঁজা।

ও যখন ছোট ছিল এক বিছানায় শুত প্রমদা। কিন্তু বড় হওয়ার পর মেয়ে নিজেই আলাদা বিছানা করে নিয়েছে। কিন্তু সে বিছানাও প্রমদা নিজে পেতে দেয়। মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে মেয়ের বিছানার কাছে সেদিন একবার দাঁড়াল প্রমদা, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'বকুল, আমার কাছে আর লুকোসনি। বল না সে কে?'

'কার কথা বলছ, মা?'

'তুই যাকে ভালোবেসেছিস। তোকে যে ভালোবেসেছে।'

'কি বাজে বকছ। আমাকে আবার কে ভালোবাসবে?'

প্রমদা একটু হাসল, 'আচ্ছা বকুল, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর

পেটে হয়েছি !'

বকুল তরল সুরে বলল, 'তুমিই আমার পেটে হয়েছ, মা। লক্ষ্মী খুকু, যাও, এখন ঘুমোও গিয়ে। রাত অনেক হয়ে গেছে।'

প্রমদা হাসি চেপে নিজের বিছানায় গিয়ে শোয়। আজ গোপন করল, কিন্তু কদিন আর তার কাছ থেকে সব গোপন রাখতে পারবে বকুল। কালই হোক, পরশুই হোক, বলতে তাকে হবেই।

অনেক রাত অবধি সেদিন প্রমদার ঘুম এলো না। বার বার মনে পড়তে লাগল সেই প্রথম মানুষটির কথা। সে বলেছিল প্রমদাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। প্রমদা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল, মানুষের সব কথাই বুঝি সত্যি। প্রমদা ভারি বোকা ছিল তখন। তারপর ক্রমে বয়স বাড়ল, জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ল। প্রমদা চিনতে শিখল মানুষকে। এমন অবিশ্বাসী জীব দুনিয়ায় আর দুটি নেই। তার কথা মানেই মিছে কথা। কিন্তু এমন শুভদিনে এ-সব কি অলুক্ষণে কথা মনে আনছে প্রমদা। তার চেয়ে বকুলের যে-বর আসবে তার কথা ভাবুক। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তার অল্প বয়স, কিন্তু অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি। যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। এতকাল তপস্বিনী থেকে বকুল কি আর যাকে তাকে পছন্দ করেছে। সে কি প্রমদার তেমন মেয়ে।

আর একদিন মেয়েকে প্রমদা অনুরোধ করল, 'তার নামটা আমাকে বল না, বকুল।'

বকুল ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কি যে বল, মা। কার নাম আবার বলব ?'

প্রমদা একটু হাসল, 'নাম ধরে ডাকতে তোর লজ্জা করছে, আচ্ছা তাকে তুই আপিসের পর একদিন আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি তার কাছে থেকেই সব জেনে নেব -'

বকুল একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তাকে কি এ-সব জায়গায় আনতে পারি মা ?

প্রমদা বলল 'খুব বড়লোক বুঝি ? তবে থাক, এই বস্তির মধ্যে তাকে আর এনে কাজ নেই। এবার একটা ভাল ঘর-টর দেখে উঠে যেতে হবে। আর এই নোংরা বস্তির মধ্যে আমরা পড়ে থাকব না।'

বকুল যেন নিজের মনেই বলল, 'শুধু বাড়িঘর বাদলানেই বা কি হবে।'

প্রমদা একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ, নিজের মা বদলাতে না পারলে বুঝি তুই আর তাকে আনবি নে! আমাকে এত ঘেন্না তোর! কেন কী করেছি আমি? জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তুই আমাকে মদ খেতে দেখেছিস, না কোন পুরুষের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেখেছিস, যে এত ঘেন্না করবি তুই আমাকে? হায়, হায়, দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কি সাপই আমি পুষেছি রে! এর চেয়ে তখন যদি বিনী মাসীর কথা শুনতুম, বিক্রি করে দিতুম, সে টাকা আমার আখেরে লাগত।'

বকুল বলল, 'চুপ কর মা। ঘরে-ঘরে সবাই কান পেতে রয়েছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে তোমার কথা।'

প্রমদা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'শুনুক, আমার বয়ে গেল।'

ঘর-সংসারের কাজ সেরে খানিক বাদে প্রমদা মেয়ের খোঁজ নিতে এসে দেখল, বকুল তার ছোট্টো টেবিলখানির উপর মাথা নুইয়ে চুপ করে রয়েছে। পিঠ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশ। প্রমদা আস্তে আস্তে সেই চুলগুলির উপর হাত রাখল। পরের বাড়িতে বাটনা বেটে-বেটে ক্ষয়ে গেছে, ফেটে গেছে আঙুলগুলি। বকুলের মসৃণ চুলের রাশের ওপর নিজের খরখরে, খসখসে হাতখানা রেখে একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রমদা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বকুল, তুই কাঁদিস নে। সত্যি আমি তোর মা হওয়ার যুগ্যি নই মা, আমি যুগ্যি নই।'

বকুল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোট মেয়ের মত প্রমদাকে আঁকড়ে ধরল, 'ও-কথা বলো না, মা।'

জল-ভরা ঝাপসা চোখে আর দুটি ছলোছলো কালো চোখের দিকে তাকাল প্রমদা, তেমনি আস্তে-আস্তে বলল, 'সত্যি বকুল, আমি তোর মা নই। আমার কথা তার কাছে তুই বলিস নে। বলিস, তোর আসল মা তোর ছেলেবেলায় মরে গেছে। সে ঠিক তোর মতই ছিল, তোর মতই লেখাপড়া জানত, ভদ্দরলোকের ঘরে থাকত, ভদ্দরলোকের সঙ্গে মিশত। আমি তোর মা নই বকুল, সে-ই ছিল তোর আসল মা। আমি কেবল তোকে পেলে পুষে বড় করেছি।'

বকুল ধরা গলায় বললে, 'কোথায় বড় করেছ, মা। আমি সেই ছোটই রয়ে গেছি।'

প্রমদা নিজের কথাই বলে চলল, 'তাকে আমার কথা বলে দরকার নেই, তাকে আমার সামনে এনে দরকার নেই তোর। শুধু একবার আড়াল থেকে আমাকে দেখাস। এখানে আনতে হবে না। আমি তোর অফিসের সামনে বসে পান বেচতে-বেচতে একবার শুধু তার মুখখানা দেখে নেব।'

বকুল বলল, 'ছিঃ, মা। আবার ও-সব কথা বলছ। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব। সে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমাকে প্রণাম করবে। সে মোটেই অহংকারী নয় মা! সে বড় ভাল।'

'সত্যি!' প্রমদা একটু হেসে মেয়ের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখে জল, ঠোঁটে হাসি!

বকুল লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ মা সত্যি। অত ভাল আমি আর কাউকে দেখিনি।'

প্রমদার দুটি কান যেন মধুতে ভরে গেল। আর তার কিছু জানবার দরকার নেই? নাম নয়, ধাম নয়, অবস্থার কথা নয়। মানুষ ভাল হলেই সব হয়। ভালোবাসলেই সব পায়।

কিন্তু তারপর ফের মাস দুই যেতে না-যেতেই দেখা গেল, বকুলের আবার পরিবর্তন

শুরু হয়েছে। ওর মুখে হাসি নেই। গলা ছেড়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয়েছে। চুল বাঁধায়, রঙিন শাড়ি পরায় তার ফের সেই ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। কদিন বাদে গয়নাগুলিও বকুল খুলে ফেলল।

প্রমদা এবার রাগ করে বলল, 'তোর কি হয়েছে রে ?'

বকুল বলল, 'কি আবার হবে ?'

প্রমদা বলল, নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে '

বকুল চুপ করে রইল।

প্রমদা এবার হেসে বলল, 'যত ভাল ছেলে আর ভাল মেয়েই হোক, দুজনে কাছাকাছি এলে ঝগড়া দু-চার বার হবেই। সেই দোতলার বউটিকেও দেখতুম। সোয়ামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত যেমন ভাব ঠিক তেমনি ঝগড়া। ঝগড়া শুনে মনে হত ওরা বুঝি কোনদিন জীবনে কেউ আর কারো মুখ দেখবে না। কিন্তু দু-দণ্ড যেতে না যেতেই আবার তাদের মধ্যে বেশ মিলমিশ হয়ে যেত। বিয়ে করা সোয়ামী, একজন আর-একজনকে ফেলে যাবে কোথায়। তোরা এবার বিয়ে করে ফ্যাল বকুল।

মুখ নিচু করে বকুল বলল, 'তার আর উপায় নেই, মা।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, সে কি রে! বিয়ে করার উপায় নেই কেন? সে কি জাতের কথা তুলেছে? তাকে বলিস, তুই বামুনের মেয়ে। আমি যা ই হই, জাতে সে বামুনই ছিল। পৈতে ছিল গলায়। বামুনের চেয়ে তো উঁচু জাত কিছু আর নেই। তার মেয়েকে সবাই বিয়ে করতে পারে।'

বকুল তেমনি নতমুখে বলল, 'বামুন-কায়েতের কথা নয় মা, তার ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয় আছে। আমাকে সে আর বিয়ে করতে পারে না।'

প্রমদা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'গোড়া থেকে তুই সব জানতিস ?'

বকুল বলল, 'না। আমিও তাকে সব কথা জানাইনি, সে-ও আমাকে সব কথা বলেনি। কিন্তু তার কথা যে এত মারাত্মক সে আমি ভাবতে পারিনি, মা !'

প্রমদা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু বিয়ে করেছে, করেছে; ছেলেমেয়ে আছে, আছে। তোর কাছে তাকে আসতেই হবে। অমন কত সুন্দরী গরবিনী বউয়ের স্বামী, কত সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ের বাপকে আমি ঘর ছাড়িয়েছি, আর তুই একজনকে ছাড়াতে পারবি নে? খুব পারবি। কি করে পারতে হয় আমি তোকে শিখিয়ে দেব।'

বকুল বলল, 'ছিঃ, মা, চুপ কর!'

আস্তে-আস্তে সেখান থেকে উঠে চলে গেল বকুল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের সেই যাওয়ার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে প্রমদা দ্রুত-পায়ে তার পিছনে-পিছনে গেল। তারপর খপ্ করে মেয়ের একখানা হাত শক্ত করে ধরে কঠিন স্বরে বলল, 'বকুল, আমার দিকে তাকা। আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বল।'

কিন্তু বকুল আর মুখ তুলল না।

প্রমদা মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের এক কোণায় নিয়ে এলো। দোর-জানলা সন্তর্পণে বন্ধ করে গলা নামিয়ে বলল, 'পোড়ারমুখী, নিজের এমন সর্বনাশ কেন করতে গেলি! তুই-না লেখাপড়া শিখেছিস!'

বকুল তেমনি চুপ করে রইল।

প্রমদা বলল, 'আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুই আমার পেটের মেয়ে আমার চোখে এই তিন মাস ধরে ধুলো দিয়েছিস, আমার কাছে কেবল মিছে কথা বলেছিস। কেন এমন সর্বনাশ করলি বকুল? কেন না জেনে-শুনে নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিলি! ভেবেছিলি সব দিলেই বুঝি সব পাবি। ওরে পোড়াকপালী, যারা অমন করে নেয়, তারা কিছুই দেয় না, কিছুই দেয় না।' চাপা কান্নায় গলা ধরে এলো প্রমদার।

কিন্তু বকুলের চোখে একফোঁটাও জল নেই।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও মা, যেতে দাও আমাকে।'

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাবি তুই মুখপুড়ী, দুদিন বাদে যে আর তুই বেরুতেও পারবি নে। তোকে ঘরেই বা কদিন আমি লুকিয়ে রাখতে পারব। আমার সেই বিনী মাসী এখনো বেঁচে আছে। তোকে তার কাছে রাখব। সে সব ফিকির-ফন্দী জানে। ডাক্তার বদ্যির বাবা। চল আমার সঙ্গে।'

বকুল শঙ্কিত হয়ে বলল, 'না মা, সেখানে আমি এক মুহূর্তও টিকতে পারব না।'

প্রমদা বলল, 'ঈশ্, কি আমার সতীসাধ্বী রে। না টিকতে পারবার কি হয়েছে। সে তোকে নিজের মেয়ের মত রাখবে।'

বকুল বলল, 'না। আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজ করব।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কী ব্যবস্থা করবি তুই! এ-সবের কী তুই জানিস! ব্যবস্থা করতে-করতে বুড়ী হয়ে গেলাম। তবু এখনো আমাদের গা কাঁপে।'

বকুল মৃদু হাসল, 'আমার গা কাঁপে না, মা। তার সব চিহ্ন আমি মুছে ফেলব।'

প্রমদা বলল, 'সেই হাড়হাভাতে আঁটকুড়োর ব্যাটার নামটা এবার বল। সব খরচ তার কাছ থেকে আদায় করব, সহজে না দেয় আদালতে নালিশ করব। কি নাম তার?

বকুল বলল, 'তার নাম মুখে আনার মত নয়, মা। এতদিন যখন শোননি, আজও সে-নাম তোমার শুনে কাজ নেই।'

প্রমদার কোন পরামর্শই বকুল নিল না। অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিল। গয়না বিক্রি করল। মোটা-মোটা বইগুলি সব বিক্রি করে ফেলতে তার চোখে জল এলো।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রমদার পায়ের ধুলো নিয়ে বকুল বলল, 'আসি মা।'

প্রমদার মনে পড়ল, বকুল বলেছিল, তার পায়ের ধুলো আর-একজন এসে নেবে। প্রমদা ভেবেছিল ওরা দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেবে। সেদিন আর এলো

না। আজ না আসুক, একদিন আসবেই। যেমন করে পারুক, বকুলের বিয়ে দেবেই প্রমদা। বয়সের মেয়ে। শরীর সারতে ওর আর কদিন লাগবে।

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস? কত দূরে?,

বকুল বলল, 'দূরে নয়, মা। এই শহরের মধ্যে। খুব ভাল ডাক্তারখানা। ভারি যত্ন করে। টাকা পেলে তারা সব করে।

প্রমদা বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিয়ে যা। আমি তোকে দেখতে যাব।'

একটু ইতস্তত করে এক টুকরো কাগজে মাকে ঠিকানাটা লিখে দিল বকুল।

প্রমদা সেই কাগজখানা হাত পেতে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া।'

তারপর বাক্সর ভিতর থেকে একটা পুরনো কবচ এনে বকুলের বাহুতে যত্ন করে বেঁধে দিয়ে বলল, 'এটা পরে থাকিস, বকুল। আমাদের সেই বিনী মাসীর দেওয়া কবচ। আপদে-বিপদে সকলেই এতে ফল পেয়েছে। তুই তো বিনী মাসীর কাছে গেলি নে। ও-সময় কিন্তু তার নামটা স্মরণ করিস। ধন্বন্তরী আমাদের বিনী মাসী। পুরো নাম বিনোদিনী দাসী। মনে থাকবে, বকুল?'

বকুল একটু হেসে বলল, 'থাকবে।'

দুদিন বাদে সেই গোপন ডাক্তারখানার লোকেই রাত্রির অন্ধকারে গোপন সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো বকুলকে বাঁচানো যায়নি।

মাস-কয়েকের জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রমদার। পোড়া অফিসের ঘরে-ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে দাবি করত, 'কে আমার মেয়েকে খুন করেছে, বাপের বেটা হও তো বলো। তাকে ফিরিয়ে দাও।'

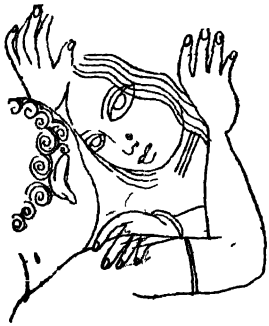
গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। অফিসের দারোয়ান পাগলীকে জোর করে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে কিছুতেই তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।

বন্ধ-দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে মাথা ফের ঠিক হয়ে গেছে প্রমদার। পাইকপাড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার সে ঠিকে-কাজ নিয়েছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটলি নিয়ে অফিসের সামনে আগের মত ফের বসতে শুরু করেছে। তার বকুলের অফিস।

পান বিক্রি করতে-করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। তার ঝাপসা চোখে আর জ্বালা নেই। সে জানে, কোনোদিন সে শোধ নিতে পারবে না। শোধ নিতে আর চায়ও না প্রমদা। কি হবে শোধ নিয়ে। যে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবে। শোধ নিতে চায় না প্রমদা। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। বকুল যাকে ভালোবেসেছিল তার মুখখানা কেমন। শুধু একবার দেখবে।

শনি

সন্তোষকুমার ঘোষ



বাবরী চুলের নিচে কামানো ঘাড়, পাউডারের ছোপ, ডানধারে বোতামওয়ালা পাঞ্জাবির তিনটে বোতামই খোলা। গোঁফের অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কী একটা কুটিল সংকল্পের ইঙ্গিত।

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিনুনী করছিল, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, কপালে এরি মধ্যে ক'ফোঁটা ঘাম জমেছে। আবার একটু ক্রীম ঘষতে হ'ল।

তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে যমুনা নেমে এল নিচে। যদি নিরস্ত করতে পারে; আলের ওপর শুয়ে পড়েও ঠেকাতে পারে সর্বনাশের বন্যাজল।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই লোকটা ঢুকে পড়েছে! কপাটটা ভেতর থেকে দিয়েছে ভেজিয়ে।

দরজার বাইরে ধুলোয় থপ করে বসে পড়ল যমুনা। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পর এ ধুলোটুকুর ওপরও আর কোন অধিকার থাকবে না। নরেশ যখন সব জানতে পারবে। যেমন আছে, এই পোশাকেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হবে, হয়ত ঐ লোকটার সঙ্গেই, কালাপাহাড়ি নিষ্ঠুরতা নিয়ে আজ যে হানা দিয়েছে। বিশ্বাস বাসুকি উঠে এসেছে পাতালের নিমন্ত্রণ নিয়ে।

দরজার ওপর কান পাতল যমুনা। বন্ধ ঘরের কথাবার্তা, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেবল ফিস ফিস শব্দে একটা হীন চক্রান্তের ইঙ্গিত।

লোকটা যা বলবার সব বলেছে সন্দেহ নেই। ওর সাপুড়ের ঝাঁপি খুলেছে। যমুনার জীবনে একটিমাত্র মিথ্যা, একটিমাত্র প্রবঞ্চনা ফুল হয়ে উঠেছিল, তার এক-একটি পাপ্ড়ি খুলছে।

যমুনার লোভ হ'ল, একবার শোনে উত্তরে কী বলছে নরেশ। সে কি বিশ্বাস

করেছে ? বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী। লোকটা এত তোড়জোড় করে যখন এসেছে, তখন কি আর উপযুক্ত প্রমাণ-দলিল না নিয়েই এসেছে।

দু'একবার মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল নরেশের। কথাগুলো যমুনা বুঝতে পারলো না, কিন্তু স্পষ্ট যেন দেখতে পেল, অপ্রত্যাশিত, মর্মান্তিক সত্যের আঁচ লেগে চোখ-মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কঠিন আঙুলের শিরাগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে, চেয়ারের হাতল শক্ত মুঠিতে ধরে মাথা নিচু করে বসে আছে। পানপাত্র একবার নিঃশেষ করে লোকে যেমন শূন্যপাত্র এগিয়ে দিয়ে আবার ভরে দেবার নির্দেশ দেয়, তেমনি ভাবে একটু একটু শুনছে নরেশ, ওর মাথাটা বুঝি একটু একটু টলছে; বলছে, তারপর, তারপর।

যমুনা জানে তারপর কী। ঐ লোকটা বেরিয়ে যেতেই নরেশ নেমে আসবে টলতে টলতে। রাগে ঘৃণায় আরক্ত চোখে তাকাবে যমুনার দিকে। তারপর? লাথি মারবে, না চুলের ঝুঁটি ধরবে? নাকি গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে সদরে?

দিক। যমুনাও শক্ত করে বেঁধেছে মন। দু'দিনের স্বর্গসুখ যদি ঘুচেই যায়, যাক তবে। আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালো যমুনা। অল্প অল্প পা টলছে। তবু রেলিং ধরে অনায়াসেই উঠতে পারলো ওপরে।

টেবিলের ওপর বিকেলে তুলে আনা ফুলগুলি এখনো অম্লান। বিছানার ওপর নতুন ভাঁজভাঙা চাদরটা পরিপাটি! সমস্ত মুখটা তেতো হয়ে গিয়ে একটা কান্না এলো যমুনার। এ বিছানায় আর কোনদিন শোওয়া হবে না। ফুলতোলা বালিশের মসৃণ ওয়ারগুলোর ওপর যমুনা একবার হাত বুলিয়ে নিল; ভিজে ওঠা কপোল বালিশের ঈষদুষ্ণ কোমলতার মধ্যে ডুবিয়ে চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। এ স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, থাকনা।

কিন্তু একটু পরেই উঠতে হল তাকে। সারা শরীরে একটা অস্থিরতা, বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে। কতক্ষণে যাবে ঐ লোকটা, কতক্ষণে ওপরে উঠে আসবে নরেশ।

আঁচলের চাবির গোছা খুলে যমুনা টেবিলের ওপর রাখলো। গয়না সামান্যই আছে গায়ে, এগুলো প্রায় সবই নিয়ে যাবে। নতুন ব্যবসায়ের এগুলোই হবে পুঁজি।

কিন্তু এই দুল জোড়াটা? এটা নরেশের দেওয়া। এটাকে তো খুলে যেতে হবে। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যমুনা চোখ থেকে গড়িয়ে নামা চোখের জলের ভিজে দাগ ঘষে ঘষে তুললো আঁচল দিয়ে। তারপর দুল জোড়া খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেঁপে যাওয়া হাত কেবলি ফসকে গেল। কানের গোড়ার চুলের সঙ্গে দুলজোড়া এমন জড়িয়ে গেছে, যে কিছুতেই খোলা গেল না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। যাক তবে। নিজ হাতেই নরেশ এটা খুলবে। হয়ত দেবে একটা হ্যাঁচকা টান, কানের লতি যাবে ছিঁড়ে, কয়েক ফোঁটা রক্ত আর চুলে জড়ানো দুলজোড়া নরেশ রেখে দেবে পকেটে। একটু ব্যথা হয়ত করবে যমুনার, শির শির করবে কান দুটো, শরীরটা যাবে কাঠের মতো নিস্পন্দ হয়ে, দাঁতে চাপা ঠোঁট দিয়ে একটা যন্ত্রণাসূচক অব্যয় বেরিয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তবু সে এমন বেশি কী! যমুনা একবার

দেখতে চায় কতো নিষ্ঠুর হতে পারে নরেশ।

টাইমপীস ঘড়িটা বাজছে টিক টিক করে। যমুনা তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছ'টা। ঐ শব্দ জানান্ দিচ্ছে, ফুরিয়ে এল, যমুনার বধূজীবনের পরমায়ু ফুরিয়ে এল। ঐ শব্দের সঙ্গে তাল মেলে একমাত্র যমুনার আতঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের। নিজের বিবাহিত জীবনের এই ক'টা দিনকে মনে মনে থিয়েটারের দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতির সঙ্গে তুলনা করলো যমুনা। অন্ধকার, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহ, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো, কয়েক মিনিটের জন্যে সব ক'টা দরজা গেল খুলে, কিন্তু তারপরেই আবার অন্ধকার।

অন্ধকার ছাড়া কী ! নদেরচাঁদ বাই লেনের দিনগুলিকে অন্ধকার ঘরের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কী মনে হতে পারে। আবার যমুনা ফিরে যাবে সেখানেই। মাকে গিয়ে বলবে, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনেক সেলামি দিলুম মা, এবার ক্ষ্যামা দাও। আমি যা তাই থাকতে দাও।

তখন কী ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে মাতঙ্গের মুখ ? কী যে উদ্ভট খেয়াল হয়েছিল মাতঙ্গের। নিজের সারাজীবন কেটেছে নদেরচাঁদ লেনের পাঁকে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই বেসুরো হারমোনিয়ামের আওয়াজ আর ঘুঙুরের বোল ওঠে। রাত একটা দু'টো পর্যন্ত শোনা যায় রিক্সার ঠুন ঠুন ; প্রমত্ত নিশাচর বীটের পাহাড়াওয়ালাকে পালিয়ে ফেরে।

কিন্তু এ জীবনে মাতঙ্গের রুচি ছিলনা। সে স্বপ্ন দেখতে একটি ছোট নীড়ের, যেখানে সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজে, ধূপ-সুরভি ঠাকুর ঘরে একটিমাত্র স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ জ্বলে।

মাতঙ্গের চোখের ওপর টিয়া বাড়ি কিন্‌লে, তারও বয়স হয়েছিল, সেই বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসল মাসি হয়ে। আর মাতঙ্গকে শেষ বয়সে করতে হ'ল বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি। সময় থাকতে গুছিয়ে নিতে পারেনি, ওর চেহারাটাই দুষ্‌মনি করেছে ওর সঙ্গে। ভারি গলায় গান উঠতো না, মোটা আঙুলে বাজতো না বাজনা। এখনো বাজনা, কাঁসার বাসনে শালপাতার বাজনা বাজিয়েই মাতঙ্গের জীবন গেল। টিয়া ওকে করুণা করত। বলত, তুই নিজে তো কিছুই করতে পারলিনি মাতঙ্গ, তোর মেয়েটাকে আমায় দে। ভরা-ভরা শরীর, রোজগারের সময় তো এই ! গলাটাও মিঠে, ওকে আমি এমন গান শেখাবো যে লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজিরাও হার মানবে।

টিয়া মাসির বাড়ির সেই হাতে খড়ির দিনগুলি মনে হতেই গায়ে এখনও কাঁটা দেয়। বিকেল হতেই দল বেঁধে গা ধোওয়া। পাতা কেটে, চুল বেঁধে খয়েরি টিপ পরা। তারপর খোলা দরজার দু'পাশের রক ঘেঁষে দু'সার দিয়ে দাঁড়ানো। ওদের মধ্যে তরঙ্গ আবার ছিল সবচেয়ে সাহসিকা। মাঝে মাঝে সে বেরিয়ে গিয়ে সদর রাস্তা কি পার্ক থেকে খদ্দের নিয়ে আসতো। সুবিধে পেলে রাস্তার লোকের হাত ধরে টানাটানি করতেও পেছপা হ'ত না।

কোলে একটা বেড়ালের ছানা, ডান হাতে বিড়ি, তরঙ্গের চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে যমুনার।

প্রথম প্রথম যমুনার বুক ঢিপ ঢিপ করত। চৌকাঠ পেরিয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজটাতে দাঁড়িয়ে লোকগুলো দেশলাই জ্বালতো, কিন্তু সিগারেট ধরানোর পরেও নেবাতো না কাঠি। একে একে সবার মুখের সমুখ দিয়ে 'পুড়ে আসা কাঠিটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতো। সৌরভী, তরঙ্গরা কুৎসিত একটা গালাগালি দিতো, কিম্বা খিলখিল হেসে গড়িয়ে পড়ত এ ওর গায়ে। আর যমুনা দু'হাত দিয়ে ওর মুখটা দিতো আড়াল করে। মনে মনে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, আমাকে যেন পছন্দ না করে।

তবু কেউ না কেউ পছন্দ করতই। সেই অপরিচিতদের নিয়ে দরজায় খিল দিতে গিয়ে হাত সরতো না, বুক দুরু দুরু করতো, সমস্ত শরীর আসতো অবশ হয়ে। ওদের হাতে জড়ানো বেলফুলের মালার উগ্র সুবাস ছাপিয়ে উঠতো পানীয়ের গন্ধ।

পরদিন সকালে আবার যে কে-সেই। স্নান শেষে শরীরটাকে মনে হত প্রথম বর্ষার ভেজার মাটির মত স্নিগ্ধ, সরস, নরম।

টিয়া মাসি কোন কোন দিন নিয়ে যেত গঙ্গায়। ঘাটের উড়ে ঠাকুরের হাতে তিলক কেটে টিয়া মাসি ফিরত এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে। ঘরদোর বিছানায় সেই জল ছিটিয়ে দিতো মাসি। বলত, পাপ, পাপ, পাপে চারদিক ভরে গেল।

প্রথম প্রথম বিস্মিত হ'ত, পরে শুধু মজা পেতো যমুনা। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর এই টিয়া মাসিরই আবার অন্যরূপ। সে তার চুলগুলোকে আলগা একটা গিঁট দিয়ে স্তূপ করে রেখেছে মাথার ওপর, মাংসল শরীরটার আবরণ ঢিলে করে দিয়ে হিসেব নিচ্ছে সকলের কাছে।

সহজ হিসেবের ওপর আরেকটা উপরি হিসেব ছিল টিয়া মাসির। আইনকে নলচের আড়াল দিয়ে চুপে চুপে চোলাই মদের ব্যবসা চালাতো। অবশ্য যারা আসতো ওদের কাছে, তাদের অনেকেই আগে থেকে চুর হয়ে আসতো। কিন্তু তবু প্রায়ই এখানে এসে ওদের তেষ্টা পেতো। তখন হয়ত নিশুতি রাত। কোথায় আছে নির্ঝরিণী?

আছে। টিয়া মাসির কাছে আছে। ওর তোষক ঢাকা তক্তপোষের আলগা পাটাতনের নিচে চোরা সিন্দুকে ঝক্ঝকে বোতল সর্বদাই মজুত। খিল খুলে এক একটি মেয়ে বাইরে আসে, টিয়া মাসি বারান্দার কোণেই দাঁড়িয়ে। কীরে, কী চাই? কাছে এসে অন্তরঙ্গ সুরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েরা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, আছে?

আছে। ক' বোতল?

সন্তর্পণে তোষক তুলে, তালা খুলে চোরা সিন্দুকের রহস্য উন্মোচন করে টিয়া মাসি। আঁচলে দশ-বিশ টাকার নোট বাঁধতে বাঁধতে বলে, ভাগ্ এবার। পালা। যতো সব পাপ জুটেছে এখানে।

মুখ টিপে টিপে হাসে মেয়েরা। আর ক' বোতল আছে টিয়া মাসি? তখন টিয়া মুখ খুলে গাল পাড়তে শুরু করে। বোতল? কিসের বোতল। সিন্দুক ভর্তি সবতো গঙ্গাজল।

শুধু গঙ্গাজল, মাসি?

হাসতে হাসতে মেয়েরা চলে যায়, টিয়া মাসিও হাসতে শুরু করে। এ মাসে যদি পঞ্চাশ বোতল চালাতে পারিস সৌরভী, তবে তোর কুকুরের বরাদ্দ আধপো মাংস আমি একপো করে দেবো।

ক্রমেই সয়ে আসছিল। কিন্তু তবু যেদিন সৌরভীর ঘরে একটা লোক খুন হল, সেদিন ভয় পেয়েছিল যমুনা। পুলিশ এলো, ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। জেরা করলে কত রকম। সৌরভীকে বুঝি মারধোরও করেছিল। ওদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হল গলির মোড়ের পানওয়ালাটাও।

তারপর ওরা একদিন ছাড়াও পেল। লোকে বলে টিয়া মাসি ঘুষ খাইয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু সৌরভীকে ওরা রেখে দিল। সব কাহিনী যখন জানা গেল, তখন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল যমুনার। ঐ লোকটা সম্প্রতি সৌরভীর ঘরে কিছু দিন ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল। ফুরফুরে বাবু ছিল লোকটা। পায়ে পাম্পসু, গায়ে মিহি পাঞ্জাবি। দামী সিগারেট ছাড়া খেতো না। পকেটের রুমাল সর্বদাই এসেন্সে ভুর ভুর করতো। সেই লোকটাকে মোড়ের পানওয়ালার সঙ্গে ষড় করে মারলে সৌরভী। লোকটা রোজ সন্ধ্যাবেলাতেই আসবার আগে ঐ দোকান থেকে পান কিনে খেতো। পানের সঙ্গে কী একটা ওষুদ মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন, লোকটা টলতে-টলতে সৌরভীর বিছানা পর্যন্ত এসেই কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গভীর রাতে সেই পানওয়ালাটা আর সৌরভী—

সৌরভী? উঃ ভাবতেও শিউরে উঠে শরীর। ময়লা ময়লা বোকা বোকা চেহারার এই মেয়েটির সঙ্গেই যমুনার ছিল সবচেয়ে বেশি ভাব। ভারি আমুদে ছিল সৌরভী, কথায় কথায় হাসত। তার পেটে পেটে এত—

দশ বছর জেল হয়েছিল বুঝি সৌরভীর।

সেই থেকে সন্ধ্যা হলেই গা ছম ছম করতো যমুনার। প্রায় মাস ছ'য়েক ও-বাড়িতে কেউ আসতো না। যতদিন মামলা চলেছিল, পুলিশ থাকতো দরজার সামনে পাহারা।

টিয়া মাসি কিন্তু বেশি ঘাবড়ায় নি। খালি বলত, বাসাটা বদলাতে হবে। এটার বড় বদনাম হয়েছে।

তোমার ভয় করে না টিয়া মাসি?

ভয়? মেজেয় পানের পিক্ ফেলে টিয়া মাসি বলেছে—থুঃ। এই চল্লিশ বছরের জীবনে এই নিয়ে কম সে-কম দশটা খুন দেখলুম।

শেষ পর্যন্ত বাসা আর বদলায়নি টিয়া মাসি। খালি যে ঘরে সৌরভী থাকতো সেই ঘরটা চুনকাম করে দিলে। দেয়ালে ঘটা করে দিলে গঙ্গাজলের ছিটে।

মাতঙ্গ মাঝে মাঝে দেখতে আসতো ওকে। যমুনা বলতো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল, মা।

আদর করে ওর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে উকুন বেছে দিতো মাতঙ্গ, বলত, নিয়ে যাবোরে, বাবা। তোর বিয়ে দেবো।

বিয়ে দেবে! প্রথমদিন কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল যমুনা ; সোজা হয়ে উঠে বসেছিল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। আমাদের কি বিয়ে হয়, বেশ্যার মেয়েদের ?

বেশ্যার মেয়েদের! চোখ দু'টো মাতঙ্গের একবার জ্বলে উঠেছিল, তারপর ওর দৃষ্টি সুদূর হয়ে গিয়েছিল।

হয় কিনা জানিনে, তবে আমি তোর বিয়ে দেবো, দেখিস। আস্তে আস্তে দৃঢ়তার সঙ্গে মাতঙ্গ বলেছে।

যেদিন থেকে পরের বাড়ির ঝি-গিরির কাজ নিয়েছে মাতঙ্গ, সেদিন থেকেই ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে। গৃহস্থবাড়ির রূপ কাছে এসে দেখতে পেয়েছে, আর যত দেখেছে, ততই তার মনে মোহ জমেছে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো। তক্‌তকে উঠোন আর সাজানো গুছানো ছোট একটি ঘর—এমনি বাড়ি যদি একটি তার হোত! এখানেও কলহ আছে, নীচতা আছে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে অনির্বচনীয় একটু মাধুর্য ; পরিপূর্ণ শুচিতা আর শ্রী। এ ঘর মাতঙ্গ কখনো পাবে না ; সে বয়স নেই, কিন্তু পায় যেন যমুনা। কিন্তু সে কেমন করে? কোন্ পথে এই পঙ্কজকে সে পেঁছে দেবে পূজার বেদীমূলে। উপায় যা হোক একটা কিছু স্থির করতে হবে, ততদিন যমুনা থাক নন্দেরচাঁদ বাই লেনে।

সৌরভীর খালি ঘরে নতুন যে মেয়েটি এল, তার নাম শ্যামা। বেশিদিন আসেনি কলকাতায়। এই বছর চারেক হ'ল।

মোটে চার বছর ?

তুমি বলছ ভাই মোটে? আমার মনে হয় এক যুগ হয়ে গেল। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে শ্যামা ; কাঁদতে কাঁদতে ওর স্খলনের ইতিহাস বলে, গ্রামের বালবিধবার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা, কলঙ্কের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা—

তারপর, তারপর? উৎসুক রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা জিজ্ঞাসা করে।

ম্লান একটু হাসে শ্যামা। বলে, তার আর পর নেই।

তরঙ্গ মাঝখানে তীর্থে গিয়েছিল, কয়েকমাস বাদে ফিরে এলো ফ্যাকাশে হয়ে।

কী হয়েছিল তোর তরঙ্গ ?

কী হয়নি তাই জিজ্ঞেস কর বরং। টাইফেট, নিমুনিয়া, আরো কত কী।

চেহারা কিন্তু তোর বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে তাই।

দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল তরঙ্গ। বলে, বেঁচে যে আসতে পেরেছি, এই ঢের। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা।

শ্যামার কিন্তু বিশ্বাস হয় না তরঙ্গের গল্প। যমুনাকে বলে, বিশ্বাস করলি তুই ওই মাগির গাঁজাখুরি গল্প। অসুখ হয়েছিল না হাতী। ও নিশ্চয়ই পোয়াতী হয়েছিল, নষ্ট করে এসেছে, আর নইলে ওর ছেলে হয়েছিল, সেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে যমুনা, বুজে আসা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি জানলে

কী করে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল শ্যামা। কথাটা না শোনার ভান করে দূরের চারতলা বাড়ির ছাতের দিকে চেয়েছিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হতে সামান্য একটু হেসে বলেছিল, চেহারা দেখলেই আমরা টের পাই যে। আমারো হয়েছিল।

তোমার ছেলে হয়েছিল ? উত্তেজিত গলায়, প্রায় চীৎকার করে, জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

পায়ের নখ দিয়ে সিমেন্ট ঘষতে ঘষতে শ্যামা জবাব দিয়েছিল,—হয়েছিল।

কী করেছ সেটাকে ? জলে ভাসিয়ে দিয়েছ ?

না। খুব নীচু গলায় শ্যামা ধীরে ধীরে একবারো-না-কাঁপা গলায় বলেছিল, গলা টিপে মেরেছি !

অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি কেউ। তারপর শ্যামা বুঝি জোরে হেসে উঠেছিল। তোর মনটা এখনো কাঁচা আছে যমুনা। তোকে এখানে মানায়না, গেরস্তের ঘরে মানাতো। দিব্যি ঘোমটা টেনে, নোলক পরে বসে থাকতিস।

তরঙ্গের সঙ্গে ঘেন্নায় তিনদিন কোন কথা বলতে পারেনি যমুনা। বিবর্ণ, ঐ পাংশু মেয়েটিই কি তার সদ্যোজাত শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে জলে ? বিশ্বাস হয়না। শ্যামা বলেছিল, ছেলে তো কেউ চায় না, তাই মেরেছে ; এই যদি মেয়ে হোত, তবে দেখতিস কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির হ'ত তরঙ্গ, অসুখ-টসুখের কথা আর সাজাতে হ'ত না।

মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি কাটা এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটার সঙ্গে শ্যামার ঘরে আলাপ। লোকটা প্রায় সন্ধ্যাতেই শ্যামার অতিথি হ'ত। শ্যামা নিজে নাচতে জানতো না, তাই মাঝে মাঝে যমুনার ডাক পড়ত। লোকটা একদিন ফরাসের ওপরই ঘুঙুর শুদ্ধ পা জোড়া জড়িয়ে ধরেছিল যমুনার। এমন পাখির মতো হালকা পা তোমার, থিয়েটারে নামো না কেন ?

থিয়েটারে ? বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করেছিল যমুনা।

হ্যাঁ, ডায়না থিয়েটারে নাচ শেখায় লোকটা ; নাট্যকার হবে শীগ্‌গির ! মাঝে মাঝে বগলে করে একটা এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে আসতো, সেইটেই ওর স্বরচিত নাটক ; সুভদ্রাহরণ কি ওই জাতীয় নাম হবে। শ্যামার ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে সেই নাটকের মহলা হ'ত। লোকটা একটু একটু করে পড়ে শোনায়, এক এক চুমুক খায়, আর রঙিম মুখচোখে যমুনার দিকে চেয়ে ওর অভিনয় কৌশলের তারিফ করে বলে, এ নাটকে হিরোয়িনের পার্ট তোর বাঁধা। আমি শ্রীমন্তবাবুকে বলে রেখেচি। থিয়েটারে কিন্তু এসব যমুনা-টমুনা চলবে না, তখন তোর নাম হবে মিস রোজ।

মিস রোজ ? গোলাপী রঙের ছিটে লাগত যমুনার গালে, শ্যামার নতুন কেনা তাকিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ত হাসতে হাসতে।

শেষ পর্যন্ত যমুনা ডায়না থিয়েটারে হিরোয়িনের ভূমিকায় নামতো কিনা বলা যায় না। কিন্তু মাতঙ্গ একদিন এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

দুপুর বেলা একদিন এসে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

কোথায় মা? রাত্রি জাগরণের পর সমস্ত শরীরে শৈথিল্য এসেছিল, ফোলা ফোলা চোখ যমুনার, একটা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মা?

মাতঙ্গ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, যা. চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। এক জায়গায় তোর বিয়ের কথা কয়েছি, চটপট তৈরি হয়ে নে।

সাজতে গিয়ে সেদিন বার বার হাত কেঁপে গেল যমুনার। পছন্দ আর হয় না। ছাপা শাড়ি পছন্দ যদি বা হ'ল ব্লাউজের সঙ্গে আর মেলে না। চুলটাই বাঁধলে কতো রকম করে।

সাজগোজ সারা করে বেরিয়ে যখন এল, তখন মাতঙ্গ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে উঠলো, তুই এ কী করেছিস্‌ বল্‌তো যমুনা!

ভয়ে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল। কী মা?

এমনধারা সেজেছিস কেন? ভদ্রলোকের বাড় যাচ্ছিস, না বেশ্যাবিত্তি কত্তে যাচ্ছিস লা? খোল্‌, শীগগির ওই রঙচঙে শাড়িটা, একটা ফর্সা লাল পেড়ে কিছু পর। অত গয়নাও পরতে নেই, মোছ গালের রঙ।

ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করে রুচিও কিছু ভদ্রলোকের মতো হয়েছে মাতঙ্গর।

যমুনা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কম্পিত হাতে মাতঙ্গ যা যা বললে অবিকল তাই করলে। কলে গিয়ে ফের মুখ ধুয়ে এল। মুছে ফেললে কপালের কাচপোকার টিপ। পাতা কেটে চুল বেঁধেছিল অভ্যাস অনুযায়ী, সেটা খুলে চুলগুলোকে সংবরণ করলে সাধারণ একটি খোঁপায়।

মাতঙ্গ খুশি হয়ে বললে, এই তো দিব্যি মানাচ্ছে। মা আমার যেন সরেস্যতী।

রাস্তায় নামতে যতো রাজ্যের সংস্কার এসে জড়িয়ে ধরে পা দুটো, নাছোড় প্রণয়ীর মতো। মোড়ের রহমৎ গাড়োয়ানের ছেলেটা, পানের দোকানের সমুখে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিচ্ছিল, সে কি একটা রসিকতা করলে। ওরিয়েন্টাল থেমটা পার্টির ম্যানেজার রকে দাঁড়িয়ে শিষ দিলে একবার। "স্পেশাল সেলুনের" লম্বা জুল্‌পিওয়ালা কারিগরটা ভ্রূ-ভঙ্গি করলে। অন্যদিন যমুনা হয়ত এক মুহূর্ত দাঁড়াতো, মুচকি হাসতো একটু; আজ ভ্রূক্ষেপ করল না। একে তো মা সঙ্গে যাচ্ছে, তাতে আবার যমুনা যাচ্ছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। চালচলনটাও করতে হবে তেমনি। আজ তো মৃগয়া নয়! লোল কটাক্ষ আর ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, সব রেখে যেতে হবে পেছনে, এই নদেরচাঁদ লেনে।

সারা রাস্তা মাতঙ্গ যমুনাকে তোতাপাখি পড়াতে পড়াতে নিয়ে গেল। দায়িত্ব তো কম নয়, ঝুঁকিও নয় সামান্য। মেকিকে মন্ত্রবলে খাঁটি করে দেবে মাতঙ্গ, লোহাকে স্পর্শমণি ছুঁইয়ে করবে সোনা।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক গলিতে "সমাজ সংস্কারক" অফিস। টেবিলের সম্মুখে সম্পাদক কাজ করছিলেন। সৌম্যমূর্তি, শাদা-কালো মেশানো দাড়ির আড়ালে অনিশ্চিত একটা বয়স লুকানো।

মা নমস্কার করলে, মার দেখাদেখি যমুনাও।

মাতঙ্গ বললে, আমার মেয়ে। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার যমুনাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সম্পাদক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হুঁ।. অনেকক্ষণ কি চিন্তা করলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ। ওর পায়ের কাছে বসে যমুনা ও'র বুক পকেটের চেন লাগানো ঘড়িটার অতি ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

হঠাৎ খানিকক্ষণ বাদে সম্পাদক সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। একবার ওর, একবার মার, মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে—

মাতঙ্গ বললে, যদি কোন উদার ছেলে পাইতো—

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সম্পাদক বললেন, পাবে। কয়েকটি জানাশোনা ছেলে আছে আমার হাতে। এ রকম বিয়ে আমরা গোটাকতক দিয়েছিও। আমরা শুধু কাগজে কলমেই সমাজ সংস্কার করি না, হাতে কলমেও করি। কিন্তু—

কিন্তু কী? না, সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। একেবারে গণিকার গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করতে কোন পাত্র সহজে রাজি হবে না। তার চেয়ে, চশমা খুলে পকেটে রেখে সম্পাদক বললেন, তার চেয়ে ধরো যদি ওদের বলি -

আস্তে আস্তে সম্পাদক ও'র কৌশলটা ব্যক্ত করলেন। যমুনা দিনকতক থাকবে ও'দের সমিতি পরিচালিত আশ্রমে। মফঃস্বল থেকে এসেছে, দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীতা, স্বজন পরিত্যক্তা কুমারী, এই ধরণের একটা বিশ্বাস্য গল্প তৈরী করে চালাতে হবে।

আশ্রমে এসে বেশিদিন থাকাও হ'ল না। মা রোজ এসে খোঁজ নিতো। আসতেন 'সমাজ সংস্কারকের' সেই প্রবীণ সম্পাদক গিরিজাবাবু। এখানে আরো ক'টি মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ হ'ল না। যমুনা সংকুচিত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। এখানকার মেয়েরাও মিশুক নয় তেমন। সব যেন কেমন ঠাণ্ডা, বোবা, স্থির। কথা বললে, শান্ত চোখে তাকায় কেবল। যে অতি তরল, অতি মুখর জীবনের সঙ্গে যমুনার পরিচয়, এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

এ দিন এক পাত্র এসে দেখেও গেল ওকে। পরে শোনা গেল তার পছন্দও হয়েছে। যখন দেখতে এসেছিল তখন তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি যমুনা, কিছুতেই স্মরণ করতে পাললো না তার মুখ। পরে শুনলে, নাম নরেশ, কাছাকাছি মফঃস্বলের কী একটা জায়গার ডাক্তার। বিপত্নীক। শুনেছে যমুনার কল্পিত দুর্ভাগ্যের কাহিনী। বিয়েয় আপত্তি নেই।

বিয়ের সেই নির্দিষ্ট দিনটি এল। সেদিন শ্রাবণ মাস, সারাদিন বৃষ্টি। বিকেল হতেই চারধারে অন্ধকার হয়ে এল। আশ্রমের গলিটায় থৈ থৈ জল। এমন দিনে কি কারুর বিয়ে হয়! আলো পর্যন্ত জ্বলল না রাস্তায়। এমন দিনে দুর্যোগে লোকে

ঘরে বাসি মড়া রাখে, তবু রাস্তায় বার করে না।

শিরশিরে হাওয়া, যমুনা সেদিন গা ধোয়নি পর্যন্ত। কিন্তু তবু গলির বাঁকে সন্ধ্যার একটু পরেই ছ্যাকরা গাড়ি দেখা গেল একটা, আর সেটা থামলো আশ্রমের ঠিক সমুখেই।

দরজা খুলে প্রথমে নামলেন, 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু। তাঁর পিছনে আরেকজন লোক কোঁচা হাতে রকে লাফিয়ে উঠলো, সন্তর্পণে, জল বাঁচিয়ে। এই কি বর?

সন্দেহ কী। হেলে পরা টোপরটাকে সোজা করে বসিয়েছে মাথায়। মুখে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, মুছতে গিয়ে চন্দনের ফোঁটাগুলোও গেল মুছে।

তারপর আস্তে আস্তে আলো জ্বলল, শাঁখও বাজলো আশ্রমের মেয়েরা, উলু দিল। গিরিজাবাবু পুরুত নিয়েই এসেছিলেন, তিনি মন্ত্র পড়লেন, বিয়ে হ'ল।

নতুন জীবন শুরু হল যমুনার।

পরদিন এসেছিল মাতঙ্গ। দূর থেকেই দেখলে নরেশকে, কেননা নরেশ তার পরিচয় জানে না। যমুনাকে তার নতুন পরিচ্ছদে কতো রকম করে যে দেখলো মাতঙ্গ, ঠিক নেই। সিঁথিতে সিঁদুর তুলেছে যমুনা, এ সাফল্য যেন যমুনার একার নয়, মাতঙ্গেরো। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে মাতঙ্গ ওর সারাজীবনের স্বপ্ন সফল করেছে। যমুনাকে প্রমোশান দিয়েছে ভদ্রসমাজে।

নরেশকে বেশি কিছু দিতে হয়নি; মোট দু'হাজার টাকা, সর্বসাকুল্যে খরচ হয়েছে সাতশো। মাতঙ্গের নিজের বলতে আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে।

তুমি এবার কি করবে মা?

আমি? মাতঙ্গ হেসে বলেছিল আমার জন্যে ভাবিস্‌ নি। আমার চলে যাবে; আমি তো এবার নিশ্চিন্ত। যে ক'দিন শরীরে কুলোবে খেটে খাবো, তারপর তীর্থটীর্থ—

যমুনার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল. নিজের বলতে মাতঙ্গ কিছুই রাখে নি, সব উজাড় করে দিয়েছে মেয়েকে।

যমুনার মনে আশংকা ছিল, হয়তো নরেশ ওকে জেরা করবে, ওর অতীত জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চাইবে। দুর্বৃত্তদের হাতে ওর অপমানের একটা কাহিনী রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা সব সময় যমুনার ভালো খেয়াল থাকতো না। হয়ত কী বলতে কী বলে বসবে, সামঞ্জস্য থাকবে না কাহিনীতে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'ল নরেশের কথায়।

আমি শুনেছি সব, ওর একখানা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নরেশ বললে, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা। এতে তোমার কোন লজ্জা নেই, এ লজ্জা আমাদের, আমাদের সমাজের, যারা তোমাকে বাঁচাতে পারে নি।

ঈষৎ উষ্ণ করতল নরেশের, তবু যমুনার হাত যেন হিম হয়ে এল। পুরুষের স্পর্শ জীবনে এর আগেও বহুবার পেয়েছে,—বহু পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে,—কিন্তু

নরেশের আজকের এই আশ্বাস-বলিষ্ঠ স্পর্শের সঙ্গে কোন অনুভূতির তুলনা নেই। পঙ্ক থেকে উঠে এসে প্রথম নবধারা জলে স্নান করার শুদ্ধ অভিজ্ঞতা।

নরেশ আবার বললে, আমি কিছু শুনতে চাইনে। তোমার অতীত ফুরিয়ে গেছে। বর্তমান আর ভবিষ্যতে কোন ফাঁকি না থাকলেই হ'ল।

মফঃস্বল শহরে ওদের যৌথ জীবনে তৃতীয় কেউ ছিল না। নরেশ কাজের মানুষ, সকাল হতে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো দুপুরে, খেয়ে দেয়ে আবার বেরুতো, দেখা হত আবার সেই সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যাটুকুই ওদের দু'জনের যৌথ।

মাঝে মাঝে বুক দুরদুর করতো। কী জানি, কোথায় বুঝি ত্রুটি ঘটে যাবে, নরেশ ধরে ফেলে দেবে ও মেকি; ওর আসল পরিচয় ফুটে উঠবে পারদের মতো।

কিন্তু আশ্চর্য, সে সব কিছুই হ'ল না। নরেশ কাজের মানুষ, এ সব খুঁটিয়ে দেখার মত অবসর নেই তার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বুড়ি ছুঁয়ে যাবার মতো বাড়ি আসছে; একটুখানি হেসে কি একটু হাসি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছে।

আর সন্ধ্যাগুলো? অল্প অল্প হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপে, তির্যক একটু চাঁদের আলো জানালা গলে মেজেয় গড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। সে সন্ধ্যা শুধু ঘন হয়ে বসবার, স্তব্ধ চেখে তাকাবার।

বেশ কাটলো দু'টি মাস।

বৃথাই যমুনা ভয় করেছিল; অশুভ এতটুকু ছায়াও পড়ল না।

কিন্তু কোথা থেকে দিন তিনেক আগে এসে উদয় হ'য়েছে এই বাবরি চুলওয়ালা লোকটা। কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে।

নরেশের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠ পার হয়ে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে খালি পায়ে বালির ওপর দৌড়ে দেখেছে পা বসে যায় কতোখানি; একটু দূরে বাবলা গাছ; কাঁটায় আঁচল গেছে জড়িয়ে, হলুদ ফুল তুলে পরেছে খোঁপায়। কোঁচড় ভরে তুলেছে কাশের গুচ্ছ।

তারপর হাত ধরাধরি করে আবার পা টিপে টিপে আলের রেখা ধরে ফিরে এসেছে। নরেশ দরজা অবধি পেঁছে দিয়ে চলে গেছে ক্লাবে-না-ডিসপেন্সারিতে।

গেট খুলে বাবরিওয়ালা লোকটা চোরের মতো পা টিপে টিপে এসেছিল পেছনে।

নরম মাটিতে পায়ের শব্দ হয়নি। সিঁড়িতে পা দিয়েও যমুনা টের পায়নি পেছনে লোক আছে। দু'টো সিঁড়ি পেরুতেই আঁচলে টান পড়ল। চমকে ফিরে দাঁড়ালো যমুনা। ভীত, চকিত একটা আর্তস্বর কণ্ঠে অর্ধোচ্চারিত হয়েই থেমে গেল। অন্ধকারে একেবারে মুখোমুখি এসে যে দাঁড়িয়েছে তার বাবরি চুলের নিচে রক্তিম চোখ দু'টো জ্বলছে গনগনে উনুনের মতো।

বিচিত্র হাসি খেলে গেল যমুনার মুখে।

কী চাও?

ওর আচল তখনো লোকটার মুঠোতে। বললে, তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

ফিরিয়ে নিতে? কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যমুনার, নিজের কাছেই অপরিচিত

শোনালো।

ফিরিয়ে নিতে। নিষ্ঠুর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে লোকটা বললে। তারপর আপাদমস্তক দেখে নিলে যমুনাকে। দেখলে ওর সীমান্তের সিঁদুর-রেখা, হাতের শঙ্খবলয়, এয়োতির চিহ্ন। হেসে উঠলো ব্যঙ্গশাণিত গলায়। বাঃ, ভোল তো দিব্যি পালটেছ সুন্দরী। কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি। পোষাক বদলালে ভেতরটা বদলায় না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

কোথায়?

ডায়না থিয়েটারে। তোমার হিরোয়িন হবার কথা ছিল মনে নেই? তোমার মনে নেই। আমার আছে। অনেক খোঁজ নিয়ে তবে নাগাল পেয়েছি।

যমুনার ইচ্ছে হ'ল কেঁদে উঠে লোকটার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে। নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা তার, আদর্শ সংসার, উদার দেবতুল্য স্বামী—

কিন্তু স্বর ফুটলো না, একটি কথাও বলতে পারলে না। লোকটার চোখ দুটি রক্তাভ, কিন্তু সে তো শুধু নেশাতেই নয়, অনুরাগেও। কী এক অদ্ভুত সর্বগ্রাসী চাউনি ওর সর্বাঙ্গে রসনা লেহন করছে। এই দুঃসাহসী লোকটা চায় কী।

এখানে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছো। এ তোমার স্থান নয়। সত্যি করে বলো যমুনা, তোমার ছিটগ্রস্ত মায়ের খেয়াল মেটাতে তুমি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করছ না? এই সোনার শিকলে কি অস্বস্তি হচ্ছে না? সত্যি করে বলো পা দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠছে না একজোড়া ঘুঙুরের জন্যে। নদেরচাঁদ লেনের মেয়ে তুমি, রকে এসে দাঁড়াতে—

থিয়েটারের বই লেখে লোকটা। কথাগুলো লেখে যেমন, বলেও তেমনি সাজানো। আর শুনতে পারেনি যমুনা। ঝুঁকে পড়ে হাতের কাছে শক্ত গোছের একটা কি পেয়েছিল, সেইটা ছুঁড়ে মেরেছিল লোকটার মুখে।

কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল লোকটার গাল বেয়ে। এক হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বললে, ঠিক লাগল না, ফসকে গেল। হাত তোমার এখনো তৈরি হয়নি।

চাপা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা বললে, যা—ও।

যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার ফিরে আসবো।

পরদিন সকালে যমুনা উৎসুক হয়ে রইলো, ওর মুখটা এক একবার বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নরেশ বেরিয়ে গেল। গদার মা এলো বাসন মাজতে। কিন্তু লোকটার দেখা নেই। আশায় আশংকায় যমুনার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে জানে, লোকটার মত পরিবর্তন হয়েছে কিনা। হয়ত সে ফিরেই গেছে। কিন্তু এতদূরে অবধি খুঁজে খুঁজে এসেছে যে, সেকি ফিরে যাবে এত সহজেই;

স্নান, এমন কি খাওয়া দাওয়াও শেষ হ'ল। নরেশ এলো বেলা দেড়টা দুটোয়। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এ সময়টা নরেশ একটু গড়িয়ে নেয়। আজ আর যমুনা নরেশের কাছে বসল না। আজ তার প্রতীক্ষার পালা। কতক্ষণে রাহু আবার এসে দেখা দেবে কে জানে। শেষে বেলাও পড়ে

এলো। পশ্চিমের রাস্তার ধারের নারকেল গাছটার ছায়া এসে ঘরে পড়ল, তবু যখন লোকটা এলো না তখন যমুনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ; কুগ্রহ হয়ত কেটে গেছে।

চা খেয়ে নরেশ গেছে তৈরি হয়ে নিতে, যমুনা আয়নার সমুখে দাঁড়িয় চুল আঁচড়াচ্ছে, হালকা সুরের একটা গানও এসেছে মনে, এমন সময়—

সেই কামানো ঘাড়, বাবরি চুল আর ভাঁটার মতো দু'টি চোখ।

শ্যামার ঘরের সেই লোকটা। নন্দেরচাঁদ বাই লেনে ফিরে যাবার খেয়া নৌকার মাঝি।

সিঁড়িতে চটিজুতোর পায়ের শব্দ। নরেশ উঠে আসছে। যমুনা অনুভব করল ওর হাত পা হিম হয়ে আসছে। নরেশ জেনেছে সব। জেনেছে যমুনা দুর্বৃত্তের উচ্ছিষ্ট অথচ নিরপরাধ নারী নয়। সে নিতান্তই পণ্যস্ত্রী! দেহের পবিত্রতা তার নষ্ট হয়েছে একটিমাত্র দুর্ঘটনায় নয়, অর্থের বিনিময়ে। আত্মদানের পৌনঃপুনিকতায়।

চটি জুতোর শব্দ চলে এসেছে ওপরে। এখুনি ঘরে ঢুকবে নরেশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল যমুনা. বালিশে মুখ গুঁজলো। হাত-পা অসাড়, কেবল পিঠটা উঠছে ফুলে ফুলে।

কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, নরেশ ওর শিয়রে বসে। চোখের পাতা, কপাল, চুল কেমন ভিজে-ভিজে। বালিশ শুদ্ধ মাথাটা নরেশের কোলে। আস্তে আস্তে নরেশ ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভয় পেয়েছিলে ? সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল নরেশ।

মিট মিট করে আরেকবার তাকালো যমুনা। এত সুখ বিশ্বাস করা যায় না। এখনো সে এ ঘরেই আছে, এখনও তাকে তাড়িয়ে দেয়নি নরেশ!

কী হয়েছিল ? নরেশ আবার জিজ্ঞাসা করলে।

কিছু না, ক্ষীণকণ্ঠে যমুনা বললে, মাথাটা ঘুরে উঠেছিল একটু। তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, শুনেছ সব ?

নরেশ ধীরে ধীরে বললে, শুনেছি।

আমাকে এবার তাড়িয়ে দেবেতো ?

পাগল, নরেশ বললে, এত ঠুনকো কারণেই সংসারটাকে ভেঙ্গে দেবো,—তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমাকে যখন বিয়ে করেছি তখনই কি আমার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওনি ?

বিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, পেরেছি।

সেই উদারতাকেই আরেকটু প্রসারিত করে দিলাম। তোমাকে তো বারবার বলেছি. তোমার অতীত নিয়ে তো তুমি নও, তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়েই তুমি।

আরো কী কী যেন বলছিল নরেশ। পঙ্ক থেকে হাত দুটি তুলে ধরেছে যমুনা সূর্যালোকের দিকে, নরেশ তাকে আবার ঠেলে দেবে না। সুখাবেশে চোখ দুটি মুদিত হয়ে এলো যমুনার। নরেশ বড়ো, নরেশ উঁচু, নরেশ মহৎ সে জানতো,

কিন্তু সে মহত্ব যে এমন অভ্রস্পর্শী তা কখনো অনুমান করতেও পারে নি।

লোকটা চলে গেছে?

—গেছে। আমি দিয়েছি বিদায় করে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোও মণি।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিল যমুনা। পাথরের একটা বোঝা নেমে গেছে। স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরির শেষ হয়েছে আজ। মহত্বের শুচিস্পর্শে নরেশ ওর সমস্ত গ্লানি মুছে নিয়েছে। এখন থেকে সুস্থ, সহজ জীবন যমুনার। শেষে হ'ল পদে পদে কুণ্ঠার বিড়ম্বনা। শেষ পাতাটিও খসে গেছে, এবার শুধু নতুন, সবুজ পাতা। ওর স্বর্গ অটুট রইলো। লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়েছে যেন, অত্যল্পকালের মেয়াদ নয়। নিরেনব্বুই বছরের ইজারা।

কিন্তু সেই নিরেনব্বুই বছর ন' মাসেই ফুরিয়ে যাবে, তাকি যমুনা তখন জানত।

সেই ঘটনার দিন তিনেক বাদে 'সমাজ সংস্কারক' সম্পাদক গিরিজাবাবু এসেছিলেন। সামান্য একটু রোগা হয়েছেন গিরিজাবাবু, কপালে কিছুটা কুঞ্চন; কিন্তু চোখে যেন দিব্য একটা জ্যোতি এসেছে।

প্রণাম করল যমুনা, নরেশ কলরব করে অভ্যর্থনা করল। যমুনার আনত মাথা সস্নেহে শুধু একবার স্পর্শ করলেন গিরিজাবাবু। স্বরোপিত চারা গাছটিকে সতেজ হয়ে উঠতে দেখে আত্মপ্রসাদের হাসিতে যেন মুখখানা ভরে গেছে তাঁর। বললেন, এদিকে কাজ ছিল একটু। তাই একদিন নেমে তোমাদের দেখে গেলুম।

বেশ, বেশ। ভারি খুশি হয়েছি।

নরেশের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কি খুব কাজ আছে নরেশ? দু'টো কথা ছিল।

নরেশ বললে, কিছুমাত্র না। আসুন।

দু'জন মিলে আবার ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণ যমুনা রান্নাঘরে বসে নানারকম খাবার তৈরি করলে।

সন্ধ্যার গাড়িতে গিরিজাবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় আবার আশীর্বাদ করে গেলেন। সুখী হ'য়ো। কোন অকল্যাণ যেন তোমাকে এখনো স্পর্শ না করে।

এরপর আরো দু'মাস কেটেছে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের কথা মনে পড়ে মন খারাপ হ'তো কোথায় আছে মাতঙ্গিনী? এখনো কি দাসীবৃত্তি করছে? যমুনার ইচ্ছে ছিল মাকে কাশী চলে যেতে লিখবে। সেখানে না হয় দু'চার টাকা করে হাত খরচ পাঠানো যাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। তিন দিন নরেশের অসুখটা চাপা ছিল। অল্প অল্প জ্বর, বুঝতে পারে নি। ক্রমে চোখ দু'টি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, অল্প অল্প কাশির লক্ষণ দেখা দিল। কিসের পর কী ঘটল ভালো বুঝতে পারেনি যমুনা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন এলোমেলো, অসম্বন্ধ। যখন বুঝতে পারলো, তখন হাতের নোয়া শাঁখা ফেলতে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর গেছে মুছে। আর অপরিমেয় সর্বনাশ ওর পরণের শাড়ির সব রঙ কেড়ে নিয়ে শাদা করে দিয়ে গেছে।

সব হিসেব খতিয়ে দেখা গেল, বেশি কিছু রেখে যেতে পারেনি নরেশ।

অতি সামান্য কিছু নগদ, আর এই বাড়িখানা।

কী করবে, কিছু স্থির ছিল না। ভালোমত কিছু স্থির করবার আগেই কলকাতার টিকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসল।

সঙ্গে বেশি কিছু আনেনি। নিত্যব্যবহার্য দু'চারখানা কাপড়, হাতখরচের টাকা কিছু, আর নরেশের ছবি একটা।

অবলা আশ্রমের গিরিজাবাবু তাঁর ঘরে বসে চিঠি লিখছিলেন। যমুনাকে ঢুকতে দেখে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। প্রণাম করতে বললেন, বোসো। আস্তে আস্তে বললেন, কিছু জানতে পারিনিতো?

আশ্রমেই একটা ঘর ওর জন্যে নির্দিষ্ট হল। সেই ঘরের দেওয়ালে নরেশের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখলো যমুনা। প্রতিদিন ধূপ ধুনোয় সেই সেই প্রতিকৃতির উপাসনা; তাজা ফুলের মালা ফোটোটার গায়ে ঝুলিয়ে দিতো।

ক্ষণকালের জন্যেও যে মানুষটি ওকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিল, তার আসন যমুনার মনে চিরদিনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বেঁচে থাকতে তবু নরেশের দু'চারটে দোষ ত্রুটি চোখে পড়ত। মর দেহ ত্যাগ করে সে যমুনার কাছে দেবত্ব লাভ করলো।

গিরিজাবাবু একদিন বললেন, তোমার মার বড়ো অসুখ যমুনা, একদিন দেখতে যেয়ো।

খোলার ঘরের মেজেয় ময়লা বিছানায় পড়ে আছে মাতঙ্গিনী। যমুনা ডাকলে, মা।

চোখ দু'টো যেন অতি কষ্টে মেলে একবার চাইল মাতঙ্গ। এসেছিস? যমুনার নিরাভরণ হাত দুটির দিকে চেয়ে মাতঙ্গীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে যমুনার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

যমুনা স্থির করেছিল এখানেই থেকে যাবে, অন্তত মা সেরে ওঠা পর্যন্ত। আশ্রম থেকে ওর জিনিসপত্র আনিয়ে নিলে।

মাতঙ্গ মনে মনে খুশি হ'ল। এখানে তুই থাকবি মা? থাক তবে। কিন্তু একটু অস্বস্তিও যেন বোধ করছে মাতঙ্গ। সর্বস্ব ব্যয় করে মেয়েকে সে সমাজের ওপর তলায় তুলে দিয়েছে, আবার এখানে এসে বাস করলে যমুনা নেমে আসবে না তো। জীবনের আগাগোড়া ফাঁকির মধ্যে ওই একটুমাত্র সান্ত্বনা আছে মাতঙ্গের, তার মেয়ে ভদ্র। বিধবা হলেও ভদ্র।

বিকেলের দিকে দু' শিশি ওষুধ হাতে করে যে লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে যমুনার সমস্ত প্রত্যঙ্গ হিম হয়ে এলো।

সেই বাবরি চুল, কামানো ঘাড়, লাল চোখ, কালো দাঁত।

চিনে চিনে আবার এসেছে শনি, পথ শুঁকে শুঁকে।

বোঝা গেল লোকটাও কম বিস্মিত হয় নি। আড়চোখে একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে সে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বসল। ওষুধের শিশি দুটো রাখলো শিয়রে। চাপা গলায় সেবনবিধি সম্বন্ধে কী যেন বললে মাতঙ্গকে।

মাতঙ্গ বললে, যা বলবে আমার মেয়েকে বলো বাছা। ওই তো এসেছে। একটু থেমে বললে, কপাল পুড়িয়ে এসেছে।

যমুনার মনে হ'ল লোকটার মুখে বিচিত্র একটুখানি হাসি খেলে গেল যেন ; শেষ পর্যন্ত যেন বাজি জিতে গেল। সেই অর্থাৎ যমুনাকে আসতে হ'ল তো আবার নদেরচাঁদ বাই লেনে।

মাতঙ্গ বললে, আমার অসুখে গঙ্গাধরই দেখাশুনা করছে। বড় ভালো ছেলে গঙ্গাধর।

কিন্তু ততক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে যমুনা। মন স্থির করে ফেলেছে। লোকটার ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। সে যে নেমে আসেনি সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে উঠে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু পালাবে কোথায়। অহরহ সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে গঙ্গাধর। ওষুদের গেলাস ধুতে কলতলায় যমুনা উঠে গেছে যদি, গঙ্গাধরও গেছে পিছনে। যমুনার ওঠা বসায়, চলায় ফেরায় অনুক্ষণ ওর শিকারী দৃষ্টি যমুনাকে অনুসরণ করছে।

কী চায় লোকটা ? এখনো কি ও আশা রখে যমুনা 'ডায়না' থিয়েটারে যোগ দেবে, ওর লেখা নাটকে হবে হিরোয়িন ?

শ্যামা বললে, তাই। খবর পেয়ে শ্যামা দেখা করতে এসেছিল। যমুনার মুখে আদ্যোপান্ত শুনে বললে, হবে না ? ও একেবারে হন্যে কুকুরের মতো হয়ে আছে যে, তোকে ওই থিয়েটারে নিয়ে যাবে কথা দিয়ে থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে টাকা খেয়েছিল যে।

টাকা খেয়েছিল ? যমুনা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

খেয়েছিল তো। শ্যামা বললে। ডায়না থিয়েটারের মালিক সুদাম শীলকে আমি চিনি। ওর স্বভাবই ওই। টাকা দিয়ে যেখানে মনের মতন জিনিস পাওয়া যায় সেখানে সে পেছপা হয় না।

তারপর ?

—তারপর তুই চলে গেলি। টাকাটা এদিকে ও ভেঙে ফেলেছে। ফেরৎ না দিতে পেরে চাকরি যায় যায়। সেই থেকে কেবল তোর খোঁজ করে বেরিয়েছে।...একটু হুঁসিয়ার থাকিস্ ভাই।

মাতঙ্গ সেরে উঠছিল। যমুনা সেইদিনই আশ্রমে চম্পট দিলে।

রাহু এসে উদয় হ'ল সেখানেও।

সন্ধ্যাবেলা সবে নরেশের ফটোতে মালা ঝুলিয়েছে যমুনা। ধূপ জ্বালাতে যাবে, এমন সময় বাইরের জানালার কাছে ছায়া পড়ল। কার আবার! গঙ্গাধরের। দুটো শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যমুনার দিকে। পা দুটো একবার কেঁপে উঠল যমুনার। এক্ষুণি অবশ্য জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারে, কিম্বা দারোয়ান ডেকে ধরিয়ে দিতে পারে লোকটাকে। কিন্তু তাতে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ? তার চেয়ে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক আজ।

কী চাই? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে যমুনা।

গঙ্গাধর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল।—দরজা খোল, বলছি।

আজ নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যমুনা। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা সাহস এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে নিয়ে এলো গঙ্গাধরকে। ধূপের গন্ধে, দীপের আলোয় রহস্যময় হয়ে আছে ঘরখানা। সেই ঘরের মেজেয় মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জনে।

—এবার বলো।

—আমার সঙ্গে চলো। পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি করলে গঙ্গাধর। নির্বিকার কণ্ঠে, অক্লেশে। এতটুকু বিচলিত হ'ল না।

আর সঙ্গে সঙ্গে যমুনা যেন ফেটে পড়ল। লজ্জা করে না, জানোয়ার। কার সমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জানো না তুমি!

তবু মিটি মিটি হাসছে গঙ্গাধর—লোকটা আসল শয়তান—কার সমুখে?

হিড় হিড় করে ওকে যমুনা টেনে নিয়ে এলো নরেশের ফটোর সামনে।—চেয়ে দেখ, আমার স্বামী। উনি আজ নেই, কিন্তু আমি ওঁরই। দেবতা ছিলেন উনি, আমাকে টেনে তুলেছিলেন! মহৎ ছিলেন, আমার সব কিছু জেনে শুনেও ওঁর পাশে স্থান দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। আর তুমি—

নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে গঙ্গাধর বললে, আমি কী?

—তুমি হীন, নীচ, কীট, কৃমি তুমি। টাকা ঘুষ খেয়ে আমাকে থিয়েটারের মালিকের কাছে বেচে দিতে চেয়েছিলে; কিম্বা এখনো চাও।

—তাই। অনায়াসে বললে গঙ্গাধর। এখনো চাই। টাকাও খেয়েছি সত্যি। কিন্তু একলা, কিন্তু একলা কি আমি? তোমার স্বামী—

—টাকা খেয়েছিলেন? চিৎকার করে উঠলো যমুনা।

—খেয়েছিলেন। শান্ত গলায় গঙ্গাধর বললে, উত্তেজিত হয়ো না, তিনিও টাকার লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন ডাক্তার, তখনো পসার জমেনি, পণের টাকায় ডিস্‌পেন্সারি সাজিয়েছিলেন, তোমার মার টাকায়, একটি একটি করে জমানো টাকায়। তখন জানতেন, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, অদৃষ্টের ফেরে একবার মাত্র লাঞ্ছিত হয়েছ। তারপর যখন জানলেন, তুমি তা নও, তোমার জন্ম এবং বৃত্তি কোনটাই গৌরবের নয়—

—তুমিই জানিয়েছিলে, তারপর?

—তখন তোমার দেবতা—

—কী।

না, গ্লানি নয়, আত্মধিক্কার নয়;—কেননা তিনি উদার ছিলেন। কিন্তু হয়ত ভেবে দেখলেন, উপরি উদারতাটুকুর জন্যে কিছু উপরি টাকা চাই। ভদ্রঘরের মেয়ের জন্যে যদি তিন হাজার পেয়ে থাকেন, তবে গণিকার মেয়ের জন্যে চাই অন্ততঃ আরো তিন হাজার। সহজ হিসেবে সেই মর্মে দাবী জানিয়ে চিঠিও দিলেন গিরিজাবাবুর মারফৎ তোমার মাকে। পেয়েও গেলেন। অতো টাকা তোমার মার ছিল না। সব কুড়িয়ে

কাড়িয়ে হল এগারোশো। আর চারশো টাকা নিজে থেকে দিয়ে গিরিজাবাবু রফা করলেন দেড় হাজারে।

টকটকে লাল দেখাচ্ছে যমুনার মুখ। ধূপ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রদীপের সলতের বুক জ্বলছে। রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললে, মিথ্যুক।

কর্ণপাত না করে গঙ্গাধর বললে, সেই ব্যাপারটার ফয়সালা করতেই তো গিরিজাবাবু সেবার তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন।

—মিথ্যুক, মিথ্যুক।

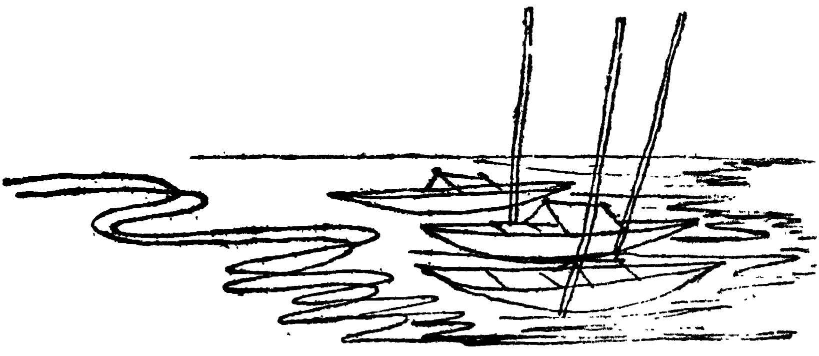
গঙ্গাধর মৃদু হেসে বললে, প্রমাণও আছে। জামার পকেট থেকে বার করলে অতি জীর্ণ পুরনো একখানা কাগজ। বাড়িয়ে দিলে যমুনার দিকে।

কম্পিত হাতে যমুনা টেনে নিলো কাগজটা! নরেশের হস্তাক্ষর ঃ

'শ্রদ্ধেয় গিরিজাবাবু, আপনি আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, সম্প্রতি জানিয়াছি সে জন্মকুলটা। আপনাকে অভিযুক্ত করিতে পারিতাম, জেলেও পাঠাতে পারিতাম। কিন্তু অতদূর যাইতে চাহি না। ভাবিয়া দেখিলাম, যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। যদি সমাজচ্যুত নারীকে বিবাহ করিবার সাহস আমার থাকে, তবে পতিতাকে গ্রহণ করিবারও আছে। কিন্তু একটি কথা। আমার এখন কিছু হাত টানাটানি চলিতেছে। যদি যমুনার মাতাকে বলিয়া কিছু টাকা—অন্ততঃ তিন হাজার—

অক্ষরগুলো ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এল। চিঠি থেকে মুখ তুলে একবার গঙ্গাধরের দিকে চাইল যমুনা। নরেশের ফটোর পাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে লোকটা নির্লজ্জ, নির্বিকার বিড়ি টানছে। মুখে পরিচিত সেই বিচিত্র হাসি।

হাতের কাছে ফুলদানী ছিল একটা। যমুনার একবার মনে হল, সেটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে আঘাত করে লোকটাকে। কিন্তু আশ্চর্য, সেটাকে তুলতে পারলো না কিছুতে। ওর সমস্ত জোর নিমেষে যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, আঙুলগুলোও অবশ। ঝাপসা চোখে নরেশের ছবি আর গঙ্গাধরের মুখ একাকার হয়ে গেছে।



আঙুরলতা

বিমল কর



মনে হল না এইমাত্র অতিবড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের—আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠাণ্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধভেজান দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে সে বিনিয়ে-বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙুল দিয়ে নন্দর জিভে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিভ বার করল না একটুও—আঙুর তখন তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটার বোজা চোখের পাতা দেখল সন্দেহভরে। একটা কাল পিঁপড়ে উঠেছিল পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধকরা বাসী ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাশে। যে আঙুলে মধু-চ্যবনপ্রাশ মাখিয়েছিল আঙুর নন্দর জিভে ছুঁয়ে দেবে বলে, সেই আঙুলটাই নন্দর নাকের তলায় ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠাণ্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোন শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা! আজ যাই কি কাল যাই! যাক শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু মাড়া খলনুড়িটা কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চালার ওপর এখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপসপ। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশ-শ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে ক'টা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কতকগুলো এলেমেলো হাড় যেন কেউ চিট ছেঁড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল! আঙুর ভাবছিল ঃ এখন কী করি! কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজী নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে। যেন ঠিক করেই এসেছিল, এঁটো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদ ও রাখল।

এখন কী করে আঙুর? এ-ভাবে তো ঘরের মধ্যে মড়া ফেলে রাখা যায় না। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার, পোড়াবার কী হবে?

খানিকটা ভেবে আঙুর ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। তোবড়ানো রঙচটা বাক্সটার ওপর ক'টা পোটলা পুঁটলি গুটানো মাদুর চাপানো ছিল। তারই ওপর কালো ছিটকাটা বেড়ালটা মুখ গুঁজড়ে ঘুমোচ্ছিল।

চোখ পড়তেই আঙুর যেন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। খপ্ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাটের দিকে ছুঁড়ে মারল। ধপ্ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু কঁকিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুঁটি চেপে ধরেছিল আঙুর তেমন করেই মাদুর পোটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের উপর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। 'যত আপদ সব! আমার কপালেই জোটে গো—এও আশ্চর্য্যি। কেন তোদের আর জায়গা হয় না' হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই? শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে। না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা!

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল—তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ণ ভাঙা-ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোন জবাব আসছে না দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাঁটকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস খাওয়া বাহারী শাড়ি বের করল, দুটো তাঁতের—ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা, সার্টিনের একটা বডিজ—। কাঠের কৌটো, প্রসাদী ফুল বাঁধা ন্যাকড়া, রোল্ড্গোল্ডের ম্যাড়মেড়ে কানপাশা, কাচের মালাও একটা। আর বেরুল একপাতা সিঁদুর। ক'টা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর আর মাথার কাঁটা ক'টা হাতে করে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে-মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। মুখটা ছিল চোখ-টানা। ভরাট গাল, বড়-বড় চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতক্ষণে টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু

সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্ করে—হাতের ওপর। ঠিক কব্জির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়, শখের শাঁখা; স্বামীর সিঁদুর তো নয়, যে-লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সীলমোহরও সিঁদুর। আঙুর শাঁখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না আসছে—এরজন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুকু করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, অন্তত নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না নন্দ আর দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে-খুঁটে সবসুদ্ধ সাড়ে এগার আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে, কোন রকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সে আর কোনদিন এলো না। এলে আঙুর তার কাছে থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুরের বাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালাবার চেষ্টা করে তাদের এই পটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলুঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা আধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানি। ও, হ্যাঁ—আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়িটার মধ্যে। কত হল সবসুদ্ধ তা হলে। সেই এক টাকা সাড়ে এগার আনা।

এক টাকা সাড়ে এগার আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব! আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়ে নি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান-খরচ চলে না।

কী করবে, কী করা যায়—আঙুর ভাবছিল। কুল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে—এমন কোন জিনিসই আর তার কাছে নেই। কী আছে আর তার এখন? এক রতি সোনা না, রুপো না, এমন কি কাঁসাও নেই। সোনা কোনকালেই ছিল না। সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চারগাছি ছিল এককালে, নন্দই করিয়ে দিয়েছিল তখন, সে চুড়ি কবেই গেছে। কানে দু-তিন আনা সোনা ছিল—এটা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল—সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এলো, আর যেন মস্ত বড় হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিন আনা সোনা গেল, খাঁটি সোনা; নাকের দেড় আনা—মাথায় গোঁজা রুপোর

চিরুনিটা, দু'খানা রেশমী শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি-গেলাস টুকিটাকি আরও কত কি।

কী করবে আঙুর! আহা, সে কী সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল। অত পিরিতের কেষ্ট ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাঁচড়া শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুঁকতে-ধুঁকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝোঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগীচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মতো কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড়কড় করছে; বিকট গন্ধ দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, একমুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা। 'দুটো রাত, আমায় থাকতে দাও, আঙুর; গায়ের তাপটা একটু কমুক আমি চলে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি-সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতদিন—সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড়খাওয়া কাঠের মত শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখ যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতদিন, সোয়াশুরি রঙ্গ করেছ, তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল!'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া-কুকুরের মতন ছটফট করছিল, মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতাটুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

'থাকছ, থাক—, কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে।' আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসে নি এসেছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝে মাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে।

চোখের সামনে জবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোন উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তার ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছেআঙুরদের লুকানো-চোরানো রোগগুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালা-টালা, ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, ও আঙুর—খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দিলাম আমি; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে

মদ খেয়ে খেয়ে। বড় কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ। ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও, যদি কিছু হয়—এখানে তো সুবিধে দেখছি না।

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল। জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে ফিচিল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে।

মর, মর অরুচি আমার। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে ; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাটে। বেইমান মিনসে কোথাকার! হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্যি এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়েছিলে মনে ছিল না। আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো সাত ভাতার করে বেড়াই নি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কত রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরি কথা—।

আঙুর তখন বড় মিষ্টি, রস টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ ; স্বামী স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল ছাদের বন্ধন—এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বছর আর এ-পথ মাড়াল না। আজ এসেছে—মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চিৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ সব কথা দশবার করে বলে। দূরে দূরে করেই আছে। জিভের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত—তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ-পথ্য সে-পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার ক'টা ছুঁচ ফুঁড়ল, দু চার শিশি ওষুধ। ঘা-ফোড়ার দগদগানি কমলো একটু! আর কিছু না। চটকলের সেই বড় ডাক্তার—তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল, কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি। রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁখে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে ধরনা দিল। কিসের কি, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখল না পর্যন্ত। এক নজর চেয়েই বলল, এখানে কেন নিয়ে এসেছ গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে

এনে থাক—টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে-করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ তারপর আর পাশ ফেরবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু'আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে সত্য কবিরাজের কথা মতন মধু-চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে। খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারী শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আভা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ হাই তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে—উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আতরের কিরকিরে গলা আর গোলাপের ভাঙা গলার বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আভা ছুঁড়িটার কপাল ভাল। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল ঃ আভা কি এই পাটের বাহারী শাড়িটা নেবে ? ওর তো এই সব রঙ, বাহার ভালই লাগে। যদি নেয় আভা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া তবু এখনও ছটা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পারবে। আহা, শাড়ি পরে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না।

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায় ? আঙুরের মনের মধ্যে আভা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর-পর। কি করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ঘরে মড়া ফেলে রাখবে।

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আভা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আভা সরিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আভার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে দিয়েছিল আঙুর আগেই। আতার আশেপাশে অত 'ভিড়' দেখে এখন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আতার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছে যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভাল মতন। সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গেই যা হয়। এত বড় বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন মল ?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে! আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক আমি কি করব! আমার কাছে তো চিতেয় ওঠাব খরচ জমা রেখে যায় নি!'

'কী করবি ?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মড়া কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।

'তা জানি।'

'দেখ তবু হাতে-পায়ে ধরে—যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোন গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু ?

'টা—কা!' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ-মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম না সে-দিন! স্যাকরার জন্যে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে আর চারটে হলে—জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কী ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি, আধুলি, বড় জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশী আমাদের ক্ষমতা কী। তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস। বলেই হিমু একটু অন্য রকম হাসল, 'তুই আর শুধবি কি—!'

হাত পেতে আঙুর দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

হিমুর কাছ থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তখন বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।'

আঙুর কিছু বলল না। মনে-মনে ভাবল শুধু দরদে ও উথলে ওঠে নি, বিছানা পেতেও শুতে দেয় নি। নন্দর আমি বিয়ে করা মাগ নয় যে, খেয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছি ওই পচা মর-মর লোকটার। নেহাত ছিল, একই ঘর, চৌকিতে, আমি মেঝেতে; তাই জল চাইলে দিয়েছি ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে!

বেদানামাসি বললে, 'আমি কী করব!'

মড়াটা ঘরে পড়ে থাকবে?' আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি—আমার এখানে মড়া-ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা—যা মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা—হাতে আধুলিটা টাকাটা গুঁজে দিস—না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায়—ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মেথর, মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এলো আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব! বডিজ এঁটে শাড়িটা সবে পরেছে, ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে। 'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি! পাড় ভাল না!'

আঙুর কি বলবে। তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে! আঙুর শুধু বিড়বিড় করল, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'ছারুবাবু সে দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কী করব! বড্ড পুরনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বসল 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখচ্ছে শাড়িটা গায়ে ফেলে। আর যদি শুনিস বাপু তবে বলছি,—এ-শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস—বছর খানেক চলে যাবে'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে—আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এলো। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরি। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়ত আরও জোরে আসবে। টিপ্‌টিপ্‌ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু তিনটে মাথাও জড়।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এলো আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদের জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা ঢলাঢলি, হাসি। ঘুর ঘুর শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকার পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুর দুই আর আতার আড়াই—তা ক'টা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ'টাকায় রাজী হয়। মনে হয় না হবে—। কততে যে হবে তাই বা কে জানে! হনহন করে এগিয়ে গেল আঙুর!

এখান-ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাঁচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তার পাজামা আর মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বিশু এলো; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কি রে পট্‌লি কী খবর?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পট্‌লি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়া আগে মাইরি একটা পান খেয়ে নি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিভটাই বেসাদ হয়ে গেল।' বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের পয়সাটা আগে ফেল। পরে বার্তাচিত।

আঙুর এ-সব দস্তুর জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল—আতার দেওয়া আধুলিটা। বললে, এক খিলি পান: একটা সিগারেট—তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল।

বিশু হাসল। 'খুব টাইট যাচ্ছে না রে পট্‌লি! দিনকাল শালা যা যাচ্ছে—যেন সত্যযুগ। আয়—আয়, শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।' বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এলো খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভরতি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরত দিল না। 'বল পট্‌লি কি বলছিলি?'

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তার ছিটে ফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভাল করে দেখল। একটু ভাবল, 'ক'টাকা আছে তোর কাছে?'

'ছ'টাকা।'

'ছ'টাকা! ছ'টাকায় কি হবে রে, একটা ঠ্যাং-ও তো পুড়বে না নন্দর' হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

'কত লাগবে তবে ?' আঙুর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধল।

'দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে! দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে; তারপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো—ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্তর পরাতে চাষ তো—'

'না।' আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুক শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

'এইত আর কি; আর আমরা চারজন খাবো চারটে পাঁইট দিবি। তা দু'নম্বরই দিস—দু টাকা ছ'আনা করে ধরে নে—গোটা দশেক টাকা আর কি!'

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস?'

'বাপ না, ভাতার না, তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দে—ধাঙড় পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামারগিরি করিস না বিশু।'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস্ পটলি! এই বৃষ্টি বাদলার দিন—এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো—তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফ্তি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস—তোর বাপ ভাতার যখন নয়—এক রকম মাগনাতেই চিতেয় উঠিয়ে দেবো। আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি!'

আঙুর হাঁ হুঁ কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোক-জন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মণের মধ্যেই সেরে দেবো। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর—আধাপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা জোগাড় করে ঝপ্ করে আয় দেখি, পটলি। হাঁদুর দোকানে আছি।'

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাত টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে!

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু

আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুন্দোফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কী করবে আঙুর. কী আর করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন! আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড় রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হতে পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচ্ছে আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফাতিতে। না নন্দর ভাগ্যে আর চিতেয় ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্য। বামুনের ছেলে—এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর শেয়াল যায় তাও আবার কোন্ ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, শিরদাঁড়াটা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা—অদ্ভুত!

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল; তার দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না! কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না।

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হনহনিয়ে ছাতা মাথায় চলেছে। আঙুরের কি যে হলো, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতে পারলে না। 'কে? কী চাও?' আঙুরকে দুহাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সী যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুর 'আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়িবাবুর জন্যে। বলেছিলেন, আপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড় বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পুড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর থেকে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।'

মানিক মুন্সী খিঁচিয়ে উঠল, 'আহা কী আমার আব্দার রে মাগীর, টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায় টাকা দেবেন কেন? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে। যাও, যাও,—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।'

মানিক মুন্সী চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা। মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায়। আর সারা রাত ভোর তার ঘরে মড়াটা পচুক।

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয়—তারই। যে দায়ে তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মতো একফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি, ছাতু-টাতু বিক্রি করে একজন। ওপরটায় অন্য জনের দোকান।

আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, সুর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দুটো চোখ হঠাৎ কিসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভাল করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর, ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসমস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর; টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চক-চক করে, ভীষণ চক-চক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা, সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিভ দিয়ে লাল পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে। আঙুর বুঝতে পারে না। এক-একটা লোকের এক-একজনের ওপর এ রকম হয়। দাঁত উঁচু টোপা-কপাল ঝুমুরের ওপর তা না হলে এমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে মন্টুবাবুর। মন্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাই বিচার আছে। এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসলটাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল খুব সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল। নয়ত একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়ত আতা, চিনু, চামেলির বড় মুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন—তার আর উপায় কী! তাও একটা বছর আঙুর কত সাবধানে থেকেছে। নেহাত যখন পেট ভরাবার চালডালটুকুই বাড়ন্ত হত—তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের—তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখ-খানাই শুধু যে ভাল তা নয়; বুক কোমর চলন-টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভাল আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখল—আঙুরের এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে

কী ঘেন্নাই করত ও ; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মতো, শরীর—আর ওই কুচ্ছিত মুখ মাছের পিত্তির মত গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়ত প্রভুলাল কতবারই তো ঘুরঘুর করছে—আঙুর প্রশ্রয় দেয় নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি ? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভাল করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

সুর্মা আছে ?' মুচকি হাসল আঙুর। একটু হেসে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপরে যেন কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে বাঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতন ভাঙা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কী খবর আঁ—তুমি কাঁহা ভাগ গিয়েছিল ! শালা সারা পট্টি আনধার হয়ে গেল !'

হাসি আসছিল না। তবু আঙুর হাসল। যেন একটা ঝাপ্টা খেয়ে প্রভুলালের কোলের ওপর পড়তে পড়তে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মসকরা থাক। সুর্মা আছে কিনা বল। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাটু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।

'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই তো বসে আছি।

'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পিঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে—প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।

ঠেলে আসা বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল। আঙুর চোখ বুজল।

'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙুরী ! শালা কী চোট্ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।

আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ-চোখ টিপে হাসল আঙুর।

'তোমার পচা আতরের গন্ধ ক'দিন থাকবে গো !' আঙুর ঠোঁট উলটাল।

'পচা নেই, আসলি আতর দেবো যে ক'দিন রাখতে চাও। প্রভুলাল আঙুরের

গালে টোকা মারল।

আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে।

'দশ্—?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, দ-শ কি রে?'

'দরকার আছে, দশ দাও। আগাম দাও—।'

'আগ্লি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর, 'দশ না পার—সাত আটটা টাকা দাও।'

মনে মনে হিসাব করে নিল প্রভুলাল। নিচু গলায় বললে, 'বহুত আচ্ছা, আট টাকা দেবো। মাগর—' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে, গোঁফের ডগায় হিসেবী একটা হাসি তুলল। আঙুল দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভর আর কি!

ও-সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। 'টাকা।'

প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা সুরতটুরত থোড়া ঠিক করে লিগে যা; একদম্ কল্‌কত্তাবালী হয়ে যা। দোকান বন্ধ্ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কি রে?' প্রভুলাল আতবের শিশিটিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল। আঙুর তার সদ্য নিবন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এ-রকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনে নি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙুগুরী—আর ঘর ঢুঁড়ব আমি। তব তো দুসরা আওরাত ভি—।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেকরকম শিশি—আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কী যেন! প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলুদ বিকারের চোখে মানুষ যেমন কী দেখছে জানে না, বোঝে না, চেতনায় চিনতে পারে না, তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। 'বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এস তুমি। তাড়াতাড়ি।'

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর পচ্‌পচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শব্দগুলো এলোমেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাসা; কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জেবলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। ক'টা ধূপও। বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়ি খুঁজেছে প্রথমে—তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া

ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এলো। ঘরটা বড় অন্ধকার। 'লণ্ঠন কি হল? টুটু গিয়া—' আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কী হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার! তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে বাড়ুক। কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।

আবার কি বৃষ্টি এলো? না, বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি যেন আর না আসে হে মা কালী! কোনোগতিকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে দাও। চরণে পড়ি তোমার।

প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ—তেমনি, ঠিক তেমনি আরও দু খিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে-হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। আঁট করে।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুমঝুম তালি, বেসুরো গান আর দিশি মদের গন্ধ।

আঙুর তর তর করে দাওয়ায় নেমে গেল। তারপর বাইরে। সদর রাস্তায়। হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও!

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর। দরজা খুলে ঢুকল।

পিছু পিছু বিশু।

'কই মড়া কই! আ, খুব বাহারে ধুপ জ্বালিয়েছিস তো, পটলি।' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধুপের।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল।

বিশু তাকাল এদিকে, ওদিকে। 'মড়া কই?'

আঙুর আঙুল দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল।

বিশু মুখ নীচু করে দেখল। অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না।

'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কি করে?'

আঙুর সে-কথায় কোন জবাব দিল না।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল। ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে, ঢুকে পড়েছে।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না?'

বিশু জবাব দিল, 'চলু, রাস্তার গিয়ে দেবো। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গণ্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু কেলো সামনে—পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুরে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড় বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি-উল্লাসের ঝাপটা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পেঁছিতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল! কেলো গেল কাঠ আনতে পেঁচো পাঁইট আনতে। কাছাকাছি সে ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল এক পাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরি বলতে হবে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পটলি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? কিছু না। কেউ না নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেবো। না—না, তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? লে কেলো, তুই ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাঁইটে মুখ দিয়েছে। পেঁচো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সঙ্গে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব-রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খানিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বই কি? আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এত লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সঙ্গে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। শখের স্বামী-স্ত্রী খেলা—তাও খেলেছে। শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো তোবড়ানো, তোবড়ানো বাসি, ডিমের মতো সিদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পটলি. শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুন লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কী দেখল আঙুর।

দেখে নিথর হয়ে গেল! মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল!

নিজেকে বড় অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সঙ্গে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে কুকুরটার—?—না' এইবস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে—কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চললই। এ-সময়ে আর খুঁত থাকে কেন?

পাঁকাটি কটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' শিশু অবাক।

'আসছি। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হুঁহুঁ। গঙ্গার জল কালো। একটা শব্দ উঠেছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পড়ার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল আঙুর। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোনো গলা-পচা গোরু ছাগল কি মোষটোষ হবে, জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ান মানুষ-টানুষও হতে পারে।

'বড় বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে-বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড় চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদানামাসি, প্রভুলালের গায়ে। সর্বত্র।

আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল।

জ্বলে উঠল সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো। অশুচি, কিসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্‌টা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন। বেদানামাসি, হিমুর গা অনেক ধুয়েছে গঙ্গা। কি দিয়েছে?

গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি ক'টা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে আগুন। আ সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হল্‌কাটা হঠাৎ ধক করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে মট্‌ মট্‌। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানক ভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো কেউ মট্‌ মট্‌ করে ভেঙে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠেছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায় খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মতো সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থরথরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাতরে কাতরে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধপোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

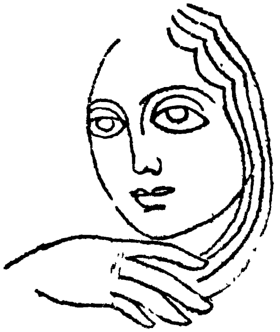
আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কি রে পটলি মরবি নাকি ?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে! এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।



প্রাণ-পিপাসা

সমরেশ বসু



এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগময়ী রাতের কথা বলছি।

দুর্যোগটা হঠাৎ মেঘ করে হাঁক ডাক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে মুষলধারে দু-এক পসলা হয়ে যাওয়ার মত নয়। একঘেয়ে রুগ্ন গলার কান্নার মত কয়েকদিন ধরে অবিরাম ঝরছেই বৃষ্টি, তার সঙ্গে পুব হাওয়ার একটানা ঝড়। শহরতলির বড় সড়কটি ছাড়া আর সব কাঁচা গলিপথগুলো সুদীর্ঘ পাক-ভরা নর্দমা হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ আর আবর্জনায় ছাওয়া অসংখ্য বাড়ির ভিড়, ঠাসা, চাপাচাপি।

পথ চলছিলাম রেল-লাইনের ধারে মাঠের পথ দিয়ে। কিন্তু ভিজে ভিজে শরীরের উত্তাপটুকু আর বাঁচে না। হাওয়াটা মাঠের উপর দিয়ে সরাসরি এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা। রীতিমত দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বেগতিক দেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অন্তত হওয়ার ঝাপটাটা কম লাগবে তো!

একটা নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে পড়া ভাব চটকল-শহরটা। যেন কাজ এবং চাঞ্চল্য সবটুকু এই অবিরাম বৃষ্টি ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিয়েছে। কুকুরগুলো অন্যদিন হলে বোধ হয় তেড়ে এসে ঘেউ ঘেউ করত। আজ দায়সারা-গোছের এক-আধবার গরর গরর করে গায়ের থেকে জল ঝাড়তে লাগল। গেরস্তদের তো কোন পাত্তাই নেই। কোন জানলা-দরজায়, একটি আলোও চোখে পড়ে না। রাস্তার আলোগুলো যেন কানা জানোয়ারের মত স্তিমিত এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে কমে নি একটুও।

রাস্তাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, তবে উত্তর দিকেই চলেছি তা বুঝতে পারছি। একটি ধার ঘেঁষে চলেছি রাস্তার। নিচু রাস্তা, জল জমেছে। কোনও বারান্দায় যে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেব তার কোন উপায়ই নেই। কারণ বারান্দা বলতে যা বোঝায়, এখানে সে-রকম কিছু ঠিক চোখেও পড়ছে না আর বস্তিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরে ঘরগুলোও বোধ হয় শুকনো নেই। তা ছাড়া,

অবস্থাটা তো নতুন নয়। জানা আছে, সেখানে শুয়ে পড়লে লোকজনেও নানান কথা বলতে পারে পুলিসের বেয়াদপি তো আছেই তার উপর।

যেতে হবে নৈহাটি রেল-কলোনির এক বন্ধুর কাছে। অন্তত কয়েকটা দিনের খোরাক, শুকনো কাপড় একখানি আর এমন বিদঘুটে প্যাচপেচে ঠাণ্ডা রাতটার জন্য একটু আশ্রয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আড্ডা ছেড়ে না বেরুনোই ভাল ছিল। তবে উপায় ছিল না। বিশেষ করে, কয়েকদিন আগে আমাদের আড্ডার হা-ভাতে বন্ধুদের মধ্যে একজন মরে গেল, তখন থেকেই একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। বন্ধুটির মরা হয়তো ভালই হয়েছে। তা ছাড়া আর কী হতে পারত; আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। বাঁচার জন্য যা দরকার তার কিছুই তো ছিল না, তবু বুকটার মধ্যে···যাক। ওটা কোন কথা নয়। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়ে গেছে ছোট্ট জিনিস অথচ মনে হয় পর্বতপ্রমাণ তার ভার আর কষ্টকর। বোঝাটা হল...

আরে বাপ রে, হাওয়াটা যেন শিরদাঁড়াটার ভিত ধরে নাড়া দিয়ে গেল। জলটাও বেড়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ পরে মেঘের গড়গড়ানিও যাচ্ছে শোনা। এবার আর দাঁত নয়, রীতিমত হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। গাছের মরা ডালের মত ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি। এসে পড়লাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে, চটকলের মাল চালানের রেল সাইডিংয়ের পাশে। জায়গাটা একটু ফাঁকা। কাছাকাছি একটা মোষের খাটাল দেখে ঢুকবো কি না ভাবতে ভাবতে আর-একটু এগোতেই হঠাৎ ডাক শুনতে পেলাম, এই যে, এদিকে।

না, অশরীরী কিছু বিশ্বাস না করলেও ভয়ানক চমকে উঠলাম।. আমাকে নাকি? জলের ধারা ভেদ করে গলার স্বরের মালিককে খুঁজতে লাগলাম। ডান দিকে একটা মিটমিটে আলোর রেশ চোখে পড়ল আর আধ-ভেজানো দরজায় একটা মূর্তি। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ। তা হলে আমাকে নয়। এগুচ্ছি। আবার কই গো, এসই না।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে?

জবাব এল, তা ছাড়া আর কে আছে পথে?

কথার রকমটা শুনে চমকে উঠলাম। ও! এতক্ষণে ঠাওর হল পথটা খারাপ। ঠিক বেশ্যাপল্লী নয়, তবে একরকম তাই, মজুর-বস্তিও আছে আশেপাশে ধার ঘেঁষে।

আমি মনে মনে হাসলাম। খুব ভাল খদ্দেরকে ডেকেছে মেয়েটা! তাই ভেবেছে নাকি ও? কিন্তু সত্যি, এ সময়টা একটু যদি দাঁড়ানো যেত ওর দরজাটায়। তবু আমাকে যেতে না দেখে মেয়েটা বলে উঠল, কী রে বাবা, লোকটা কানা নাকি?

মনে মনে হেসে ভাবলাম, যাওয়াই যাক না। ব্যাপার দেখে নিজেই সরে পড়তে বলবে। আর কোনরকমে বৃষ্টির বেগটা কমে আসা পর্যন্ত যদি মাথার উপরে একটু ঢাকনা পাওয়া যায় মন্দ কী! এমনিতে নৈহাটি দূরের কথা মোষের খাটালের বেশী কিছুতেই এগনো চলবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—প্রবাদে যারা বিশ্বাস করে তারা এ রকম অবস্থায় কখনও পড়ে নি।

উঠে এলাম মেয়েটার দরজায়। একটা গতানুগতিক সংকোচ যে না ছিল তা নয়, বললাম, কেন ডাকছ ?

কোন দেশী মিনসে রে বাবা !—হাসির সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলল সে, ভিতরে এস না।

আমি ভিতরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির শব্দটা চাপা পড়ে গেল একটু হাওয়া আসবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দেখলাম, এ ঘরের মেঝেও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজে নি। ঘরের মধ্যে আছে দু চারটে সামান্য জিনিস, থালা গেলাস কলসি।

কোথায় মরতে যাওয়া হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে ? এমনভাবে বলল সে, যেন আমি কতকালের কত পরিচিত।

বললাম, অনেক দূরে, কিন্তু—

বুঝেছি।—মুখ টিপে হাসল সে। ঘরটা তুমি একেবারে কাদা করে দিলে। এগুলো ছেড়ে ফেলো জল্দি।

ঠাণ্ডায় আর আচমকা ফ্যাসাদে রীতিমত জমে যাওয়ার যোগাড় হল আমার। বললাম, কিন্তু এদিকে—

সে বলে উঠল, কী যে ছাই পরতে দিই ! ভেজা জামাটা খুলে ফেলো না।

ফেলতে পারলে তো ভালই হয়। কিন্তু গলায় একটু জোর টেনে বলেই ফেললাম মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা।

এবার মেয়েটা থমকে গেল। যা ভেবেছি তাই। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল, কিছু নেই ?

তার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিবে গেছে, এমন মুখের ভাবখানা।

বললাম, তা হলে আর দুর্যোগ মাথায় করে পথে পথে ফিরি ?

মেয়েটা অসহায়ের মত চুপ করে রইল। এ তো আমি আগেই জানতাম। কিন্তু মেয়েটা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে, না, ভিক্ষে করতে বসেছে। আমি দরজাটা খুলতে গেলাম।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে এখন ?

বললাম, ওই মোষের খাটালটায়। দরজাটা খুলে ফেললাম। ইস। হাওয়াটা যেন আমাকে হাঁ করে খেতে এল। পা বাড়িয়ে দিলাম বাইরে।

মেয়েটা হঠাৎ ডাকল পেছন থেকে, কই হে, শোন। রাত্তিরটা থেকেই যাও, ডেকেছি যখন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কপালটাই খারাপ আমার।

বললাম, কেন কপালটা ভাল থাকুক তোমার আমি খাটালেই যাই।

যা তোমার ইচ্ছে। হতাশভাবে বসে পড়ল সে তক্তাপোশে আজ তো আর কোন আশাই নেই।

ভাবলাম, মন্দ কী ? এই দুর্যোগে এমন আশ্রয়টা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, কেন

আর ছাড়ি। কিন্তু মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা ভারি বিশ্রী মনে হল। কেননা, এটা একেবারে নতুন আমার কাছে। অবশ্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তোমাদের আর-দশজনের চেয়ে হয়তো একটু বেশীই আছে। তা বলে এখানে? ছি-ছি! সে আমি পারব না। ...তবে ওর সঙ্গে না শুয়েও রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

লম্বা ছেয়ালো গড়ন মেয়েটার। মাজা মাজা রঙ। গাল দুটো বসা. বড় বড় চোখ দুটো অবিকল কচিঘাস-সন্ধানী গরুর চেখের মত। ওই চোখে মুখে আবার রঙ কাজল মাখা হয়েছে। মোটা ঠোঁট দুটোর উপরে নাকের ডগাটা যেন আকাশমুখো।

খুঁজে খুঁজে সে আমাকে একটা পুরনো সায়া দিল পরতে, বলল. এইটে ছাড়া কিছু নেই।

সায়া! হাসি পেল আমার। যাক, কেউ তো দেখতে আসছে না, কিন্তু—

ধক্ করে উঠল আমার বুকটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি পকেটে চাপ দিলাম আমি। মরবার সময় আমার বন্ধু যে ছোট্ট জিনিসটা পর্বতের বোঝার মত চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা দেখে নিলাম। জিনিস না, একটা রক্তের ডেলা। হ্যাঁ রক্তের ডেলাই। ভীষণ সংশয় হল আমার মনে! তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালাম! সে তখন পিছন ফিরে জামার ভিতরের বডিস খুলছে। বললাম, কিছু কিন্তু নেই আমার কাছে, হ্যাঁ।

কবার শোনাবে বাপু আর ওই কথাটা —সে হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ বাবা। বললাম, বলে রাখা ভাল। তবে আমার কোন ইচ্ছে নেই কিছু। খালি মুসাফিরের মত রাতটা কাটিয়ে দেওয়া।

মেয়েটা ওর গরুর মত চোখ তুলে একদৃষ্টে দেখল আমাকে। বলল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

তা বটে। আমি সায়াটা পরে নিলাম। কিন্তু খালি গায়ে কাঁপুনিটা বেড়ে উঠল। বাইরে জল আর হাওয়ার শব্দ দরজাতে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একপ্রস্থ হেসে নিয়ে একটা পুরনো শাড়ি দিলে ছুঁড়ে। নাও, গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

বলে আমার জামা কাপড় দড়িতে ছড়িয়ে দিল। বলল, একটু আঁসিয়ে যাবে খন।

আরাম জিনিসটা বড় মারাত্মক. বিশেষত এ-রকম একটা দুরবস্থার মধ্যে। আমি প্রায় ভুলেই গেলাম যে, আমি একটা বাজারের মেয়েমানুষের ঘরে আছি। বললাম, পেটটা একেবারে ফাঁকা দুদিন ধরে, তাই এত কাবু করে ফেলেছে জলে।

সে কোন জবাব দিল না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। বললাম, তা হলে শোয়া যাক।

সে মুখ তুলল। মুখটা যন্ত্রণাকাতর, তার সুস্পষ্ট বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে

ওঠানামা করছে। বলল, খাবে ? ভাত চচ্চড়ি আছে।

ভাত চচ্চড়ি ? সত্যি, এটা একেবারে আশাতীত। ভাতের গন্ধেই যার অর্ধেক পেট ভরে তার সামনে ভাত। জিভটাতে জল কাটতে লাগল আর পেটটা যেন আলাদা একটা জীব। ভাত কথাটা শুনেই ভেতরটা নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু—

সে ততক্ষণ এনামেলের থালায় ভাত বাড়তে শুরু করেছে। দেখে আমার মনের সংশয়টা আবার বেড়ে উঠল। আমি দড়ির উপর থেকে জামাটা তুলে নিলাম তাড়াতাড়ি। গতিক তো ভাল মনে হচ্ছে না। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, ভাতের পয়সা-টয়সা কিন্তু নেই আমার কাছে।

গরুর মত চোখ দুটোতে এবার বিরক্তি দেখা গেল। বলল. মোষের খাটালই তোমার জায়গা দেখছি। কবার শোনাবে কথাটা।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। হতভাগা মরবার সময় এমন জিনিসই দিয়ে গেল, এখন সেই বোঝা নিয়ে আমার চলাই দায়। রাখাও বিষ, ছাড়াও বিষ। বাইরে পড়ে থাকলে এ বোঝাটার কথা হয়তো মনে থাকত না। সে আবার বলল মানুষের সঙ্গে বাস কর নি তুমি কখনও।

শোন কথা। তাও আবার জিজ্ঞেস করছে কারখানা বাজারের মেয়েমানুষ। বললাম করেছি তবে তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে নয়।

সে নিশ্চুপে তাকিয়ে রইল আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রয়েছে যখন খেয়ে নাও, নইলে নষ্ট হবে। ভেবে দেখলাম তাতে আর আপত্তি কী। বিনা পয়সার ভাত। আর দেখছেই বা কে! জামাটার হাত গুটিয়ে নিয়ে গপাগপ করে ভাত খেয়ে নিলাম। তারপর একঘটি জল। এ রকম বাড়া ভাত খেয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চূড়ান্ত বাবুগিরি বলে মনে হল আর সেই জন্যই সংশয়টা বাঁধা রইল মনে আষ্টেপৃষ্ঠে।

তারপর শোয়া। সে এক ফ্যাসাদ। আমি শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শোবে কোথায় ? সে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে খসা-ঘোমটাটা টেনে দিল। তা হলে তুমি শোও আমি বসে রাতটা কাটিয়ে দি।—আমি বললাম।

সে পাশতলার দিকে বসে বলল তুমিই শোও আমি তো রোজ শুই। একটা রাত তো। ডেকেছি যখন···

বলতে বলতে আমার হাতের মুঠির মধ্যে জামাটা দেখে সে দড়ির দিকে দেখল তারপর আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম। বলল. জামাটা ভেজা যে।

হোক তাতে তোমার কী ?

চুপ করে গেল সে। শরীরটা আরাম পেয়ে আমার মনে হল সিটনো তন্ত্রীগুলো স্বাভাবিক সতেজ ও গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের যে জল হাওয়া আমাকে এতক্ষণ মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারই চাপা শব্দ যেন আমার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মত মিষ্টি মনে হল। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল বেশ।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তেমনি বসে আছে। চোখের দৃষ্টিটা ঠিক কোনদিকে বোঝা যাচ্ছে না! অত্যন্ত ক্লান্ত আর চাপা যন্ত্রণার আভাস তার চোখে। কী জানি

এদের নাকি আবার ঢঙের অভাব হয় না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব তখন—

নাঃ, হতভাগার এ জিনিসটার ব্যবস্থা আমি কালকেই করে ফেলব। কী দরকার ছিল মরবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যাওয়ার? একটা রক্তের ডেলা। রক্তের ডেলাই তো। ঘামের গন্ধে ভরা ছোট্ট ন্যাকড়ার পুঁটলিটা। একটা রাক্ষুসে খিদে-খিদে গন্ধও আছে। ছোঁড়া মরতে মরতে মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল, এটা তুই রাখ।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে আজও মনে করলে বুকটার মধ্যে—যাক সে কথা।

মেয়েটা তখনও ওইভাবে বসে আছে দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম তুমিও শুয়ে পড় খানিকটা তফাত রেখে।

সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, ছিষ্টিছাড়া মানুষ বাবা।

তারপর শুয়ে পড়ল।

আমার শরীরটা তখন আরামে রীতিমত ঢিলে হয়ে এসেছে। আর মেয়েমানুষের গা যে এত গরম তা মেয়েটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থেকেও আমি বুঝতে পারলাম। কী অদ্ভুত রাত আর বিচিত্র পরিবেশ। লোক দেখলে কী বলত! ছি-ছি! কিন্তু এতখানি আরাম আমার দুঃস্থ ক্লান্ত শরীরে এতখানি সুখবোধ আর কখনও পেয়েছি কি না মনে নেই। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। কিন্তু—

নাঃ, তা হবে না। সেই বন্ধুটির কথা বলছি। হতচ্ছাড়া মরবার সময় বলে গেল পুঁটলিটা দিয়ে, আমার রক্ত।

বললাম রক্ত কিসের?

চোখের জল আর কষের রক্ত মুছে বলল, আমার বুকের। না খেয়ে খেয়ে রোজ—

বলতে বলতে রক্তশূন্য অস্থির আঙুলগুলো দিয়ে হাতড়াতে লাগল পুঁটলিটা।

আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম কিসের জন্য র‍্যা?

বলল, ঘর বাঁধার আশায়।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা ফের গালাগালি দিতে গিয়ে আমার গলাটার মধ্যে…

যাক সে কথা।

মেয়েটা একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?

সে তাকাল। চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় লাল আর কান্নার আভাস তাতে। বলল, কিছু না।

তার গরম নিশ্বাসে এত আরাম লাগল আমার গায়ে। ঠান্ডা-জমে-যাওয়া গায়ে যেন কেউ তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে হল হঠাৎ, খুব খারাপ নয় দেখতে। ঠোঁট আর নাকটা একটু খারাপ। বোজা চোখের পাতা, বুকে জড়ানো হাত দুটো আর তার নমিত বুক বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করল। সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, ঘুম আসছে না তোমার?

আমি ঘুমুব না—বললাম। মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তোমার বড় সুবিধে

হয় না? সেটি হচ্ছে না বাবা। কথা বললেই তো সংশয়টা বাড়ে আমার মনে। তার চেয়ে চুপ করে থাকুক না।

বাইরের তাণ্ডব তখনও পুরো দমেই চলেছে। টালি-চোয়ানো জলের ফোঁটার শব্দ আসছে মেঝে থেকে, সঙ্গে ছুঁচোর কেত্তন।

সে আবার ককিয়ে উঠল।

কী হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, রোগ।

রোগ! কিসের রোগ।

সে-নীরব।

বল না বাপু।

তবুও নীরব।

আমি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলাম, বল না কেন রোগটা। যক্ষ্মা কলেরা-টলেরা হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। রোগের সঙ্গে পীরিত নেই বাবা।

সেও হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, কার সঙ্গে আছে তোমার পীরিত, শুনি?

তা বটে, পীরিতের কথাই তো ওঠে না এখানে। বললাম, তা বলই না কেন রোগটা।

যা হয় এ লাইনে থাকলে—সে বললে।

লাইনে থাকলে! সর্বনাশ! ভীষণ সিঁটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞাস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্র—

নিশ্চয়ই।

পাঁচজন—সে বলল।

ইস্‌! কী সাংঘাতিক! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?

পয়সা পাব কোথায়?

কেন, নিজের রোজগার?

সে তো মনিবের পয়সা।

মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?

নয় তো কী। মনিবের ব্যবসা, ঘর-দোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে।

ভয়ানক দমে গেলাম কথাগুলো শুনে। এরা বেশ মজায় থাকে না তা হলে? এও চাকরি! বললাম, মনিব শালাই বা কেমন, চিকিচ্ছে করায় না কেন?

যখন মর্জি হয়। কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকরা তাদের চিকিচ্ছে করায়?

ঠিক। তার বেদনার্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি এবার আমাকে সত্যিই দিশেহারা করে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কী প্রতিরোধের লড়াই? বললাম, তা হলে…

সে বলল, তা হলে আর কী। মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে যেটা রোজগার হয়, তাতে চিকিচ্ছে করাই।

বাঁচতে ?—হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল আমার।

সকলেই বাঁচতে চায়।—সে বলল যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে।

ঠিকই। ডাঙায় বাঘ আছে জেনেও মানুষ এ ডাঙাতেই তার বাস ও জনপদ গড়ে তুলেছে। বন্যা, ঝড়, ক্ষুধা, কী নাই। তবু। আর সেই হতচ্ছাড়া চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। হ্যাঁ, তবু পুঁটলির প্রতিটি পয়সা রক্তের ফোঁটা। রক্তেরা ডেলা একটা—এই পুঁটলিটা।

সে বলল, ঘুমুবে না ?

না, ঘুম নেই চোখে। ওর নিশ্বাস লাগছে। যন্ত্রণার গরম নিশ্বাস। মিঠে তাপ, তেপে তেপে গনগনে আগুনের মত মনে হল। শক্ত করে পুঁটলি শুদ্ধ জামাটা চেপে ধরে উঠে পড়লাম। বাইরে ঝড়-জলের দুর্যোগ তেমনই। রাত প্রায় কাবার। নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম।

সে উঠল। হাসতে চাইল ; চললে ?

পকেটে হাত দিয়ে শক্ত পুঁটলিটা চেপে ধরে বললাম, হ্যাঁ।

হতভাগা মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল মরতে মরতে, এটা তুই রাখ ! কেন ? কেন ?

মেয়েটা বলল, যন্ত্রণায় চাপা গলায়, আবার এসো।

মেয়েটার কী চোখ ! সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনার দাগে ভরা, আকাশমুখো নাক, মোটা ঠোঁট। কিন্তু এমন মুখ তো আর কখনও দেখি নি।

ভীষণ বেগে ওর দিকে ফিরে পুঁটলিটি ওর হাতে তুলে দিলাম। ওর নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে। মুহূর্তে চোখ নামিয়ে একটা অশান্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষে বেরিয়ে এলাম পথের উপরে।

সে কী একটা বলল পেছন থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল সে কথা। বললাম, পিছু ডেকো না।

বোঝামুক্ত আমি উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। বানপ্রস্থ নয়, বন্ধুর বাড়িতে, পুবে হাওয়া ঠেলে দিতে চাইলো পশ্চিম গঙ্গার ঘাটের দিকে। পারল না।